# বিপ্লবী বাংলা

( ১৭৫৭-১৯১২ )

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

—সাড়ে চার টাকা—

এই গ্রন্থকারের লেখা

| | |
|---|---|
| আজাদ হিন্দ ফৌজ ১ম ও ২য় খণ্ড | ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত |
| আগষ্ট বিপ্লব ১৯৪২ | |
| INDIA IN REVOLT 1942 | |
| বিপ্লবী ভারত | |
| বিপ্লবের সপ্তরথী | |

মিত্রালয়: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও টেম্পল প্রেস ২ ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বাংলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন, যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অপরিমিত বেদনার বিষপাত্র পান করিয়াছেন, ঐহিকের সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহারা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন, সেই সমস্ত খ্যাত ও অখ্যাত, কীর্তিমান ও অবজ্ঞাত সৈনিকের উদ্দেশ্যে।

## বৈদেশিক লুণ্ঠনের প্রথম যুগ

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য পলাশীর প্রান্তরে ডুবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবাসীর জীবন হইতে আলোক নিভিয়া গিয়াছিল। দুর্যোগের ঘনঘটা ও গাঢ় তমিস্রার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী যে বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছিল, তাহা এক শত বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে দানা বাঁধিয়া ওঠে। বাংলার মাটিতেই বিপ্লবের পবিত্র হোমানল প্রজ্বলিত হইয়া দাবাগ্নিরূপে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

যে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল, সেই বাংলা দেশেই ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে। সাহিত্যিক, শিল্পী, ও চারণ কবি দল বাঙ্গালীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা জোগায়; ধর্ম্মবিদ্, সমাজবিদ্ ও রাজনীতিকগণ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চেতনাকে দাসত্বের পঙ্ক-তিলক-মুক্ত করিয়া রক্ততিলক পরাইয়া দেন। বাংলা দেশ সারা ভারতবর্ষকে এক নূতন জাগরণী মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করিল। আপন হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া বাংলার যুবক পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল, সেই আন্দোলনের ঢেউ ভারতীয় জন-সমুদ্রে এক নূতন প্রবাহ আনিল।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতার পর যে বিপ্লব-আন্দোলন ফল্গুধারার ন্যায় বহিতেছিল, তাহা ১৯৪২ সাল হইতে স্রোতস্বিনীরূপে আসমুদ্র-হিমাচল প্লাবিত করিল। ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাংলার বিপ্লবীদিগের কার্য্য সাময়িক ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। বিপ্লবীগণের নিকট ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা আনয়ন করা আজীবন সাধনা ও স্বপ্নের বিষয়-বস্তু ছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে '৪২ সালের বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের ভিতর দিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল নেতাজী সুভাষ তাহার পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

এই বাংলা দেশের তরুণেরাই বন্দরের নিরাপদ ক্রোড়কে আঁকড়াইয়া থাকেন নাই, লাভ-ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব রাখেন নাই, পাথেয় এবং পথের বিচার করেন নাই। তাঁহারা তীরের সঞ্চয়কে পিছনে ফেলিয়া তরঙ্গ সঙ্কুল কূলহীন সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাইয়াছিলেন—আপনাদের সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া। তাঁহারা আজ নরদেহে বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাঁহাদের রক্তের পবিত্র ধারায় জাতির ললাট হইতে দাসত্বের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অপরাজেয় আত্মার অগ্নিশিখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লৌহজালকে পুড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের গরিমাময় মৃত্যুবরণ পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়কে সম্ভব করিয়াছে।

ভারতের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা মনে করিত ভারত স্বর্ণভূমি,—ইহার প্রতিটি ধূলিকণা স্বর্ণময়। এই বহুবিশ্রুত ঐশ্বর্য্যের লোভে এবং স্থল পথে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা দস্যুতা ইত্যাদির জন্য দুঃসাধ্য ও বিঘ্ন সঙ্কুল হওয়ায় ভারত আগমনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। কলম্বস ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন আমেরিকায়।

প্রথম ইউরোপীয়ের ভারতে পদার্পণ

ভারত আগমনের প্রথম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন পর্ত্তুগালবাসী ভাস্কো ডা গামা। তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে অবতরণ করেন। কালিকট অধিপতি জামোরিণ ভারতের চির অভ্যস্ত আতিথ্য সহকারে, পরম সমাদরে ভাস্কো ডা গামা ও তাঁহার অনুচরগণকে অভ্যর্থনা করেন। এই আতিথেয়তা ও অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে শীঘ্রই এই ধূর্ত্ত বণিকদল উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্রের বলে তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর, কোচিন, সিংহল, অর্মুজ, ডিউ, গোয়া ও নেগাপত্তনে পর্ত্তুগীজ পতাকা সগর্ব্বে উত্তোলিত হয়।

উল্লিখিত বন্দরগুলিতে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের একাধিপত্য করিয়া এবং লুণ্ঠন চালাইয়া পর্ত্তুগীজেরা অত্যন্ত ধনগর্ব্বিত হইয়া পড়িল। পর্ত্তুগীজেরা এক হাতে তরবারি অন্য হাতে যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি অঙ্কিত ক্রশ লইয়া ভারতে প্রবেশ করে। প্রচুর স্বর্ণের সন্ধান পাইয়া তাহারা ক্রশ ত্যাগ করিয়া দুই হাতে স্বর্ণ আহরণে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে তাহারা এত অজস্র স্বর্ণের অধিকারী হইল যে, তাহাদের আর তরবারি ধারণেরও ক্ষমতা রহিল না এবং তাহারা অনায়াসেই পরবর্ত্তীকালে আগত ওলন্দাজদের দ্বারা ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত হইল।

ভারতে যে ইংরাজ প্রথম পদার্পণ করেন তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন হকিনস্। ইনি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম জেমস্-এর নিকট হইতে মোগল সম্রাটের বরাবর একখানি পত্র লইয়া সুরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাঁহাকে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া সুরাটে ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাটের উপকূলভাগের নিকট ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন বেণ্ট পর্ত্তুগীজ বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাহার ফলে সুরাটে এবং পরে হুগলীতে ইংরাজের কুঠী স্থাপিত হয়। অতঃপর জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক জাহাঙ্গীরের কন্যার এবং শাহ্ সুজার জনৈকা বেগমের রোগ আরোগ্য করায় ভারতে ইংরাজেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা লাভ করে।

ইংরাজ আগমনের সূত্রপাত

ভারতে ব্যবসায়ের ফলে পর্ত্তুগীজদের ঐশ্বর্য্যই অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলিকে ভারত আগমনে প্রলুব্ধ করে। ইংরাজদিগেরও পরে ভারতে ফরাসীগণ আগমন করে। ক্রমে এইসব বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শেষ পর্য্যন্ত সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। মোগল-শাসিত ভারত ক্রমে ইউরোপীয় বণিকগণের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেবল তাহাই নহে ইংরাজ বণিকগণের পরস্পরের মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। ইংরাজগণের অর্থলোভপ্রসূত এই কলহ সম্বন্ধে ডক্টর সি. আর. উইলসন লিখিয়াছেন :

"বাংলা দেশে অবস্থিত ইংরাজরাও তাহাদের কলহের জন্য সমভাবেই

কুখ্যাত ছিল। এই কলহ অতিরিক্ত ধন স্পৃহা ও তাহাদের প্রভুদের দ্বারা প্ররোচিত গুপ্তচর বৃত্তির প্রতি আগ্রহের স্বাভাবিক ফল।...বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ তাহাদের নীচ, কলহপরায়ণ, ও অসাধু বণিকের দল বলিতেন।" ভারতবর্ষ এই ইংরাজদিগের নিকট ছিল লুণ্ঠিত সম্পত্তি। কেবল মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ নহেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারী ও অনুচরেরাও কে কিভাবে এই লুণ্ঠিত সম্পত্তির বেশী অংশ আত্মসাৎ করিবে, এই লইয়াই কলহের সৃষ্টি হইত।

ইংরাজ বণিকেরা প্রথম সুরাটে পদার্পণ করিলেও পূর্ব্ব ভারতেই তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। এই বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশেরই পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশ তখন অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। বাংলায় তৎকালে কোন নৌবাহিনী ছিল না। কিন্তু পশ্চিম ভারতে মারাঠাদের নৌবাহিনী ছিল। তাহা ছাড়া বাংলা দেশের লোকেরা ইংরাজ বণিকদের কৃত্রিম সাধুতার মুখোস পরা ইংরাজ ব্যবসায়ীসুলভ আচরণে তাহাদের উপর সন্তুষ্টই ছিল। কিন্তু সুরাটের লোকেরা ইংরাজ বণিকদের দীর্ঘকায় মাষ্টিফ কুকুর অপেক্ষাও হিংস্রতর ঘৃণ্য পশু বলিয়া মনে করিত। সুতরাং সুরাটে ইংরাজ বণিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা করিতে পারে নাই।

ভারতে যে সমস্ত ইউরোপীয় বণিকদল বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথমে ফরাসীদের মস্তিষ্কে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা উদিত হয়।

ফরাসীদের অনুকরণে ইংরাজও ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই বণিকদলের দুর্গ স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়া বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ বলিয়াছিলেন "তোমরা বণিক, তোমাদের দুর্গ স্থাপনের প্রয়োজন কি? তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণে আছ সুতরাং কোন শত্রুর ভয় তোমাদের নাই।"

আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুকালে সিরাজদ্দৌলাকে ইংরাজদের সম্পর্কে বলিয়া-

ছিলেন, "ইহাদের দুর্গ স্থাপন বা সৈন্য সংগ্রহ করিতে দিয়া বিপদে পড়িও না। যদি তাহা দাও তাহা হইলে এদেশ আর তোমাদের থাকিবে না।"

দূরদর্শী আলিবর্দ্দী খাঁর এই ভবিষ্যৎবাণী পরবর্ত্তীকালে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। "বাংলা দেশের নরম মাটির ভিতর দিয়া ইংরাজ সমগ্র ভারতে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। ভেদ সৃষ্টির দ্বারা জয় করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া একজনকে অপর জনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া জাল, জুয়াচুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যার আশ্রয় লইয়া ইংরাজ সমগ্র ভারতে অধিকার স্থাপন করে।

পলাশী ও বক্সার যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যায়ের পর ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিলেও বাংলার জনগণ এই পরাজয় সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ইংরাজ বণিক বাণিজ্যলোভে বঙ্গদেশে আসিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে চাহিয়াছিল। দেশের সহিত, শাসন-ক্ষমতার সহিত, বাংলার জনগণের সুখ-দুঃখের সহিত, মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বেও ইংরাজ বণিক মুর্শিদাবাদের রাজপথে সভয়ে পরিভ্রমণ করিত।

ইংরাজের তথাকথিত বিজয়ের পর ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ বিতাড়নের চেষ্টা করেন মহারাজা নন্দকুমার। তিনি প্রথমে ইংরাজের পক্ষপাতী ছিলেন; পরে যখন দেখিলেন, ভারতীয়েরা সর্ব্বক্ষমতা হারাইতেছে তখন তিনি এই পরিকল্পনা করেন যে, বাদশাহ্ শাহ্ আলমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় অন্যান্য শক্তিদের সংযুক্ত করিয়া ইংরাজের বিপক্ষে তাহা পরিচালনা করিতে হইবে এইজন্য তিনি পুনাস্থ পেশওয়া-র সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। আলীবর্দ্দীখাঁর সময় হইতে বাংলা পেশওয়া-র চৌথ পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু শাহ্ আলম বাংলার দেওয়ানী ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদান করায় তাহার ব্যতিক্রম হয়। এই কারণে পেশওয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পেশওয়া-র প্রতিনিধি ও নন্দকুমারের প্রতিনিধি জগমোহন দত্ত ফরাসী চন্দননগরে

মহারাজা নন্দকুমার

আসিয়া মিলিত হইতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করিয়া তাঁহার সেক্রেটারী নবকৃষ্ণকে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ সমস্ত গুপ্ত সংবাদ হেষ্টিংস্কে জানাইয়া দেয়। রাজা নন্দকুমারকে একটা বিলাতী আইনের ধারা অনুযায়ী মিথ্যা জালিয়াতীর অপরাধে বিচারের প্রহসনের পর ফাঁসী দেওয়া হয়।

রাজা রামমোহন

বাংলার হিন্দুগণের দ্বারা দ্বিতীয় বারের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দিল্লীর নামে মাত্র বাদশাহকে শীর্ষ-স্থানীয় করিয়া ইংরাজের বিপক্ষে একটি নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। রামমোহনের আদর্শ তাঁহার মধ্যশ্রেণীর শিষ্যদের দ্বারা বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত করা হয় নাই। বাস্তাই পতনের দিন উপলক্ষে একবার তাঁহারা কলিকাতার অক্টর্লোনি মনুমেণ্টের উপরে ফরাসী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করিয়া ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি দিবস পালন করেন। রাজা রামমোহন কর্ত্তৃক আনীত ফরাসী বিপ্লবের চিন্তার ধারা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের শোচনীয় পরাজয়ের পর নন্দকুমারের সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর কাল বাঙ্গালী বিদেশী কবল বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া সমূর্ত্ত হইয়াছে।

## ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ

বাংলার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর মীরজাফর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইংরাজ সেনার সহায়তা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মাসিক তন্‌খা প্রদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজমুকুটের মূল্য স্বরূপ রাজকোষের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল। মীরজাফরের কৃতকর্ম্মের ফলে ইংরাজের ঋণ অপরিশোধনীয় হইয়া উঠিল।

ইংরাজ অধিকারের প্রথম দলিল

মীরকাশিম বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার পর ঋণমুক্তির মূল্যস্বরূপ ১৭৬০ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর চাকলা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজকে "ইজারা-বন্দোবস্ত" করিয়া দিলেন। এই তিন স্থান হইতে যাহা আদায় হইবে তাহা ইংরাজগণ পাইবে এবং এক সনন্দ প্রদান করিয়া মীরকাশিম ইংরাজ বণিকের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিলেন। এ প্রদেশে ইংরাজ অধিকারের উহাই প্রথম দলিল। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ব্রাহ্মণভূম (৩) বরদা (৪) চন্দ্রকোণা (৫) চিতুয়া (৬) জাহানাবাদ (৭) মণ্ডলঘাট (৮) খারিজা মঙ্গলঘাট ও (৯) ভূরস্থট পরগণা চাকলা বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ৫৪ পরগণা লইয়া চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল। ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মেদিনীপুর ও বীরভূম অঞ্চলে অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় জঙ্গল মহালের জমিদারগণ ইংরাজের অধিকার অস্বীকার করিল। ১৭৬০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের অধীনে এক দল গোরা ও দেশী সিপাহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। ১৭৬১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে আর এক দল সৈন্য জনষ্টনের অধিনায়কত্বে প্রেরিত হইল। ঐ সময় মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মহারাষ্ট্রীয়দের অধীনস্থ ছিল এবং ইংরাজ-শক্তি ঐ সব অঞ্চলে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

১৭৬৬ সালে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল মহালে সৈন্য পাঠাইয়া স্থানীয় জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে এবং তাহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সৈন্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় কার্য্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে ঐ সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই প্রায় এক শত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ

তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট গ্রেহাম সাহেবের আদেশে লেপ্টেনাণ্ট ফার্গুসন ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য এক দল সৈন্য লইয়া জঙ্গল মহালে প্রবেশ করেন। কোম্পানীর সৈন্যদল নির্ব্বিচারে জঙ্গল মহালের অধিবাসিগণের উপর অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ঝাড়গ্রাম, ঘাটশীলা, লালগড়, রামগড়, কাশীজোড়া, ময়না, নয়াগ্রাম, জামিরপাল প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সুশিক্ষিত কোম্পানী-সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ইঁহারা প্রত্যেকেই পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা তাঁহারা স্বকীয় বাসস্থান ও দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া দুর্ভেদ্য অরণ্যে আত্মগোপন করা শ্রেয় বলিয়া মনে করেন।

গ্রেহামের নির্দ্দেশক্রমে ফার্গুসন বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমনের জন্য অত্যাচারের তাণ্ডব সৃষ্টি করেন। ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার না করার অপরাধে অপরাধী জমিদারগণের সম্পত্তি সমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া কোম্পানীর সহায়তাকারী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যে সমস্ত সৈনিক বিনা খাজনায় জমি ভোগ দখল করিতেছিল, তাহাদের সামান্য কারণে ও অজুহাতে উক্ত জমি হইতে উৎখাত করা হয়। ইহা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা-কামী মেদিনীপুরের অধিবাসিগণকে নির্ব্বিচারে কোম্পানীর লোকেরা হত্যা করে। ১৭৬৭ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারীতে লিখিত গ্রেহামের এক পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানীর দেশী সৈন্যদের ভিতর মধ্যে মধ্যে সেই সময় বিদ্রোহ দেখা

দিয়াছিল এবং বাহাদুর সিং নামক জনৈক সৈনিক ক্যাপ্টেন হোয়াইটের সহিত দেশীয় অধিবাসী দলনের অভিযানে যোগদান করিতে অস্বীকার করে।

ফার্গুসন সাহেব ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে স্থানীয় জমিদার কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত হয়েন। কিন্তু ঝাড়গ্রামের রাজার সহিত কোম্পানীর প্রবল সংঘর্ষ দেখা দিল। ফার্গুসন প্রথমে ঝাড়গ্রামের রাজাকে এবং তাঁহার দুই ভ্রাতাকে

ফার্গুসন-ঝাড়গ্রাম-রাজ সংঘর্ষ

গ্রেহামের নির্দ্দেশ-সম্বলিত পত্র দিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসিয়া বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব পাঠাইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব রাজা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভাবী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তিনি বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ফার্গুসন সাহেব ঝাড়গ্রামের রাজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানীর ভিতর দিয়া ঝাড়গ্রামরাজের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ঝাড়গ্রামের বৃদ্ধ তেজস্বী রাজা তাঁহার বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈনিকদের উপর দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, দুর্গে রক্ষিত ধন-রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এই অভিযান ফার্গুসনের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। চুয়াড় সৈন্যদিগের বিষাক্ত তীরে কোম্পানী-সৈন্যের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বহু প্রচেষ্টার পর ফার্গুসন ঝাড়গ্রামরাজের দুর্গ অধিকার করিয়া উপলব্ধি করেন যে, জমিদারের সৈন্যদল অক্ষত অবস্থায় দুর্গের আশে-পাশে গোপনে লুকায়িত আছে। দুর্গ জয় করিয়াও তিনি এই ভাবে জয়লাভের গৌরব হইতে বঞ্চিত হন।

অবশেষে পুনরায় কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজার নিকট চরম পত্র প্রেরিত হয়। এই চরম পত্রে ইংরাজের সহিত অনর্থক বিবাদ ও যুদ্ধের নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বলা হয়। অন্যথায় তাঁহাকে তাঁহার জমিদারী হইতে বিতাড়িত করা হইবে, এ কথাও জানান হয়। কোম্পানীর সুশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে একক শক্তি হিসাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব

বিবেচনা করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ১৭৬৭ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী ঝাড়গ্রাম-রাজ কোম্পানীর সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

ঝাড়গ্রাম অভিযান সপ্তাহ কালের মধ্যে নিষ্পন্ন হইলেও ঘাটশীলা অভিযান ফার্গুসনের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠিল না যখন তিনি বলরামপুর থানায় ছাউনি স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের ভয় দেখাইয়া বশ্যতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় ঘাটশীলার রাজার যুদ্ধের প্রস্তুতি সংবাদ আসিল। ১৭৬৭ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফার্গুসন গ্রেহামকে বলরামপুর থানা হইতে এক পত্রে লেখেন যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঘাটশীলার রাজা কোম্পানীর সৈন্যের আগমন সংবাদে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সর্ব্বক্ষণের জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যাহাতে একটিও ফিরিঙ্গী সৈন্য প্রবেশ করিতে না পারে, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পত্রের শেষাংশে ঘাটশীলার লৌহ, মোম, তৈল ও আরণ্য সম্পদের বিষয় উল্লেখ ছিল।

ঘাটশীলার বিদ্রোহী জমিদার

জঙ্গল-জমিদারদিগের মধ্যে ঘাটশীলার জমিদার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। ফার্গুসন এই দুর্গটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"উহা জঙ্গলের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি-পরিমাণ ১১৫ বর্গফিট এবং উহা সুবৃহৎ ও সুগভীর পরিখারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। চতুর্দ্দিকে কঙ্করময় গড়-প্রাচীর। উত্তর দিকে প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দুইটি দ্বারের সম্মুখেই দুইটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার, তৎপরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে জমিদারের বাটী। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৪ ফিট। গড়টির মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি তড়াগ আছে।"

কোন প্রকার হঠকারিতা না করিয়া ফার্গুসন কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ

করিয়া অভিযানের এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঘাটশীলা অভিযান ঝাড়গ্রামের ন্যায় এত সহজে সুসম্পন্ন হইবে না। স্থানীয় জমিদারগণ যাঁহারা পূর্ব্বেই কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন তিনি তাহাদের সহযোগিতায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযানে বাহির হন।

ঘাটশীলার যুদ্ধ

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ্চ ঘাটশীলা-রাজের সহিত প্রথম সংঘর্ষ বাধে। দুই সহস্র চুয়াড় সৈন্য বর্শা-ফলকের ন্যায় জামবুনির নিকট সুদীর্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর তাহারা নালায় পরিখার ভিতর আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী-সৈন্যের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত থাকায় ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। রাজার সৈন্যদলের সহিত এক প্রবল সংঘর্ষের পর ফার্গুসন বিন্দগ্রাম অধিকার করেন। এই গ্রাম অধিকার করার পর জঙ্গল-পথে মণ্ডল-কুড়ায় উপস্থিত হইলে চুয়াড় সৈন্যদলের সহিত এক হাতাহাতি সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষে বিস্তর সৈন্য হতাহত হয়। রাজার সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ কোম্পানী-সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিয়া গভীর অরণ্যের ভিতর হইতে গুলীবর্ষণ করে। ইহা ছাড়া "গরিলা যুদ্ধে" ইংরাজ সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। প্রবল প্রতিরোধের ভিতর দিয়া কোম্পানী-সৈন্য ৩২ মাইল পর্য্যন্ত জঙ্গল-পথ অতিক্রম করিয়া পুরুগ্রামে উপস্থিত হইলে তথায় রাজার সৈন্যদলের সহিত পুনরায় সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিল না। রাজসৈন্যের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া ফার্গুসন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ, সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করেন।

যুদ্ধের এই পর্য্যায়ে ঘাটশীলা-রাজের পক্ষ হইতে এক জন উকিলকে দিয়া ৫০০০৲ টাকা উৎকোচ স্বরূপ ফার্গুসনের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ফার্গুসন উৎকোচ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ আরও জোরে চালাইয়া গেলেন। রাজপক্ষ মরণ-পণ করিয়া যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বিজয়লক্ষ্মী কোম্পানী-সৈন্যকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাজা সসৈন্যে নিকটস্থ এক পাহাড়ে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে তাঁহার দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নির লেলিহান শিখা সমগ্র দুর্গ-অঞ্চল গ্রাস করার ফলে বহু মূল্যবান্ দ্রব্য-সামগ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও রাজা কোম্পানী-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে "গরিলা যুদ্ধ" চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে কিছু দিন পর বাংলার অন্যতম স্বাধীনতাকামী বৃদ্ধ রাজা ইংরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। এই তেজস্বী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

মেদিনীপুর অঞ্চলে যে সকল জমিদার ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হন, তন্মধ্যে খড়্গাপুরের নরহরি চৌধুরী অন্যতম। তিনি মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া স্বকীয় স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্পর্কে তাঁহার অনমনীয় মনোভাব বর্ত্তমান ছিল। উক্ত সময়ের এক পত্রে এই জমিদারের তেজস্বিতা ও স্বাধীন মনোভাবের বিষয় জানা যায়।

নরহরি চৌধুরী

"খড়্গাপুরের নরহরি চৌধুরী সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ হস্তগত হওয়ায় আমি তাঁহাকে কাছারী-বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাই। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, তিনি আমাদের প্রজা নন। ইহার পর আমি কোন প্রকার চরম পন্থা গ্রহণ না করিয়া আমার নাজিরকে এক পরোয়ানা সমেত পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি হাজির হওয়ার পরিবর্ত্তে দুই শত পাইক সৈন্য লইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।"

মেদিনীপুরের বিদ্রোহী দলকে সায়েস্তা করিতে যখন কোম্পানীর সৈন্যদল ব্যস্ত ছিলেন, তখন বীরভূমের জমিদার আসদ্ জমান খাঁ প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ক্যাপ্টেন হোয়াইট মেদিনীপুরে অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অপর দিকে মীরকাশিম স্বয়ং সিপাহী সেনার অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ সেনানায়ক

বীরভূমের যুদ্ধ

মেজর ইয়র্ক ও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ বাহুবলে ইংরাজ সৈন্যকে পরাস্ত করিবার আশায় সাধ্যানুসারে সেনা সংগ্রহ করিয়া আক্রমণাশঙ্কায় সতর্ক ভাবে রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাদল বীরভূমের দুর্গম প্রদেশ কড়েয়া নামক স্থানে গড়খাই করিয়া হানা দিয়া বসিয়াছিল। আসদ্ জমান খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে বীরভূমির নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কড়েয়াতে ছাউনি ফেলিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, নবাব সেনা কিছুদিনের জন্য বুধগ্রামে ছাউনি ফেলিতে বাধ্য হইল।

মীরকাশিম ও মেজর ইয়র্ক বুধগ্রামে এবং ক্যাপ্টেন হোয়াইট বর্দ্ধমানের উত্তরে ছাউনি ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। উভয় সেনাদল লইয়া আসদ্ জমান খাঁকে যুগপৎ আক্রমণ করা স্থির হইলে ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে উত্তর-পূর্ব্বাংশ দিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল। ক্যাপ্টেন হোয়াইট দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম; সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি সসৈন্যে একরূপ নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে ক্যাপ্টেন হোয়াইটের সেনাদল সহসা তাঁহার শিবিরের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সামরিক ব্যাপারে এইরূপ অকস্মাৎ শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে যাহা হইয়া থাকে আসদ্ জমান খাঁর সেনাদলের তাহাই হইল; তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীরকাশিম সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ায় পলায়নপর বিদ্রোহী সেনাদলের পরাজয় সহজেই সুসম্পন্ন হইল। এইভাবে বীরভূমি অর্থাৎ বীরভূম, বর্দ্ধমান, ও মেদিনীপুর কোম্পানীর পদানত হইল।

## সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও বীরভূম অঞ্চলে যখন ইংরাজ বণিক দল নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকির দলের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ইহারা কখনও সম্মুখ যুদ্ধে কখনও বা গরিলা যুদ্ধে নবাব ও ইংরাজের সিপাহীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ইংরাজ ও নবাবের অর্থ যে কোন সুযোগে ইহারা লুণ্ঠন করিত।

সন্ন্যাসী ও ফকিরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ আকবরের আমলে সশস্ত্র সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। রেভারেণ্ড ডাঃ ফার-কুহারের এক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে সহস্র সহস্র মুসলমান ফকির যখন নিজেরা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত না, তখন তাহারা ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে কার্য্য করিত; তাহা ছাড়া সৎ মুসলমানের কার্য্য হিসাবে নিরস্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের হত্যা করাও তাহাদের অন্যতম কাজ ছিল। মুসলমান রাজত্বে ঐ সকল ফকির বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার প্রবল ভাবে দেখা দেয়, তখন কাশীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে রাজা বীরবল উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক আলোচনার পর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র অব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

সশস্ত্র সন্ন্যাসীর উৎপত্তি

সম্রাট্ এই সকল সন্ন্যাসীদের সরকারী বিধি-নিষেধের হাত হইতে অব্যাহতি দেন। অবশ্য প্রথমে এই সন্ন্যাসী দল ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের রক্ষা-কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে ইহারা নিজেদের মধ্যে জমি-জমার ব্যাপারে

প্রায়ই মারামারি করিত। কেহ বা আশ্রম, মঠ প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসী জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কেহ কেহ বিবাহ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে লাগিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর একবার গিরি ও পুরী সম্প্রদায়ের থানেশ্বরের যুদ্ধ পরিদর্শন করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ যুদ্ধের কারণ বিবৃত করিয়া বলেন যে, গ্রহণ-স্নান উপলক্ষে কাহারা অগ্রে স্নান করিবে এই লইয়া যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহাই ঘোর যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে একবার সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের মধ্যে এক খণ্ড-যুদ্ধে বহু বৈরাগী হতাহত হয়। একবার নাগাদের সহিত মাদারী ও জেলালী সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকিরদের প্রবল যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। জেমস্ গ্রাণ্টের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, একবার সশস্ত্র সন্ন্যাসী দল একটি বৃদ্ধার নেতৃত্বে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্রাট্-সৈন্যকে পরাজিত করে এবং উক্ত দল সম্রাটের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী দলের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গগরা নদী হইতে সুদূর ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ইহাদের গতি ছিল অবাধ। সন্ন্যাসী-দের অধীনে সুদক্ষ গুপ্তচর বিভাগ ছিল। ইহারা ইংরাজ ও মুসলমান ধনী ও নবাবদের সুরক্ষিত অর্থের সন্ধান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণে সিপাহী-সংখ্যা কিরূপ আছে তাহার বিশেষ বিবরণ সন্ন্যাসী দলপতিদের নিকট সরবরাহ করিত।

সশস্ত্র মুসলমান ফকির দলের স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা স্বয়ং নিজেদের নামের পরে শাহ্ অর্থাৎ রাজা উপাধি গ্রহণ করে। ইহারা গোঁড়া মুসলমান ছিল না। দবিস্থান গ্রন্থকারের মতে ইহারা প্রকৃত পক্ষে সুফী মতাবলম্বী হিন্দু ছিল। মাদারী ফকির দল অবধূত সন্ন্যাসীদের ন্যায় জটা রাখিত এবং সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিত। মাদারীদের মধ্যে বদিতেদ্দিন মাদার বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন। হিন্দুগণ ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল এবং ইনি কানপুরের নিকটবর্ত্তী মাখনপুরে স্থায়ীভাবে বাস

করিতেন। ফকির দলের মধ্যে মজনু শাহ্ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজ সৈন্যদের সহিত ইঁহার বহুবার সংঘর্ষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের বিখ্যাত ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী মজনু শাহেরই দলভুক্ত ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলে যে ফকির দল বাস করিত তাহাদের সহিত ভ্রাম্যমাণ ফকির দলের যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের ১৭৬১ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বরের এক পত্রে সর্ব্ব-প্রথম সন্ন্যাসীদের বাংলায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বর্দ্ধমান দখলের সময় ইংরাজের সহিত বর্দ্ধমানের রাজা মিশ্রী খান, হুধার সিং, সশস্ত্র ফকির দল এবং বীরভূম হইতে আগত এক সেনাদলের বর্দ্ধমান ও সাংতাগোলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালে সিংহাসনচ্যুত নবাব মীরকাশিম সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টায় সন্ন্যাসী দলের সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ অঞ্চলে এক দল সন্ন্যাসী ও ফকির দলের আবির্ভাব হয়। এই দলকে বাধা দিতে গিয়া স্থানীয় কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ কেলির জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই সন্ন্যাসীদল কোম্পানীর ঢাকার কারখানা দখল করে। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ লিসেষ্টার সদলবলে কারখানা হইতে পলায়ন সমর্থন করিয়া কোম্পানীর নিকট এক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, "কারখানা হইতে মজুর দল পূর্ব্বেই পলায়ন করায় সিপাহীদের মজুরের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। নদীর উপর অল্প যে কয়খানি নৌকা ছিল তাহাতে প্রথমে অসুস্থ ব্যক্তিদের, পরে অর্থ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর ছাউনির সৈন্য সমেত পলায়ন করা স্থির হয়। কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য না হওয়ায় ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।" ইহার কিছু দিন পরে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের অধীনে এক সিপাহী দল পুনরায় উক্ত কারখানা অধিকার করে।

কোম্পানীর ঢাকা কারখানা দখল

লস্করপুরের তদানীন্তন কালেক্টারের এক পত্রে জানা যায় যে, ১৭৬৩ সালে

রামপুর বোয়ালিয়ার কারখানা সন্ন্যাসীদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ বোনট বন্দী হইয়া পাটনায় নীত হন। ১৭৬৩ সালের অক্টোবর মাসে পাটনায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

১৭৬৬ সালে কুচবিহার রাজ্যে আভ্যন্তরিক গোলযোগ দেখা দেয়। কুচবিহারের নাবালক রাজা ভুটিয়াদের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, কিন্তু রামানন্দ গোঁসাইয়ের প্ররোচনায় নাবালক রাজাকে হত্যা করা হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে ভুটিয়াদের সহিত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি রুদ্রনারায়ণের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। সংঘর্ষে রুদ্রনারায়ণ পরাজিত হন এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রুদ্রনারায়ণের বিপক্ষে সন্ন্যাসীদল ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে কার্য্য করে। লেঃ মরিসন এক দল সিপাহী লইয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে তাড়া করিয়া মোঙ্গলঘাট (বর্ত্তমানে মোগলহাট) নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় এক যুদ্ধে সন্ন্যাসীদল পরাজিত হয়। সন্ন্যাসীদলের পিছু ধাওয়া করিয়া লেঃ মরিসন দীনহাটায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেইখানে এক দল সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল, হঠাৎ ইংরাজের সিপাহী আসিয়া পড়ায় তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষ হয়। লেঃ মরিসন অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু রিচার্ড ও ক্যাপ্টেন রেনেল সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং এক জন আর্ম্মেনীয় সৈন্য নিহত হয়।

এই সময় দলে দলে সন্ন্যাসী আসিয়া উত্তর বঙ্গ ভরিয়া ফেলে। ১৭৬৯ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান আরম্ভ করেন। লেঃ কীথের অধীনে কয়েক দল পরগণা সিপাহী রংপুর অভিমুখে যাত্রা করে। এক সংঘর্ষের ফলে ইংরাজের সিপাহীদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং লেঃ কীথ যুদ্ধে নিহত হন।

সন্ন্যাসীদলের শক্তি বৃদ্ধি

লেঃ কীথের মৃত্যুর ফলে সন্ন্যাসীদল আরও উৎসাহিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর পরিদর্শক নিযুক্ত হয়। রাজসাহী অঞ্চলের পরিদর্শক Mr. Boughton Rous ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে

কোম্পানীর নিকট এক পত্রে জানান যে, "সঙ্কট কালে সন্ন্যাসীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট সিপাহী সৈন্য আছে। শিবগঞ্জ পর্য্যন্ত যে সন্ন্যাসী দল আসিয়াছিল তাহারা আমাদের অবস্থানের বিষয় জানিতে পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।" সন্ন্যাসীদের উপর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব পত্রে ব্যবহৃত ভাষা হইতেই জানা যায়। এক স্থানে Mr. Rous সন্ন্যাসীদের "pernicious tribe" বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলেন যে, "ইহাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কড়া নজর রাখিয়াছি।"

রংপুরের পরিদর্শক মিঃ জন গ্রোস ১৭৭০ খৃঃ ২০শে এপ্রিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আরও অতিরিক্ত সিপাহী সৈন্য চাহিয়া পাঠান। তিনি উক্ত পত্রে লেখেন যে, "আমরা সকল সময়ের জন্য সন্ন্যাসী অথবা ভবঘুরে লুণ্ঠক দল যে কেহ আসুক না কেন তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছি। তাহারা গত বৎসর যে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহার ফলে হয়তো আরও উৎসাহিত হইয়া এই বৎসরেও আসিতে পারে।" ইহাদের ধারণা সত্যে পরিণত হয় এবং সন্ন্যাসীদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না।

ঐ বৎসরে নভেম্বর মাসে দিনাজপুরে কোম্পানীর পরিদর্শক এক দল ফকিরের আবির্ভাবের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। দিনাজপুরের রাজা ফকিরদের বিরুদ্ধে দশ জন সিপাহী ও এক শত বরকন্দাজ প্রথমে প্রেরণ করেন কিন্তু পরে তিনি জানিতে পারেন যে, ফকিরদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইবে। এই সংখ্যাধিক্যের কথা জানিতে পারিয়া তিনি বরকন্দাজ ও সিপাহীদের ফিরাইয়া আনেন। দিনাজপুর, রংপুর ও পুর্ণিয়ার কোম্পানীর পরিদর্শকদের নিকট কাউন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত দুই-এক দল সিপাহীর জন্য রাজমহলের ক্যাপ্টেন মুডসনের নিকট আবেদন করার নির্দ্দেশ পাঠান।

১৭৭১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার অধ্যক্ষ Mr. Kelsallএর এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "সন্ন্যাসীদল বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া কর আদায় করিতেছে।

সর্ব্বশেষ তাহাদের ময়মনসিংহের নিকটবর্ত্তী বাইগুনবাড়ীর নিকট দেখা গিয়াছে।" এই বৎসরে ২৫শে মার্চ্চ ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) ও গোবিন্দগঞ্জ অঞ্চলে লেঃ টেইলার এক দল সন্ন্যাসী ও ফকিরকে পরাজিত করেন। দলপতি মজনু শাহ্ মহাস্থানগড়ে পলায়ন করেন। কোম্পানীর সৈন্য মজনু শাহ্‌কে বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

মজনু শাহ্

১৭৭২ সালের প্রথম দিকে মজনু শাহ্ দলপুষ্ট হইয়া রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে দেখা দেন। গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কোম্পানীর লোক-জন তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করে তাহার উল্লেখ করিয়া মহারাণী ভবানীর নিকট এক পত্রে তিনি তাঁহার সহানুভূতি ভিক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, "বাংলা দেশে তাঁহারা সদলবলে প্রতি বৎসর মন্দির ও তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং বাংলার জনগণের নিকট ভাল ব্যবহার, ভিক্ষা ও অন্যান্য সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সদলে পরিভ্রমণ করিলেও কাহারও উপর কোন অত্যাচার ঘটে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত বৎসর ১৫০ জন ফকিরকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ফকিরগণ বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করিত, কিন্তু তাহাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাহারা বর্ত্তমানে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চলা-ফেরা করিতেছে। ইহাতে ইংরাজগণ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের চলা-ফেরা ও দেবমন্দির দর্শনে অন্যায়ভাবে বাধা দিতেছে। আপনিই এই দেশের কর্ত্রী। আমরা ফকিরগণ সর্ব্বদাই আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি।"

এই সময়কার নথীপত্রে দেখা যায়, মজনু শাহ্ তাঁহার দলীয় লোক-জনকে গ্রামবাসীদের উপর কোন রকম খারাপ ব্যবহার বা জুলুম না হয় সেই প্রকার নির্দ্দেশ দেন। নির্দ্দেশে আরও বলা হয় যে, গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছায় যাহা দান করিবে তাহাই যেন গ্রহণ করা হয়।

১৭৭২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ণিয়ায় কালেক্টর, রংপুর সারকিট কমিটির

সভ্য মিঃ গ্রেহামকে জানান যে, কয়েক দল সন্ন্যাসী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে পুনরায় দেখা দিয়াছে। ইহারা গ্রামবাসীদের উপর কর ধার্য্য করিয়া অর্থ আদায় করিতেছে। আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে, উক্ত সন্ন্যাসীদল রংপুরের অন্তর্গত ভবানীগঞ্জ কাছারী লুণ্ঠন করিয়াছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রংপুরের কালেক্টরের উপর নির্দ্দেশ দেন যে, অবিলম্বে দিনাজপুরে অবস্থিত সিপাহীদল লইয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের পথে সন্ন্যাসী দলকে অনুসরণ করা হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনে একদল সিপাহী ২৯শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে জাফরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ৩০শে ডিসেম্বর ভোর বেলায় কোম্পানীর সৈন্য রংপুর সহরের পশ্চিম দিকে শ্যামগঞ্জের সমতল ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী দলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত সন্ন্যাসীদল প্রায় পনের শত ছিল। প্রথমে সন্ন্যাসীদল পশ্চাদপসরণ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কোম্পানীর সিপাহীদল সন্ন্যাসীদের তাড়া করিয়া নিজেদের যুদ্ধের রসদ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে। ইহার পর সন্ন্যাসীদের পাল্টা আক্রমণ হয়। কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসীদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ক্যাপ্টেন টমাস্ সিপাহীদের শেষ চেষ্টা হিসাবে বেয়নেট চার্জ্জ করিবার আর্দেশ দেন। সিপাহিগণ এই আদেশ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। ক্যাপ্টেন টমাস্ যুদ্ধে নিহত হন। দেশীয় লোকেরা কোম্পানীর লোক-জনকে সাহায্য করা দূরের কথা বরং লাঠি লইয়া সন্ন্যাসীদলের সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগদান করে। কোম্পানীর যে-সকল লোক প্রাণভয়ে জঙ্গলে ও বড় বড় ঘাসের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সন্ন্যাসীদের হাতে ধরাইয়া দেয়। সিপাহিগণ গ্রামের অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া সিপাহীদের ধরাইয়া দেয় এবং অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লয়।

কোম্পানীর সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়

সন্ন্যাসীদল কোম্পানী-সৈন্যকে পরাজিত করিবার পর ব্রহ্মপুত্র স্নানে সদলবলে যাত্রা করে। সারকিট কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে, সন্ন্যাসীদল পুনরায় এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যেন বাধা দেওয়া হয় এবং

বিহারে রক্ষিত সেনাদলের যেন সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সেই ভাবেই কাজ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই পরগণা সিপাহীদল পুনরায় সন্ন্যাসীদের নিকট পরাজিত হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের মৃত্যুর পর ১৭৭২ খৃঃ শেষ ভাগে এক দল সন্ন্যাসী কুচবিহার অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় গিয়া দর্পদেবের সন্ন্যাসীদলের শক্তি বৃদ্ধি করে। কুচবিহার রাজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া দর্পদেব ও নাজিরদেবের পুরাতন কলহ তখনও চলিতেছিল। দর্পদেবের অধীনস্থ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী-সৈন্য সন্তোষগঞ্জের দুর্গ দখল করিয়া লইল। নাজিরদেব তাহার পুরাতন বন্ধু ইংরাজের শরণাপন্ন হইল। রংপুরের কালেক্টর Mr.Purling কুচবিহারে গিয়া নাজিরদেব ও নাবালক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নাজিরদেবের অধীনেও একদল বেতনভুক্ সন্ন্যাসী ছিল ; অপরাধের অজুহাতে Mr. Purling সন্ন্যাসী দলকে বিদায় দিবার পরামর্শ দেন। সন্ন্যাসী দল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল, এই বিদায় দিবার প্রস্তাবে তাহারা বরং সন্তুষ্ট হইল।

সন্ন্যাসীদের দমন করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহার সৈন্যদল পুনর্গঠিত করিলেন। সশস্ত্র সন্ন্যাসী দলকে যে কোন প্রকারে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য জেলায় জেলায় নির্দ্দেশ পাঠাইলেন। রংপুরের কালেক্টরের নির্দ্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়াট রাজমহল হইতে একাদশ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য লইয়া জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাপ্টেন জোন্স রংপুর হইতে আর একদল সৈন্য লইয়া কুচবিহার অভিমুখে রওনা হন। হেষ্টিংসের নির্দ্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে সাহায্য করিবার জন্য বহরমপুর হইতে আর একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। দানাপুর হইতে আর একদল সৈন্য পূর্ণিয়ার উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের যাতায়াতের পথে প্রেরিত হয়। সুযোগ সুবিধা হইলে কুচবিহারে ক্যাপ্টেন জোন্সের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার নির্দ্দেশও তাহাদের দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন জোন্স ২৭শে জানুয়ারী পাটগাঁ পৌছাইবার পর সংবাদ আসে যে, সন্ন্যাসীদল মাত্র আট মাইল

দূরে আছে এবং তিন মাইলের মধ্যে আরও দুইটি দল আছে। দর্পদেব তখন ভুটান ও রহিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী লক্ষ্মীপুর নামক গিরিপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই গিরিপথের যুদ্ধে দর্পদেব পরাজিত হন।

সন্ন্যাসীদের পরাজয়

২৮শে জানুয়ারী শিবগঞ্জ হইতে ক্যাপ্টেন জোন্স সন্ন্যাসীদের পরাজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে একজন, নিহত ও চারজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। সন্ন্যাসীদল বিচ্ছিন্ন ভাবে পলায়ন করে। নৌকাযোগে তিস্তা নদী পার হইয়া তাহারা সমস্ত নৌকা ডুবাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট রাজমহলে গঙ্গা পার হইয়া দিনাজপুর হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে পৌছাইবার পর সোজা জলপাইগুড়ি যাইবার নির্দ্দেশ পান। জলপাইগুড়ির যুদ্ধেও দর্পদেব ও তাঁহার সন্ন্যাসীদল পরাজিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি ইংরাজদের দখলে আসে।

জলপাইগুড়িতে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সন্ন্যাসীদল নিরুৎসাহ না হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। ১৭৭৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ইহাদের পুনরাবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় এবং এই বৎসরেই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। বগুড়ার কালেক্টর মিঃ হাচ্ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক সংবাদ পাঠান যে, চৌগাঁ অঞ্চলে জমিদারের নায়েবকে সন্ন্যাসীদল বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। উপযুক্ত মুক্তিপণ ব্যতীত তাহার উদ্ধারের আশা নাই। সেই সময় তিন সহস্র সন্ন্যাসী বগুড়া হইতে বারো মাইল দূরে সেরপুরে অবস্থান করিতেছিল।

৮ই জানুয়ারী মিঃ হাচের আর এক পত্রে প্রকাশ যে, বগুড়ায় অস্ত্র-শস্ত্রপূর্ণ ৮০টি গরুর গাড়ী, এক শত ঘোড়া সমেত দুই সহস্র সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত এলাকায় সশস্ত্র সন্ন্যাসীদলের আবির্ভাবে তিনি প্রমাদ গণিলেন। সন্ন্যাসীদের সহিত কোন প্রকার সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য জমিদারদের পক্ষ হইতে দুইজন নায়েব ও কোম্পানীর উকিল সমেত সন্ন্যাসী দলপতির সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিসন্ধি জ্ঞাত হন। বারো শত টাকার বিনিময়ে সন্ন্যাসীদল স্থানত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। জমিদারগণ অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইলে কোম্পানীর কোষাগার হইতে উক্ত অর্থ জমিদারগণকে অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়। অর্থপ্রাপ্তির পর সন্ন্যাসীদল বগুড়া হইতে শিবগঞ্জে গিয়া আরও চারি সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সহিত মিলিত হয়।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের অভিযান

এই সংবাদ অবগত হইয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে অবিলম্বে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে চিলমারী অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ দেন। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড তিন কোম্পানী সিপাহী সৈন্য লইয়া ১৭ই জানুয়ারী রংপুর জেলার অন্তর্গত উলিপুর হইয়া পর-দিবস চিলমারীতে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে, ১২ই তারিখে সন্ন্যাসীদের একটি ক্ষুদ্র দল তথায় পৌছাইয়া স্থানীয় জমিদার ও দুই জন বিশিষ্ট অধিবাসীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের নিকট হইতে ১৩০০৲ টাকা আদায় করে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, সন্ন্যাসী-দল দেওয়ানগঞ্জ, বসনাপুর হইয়া ময়মনসিং-এর মধুপুর জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে। উক্ত জঙ্গলে সন্ন্যাসী দলপতিদের স্থাপিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গলে আত্মগোপন করার পর সন্ন্যাসীদের গতিবিধি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই।

২৬শে জানুয়ারীর এক পত্রে ঢাকার কালেক্টর বলেন, "আমি অদ্য ময়মনসিং-এর পরগণা-জমিদার কিষেণ রায়ের নিকট হইতে ২০শে জানুয়ারী তারিখের এক পত্র পাইয়াছি। উক্ত পত্রে জানা যায় যে, দরিয়ান গিরির নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল জামালপুরের অন্তর্গত জাফরশাহী পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের নায়েবকে আটক রাখিয়া ইহারা ১৬ শত টাকা আদায় করে। ইহার পর সন্ন্যাসিগণ মধুপুর, মুক্তাগাছা জমিদারের আলাপসিং পরগণা হইয়া ময়মনসিং অভিমুখে যাওয়ার সংবাদ পাইয়াছি।"

উক্ত পত্রে আরও জানা যায় যে, মতি গিরির অধীনে ছয় হাজার সন্ন্যাসীর আর একটি দল দরিয়ান গিরির দলের সহিত মিলিত হইবার জন্য ময়মনসিং-এর দিকে

যাত্রা করিয়াছে। দলের সামরিক শক্তির এক বর্ণনা করিয়া পত্রলেখক বলেন যে, ইহাদের সহিত প্রচুর গাদা বন্দুক, বল্লম ও অন্যান্য সামরিক অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে।

সন্ন্যাসীদলের প্রস্তুতি

২৯শে জানুয়ারী কালেক্টরের নিকট প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, প্রায় ৩৫০০ শত সন্ন্যাসীর একটি দল আলাপসিং পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদারদের গোমস্তা কিঙ্কর সরকার ও রমাপ্রসাদ রায়ের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জমিদার ৩৫০০৲ টাকা খেসারত দিয়া আত্মরক্ষা করে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিভাগের এক সংবাদে জানা যায় যে, জরওয়াল গিরির অধীনে একটি দল পনেরটি নৌকাযোগে চিলমারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঢাকার কালেক্টর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক পত্রে জানান যে, পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল ঢাকার নিকটবর্ত্তী কাগমারী অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিরোধের জন্য তিনি নোয়াখালী ও যশোহর হইতে কয়েকটি সিপাহীদল চাহিয়া পাঠান। ৬ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসীরা পাথরঘাটা হইয়া বংশী নদী অতিক্রম করিয়া মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। গতিবিধি দেখিয়া কোম্পানীর লোকেরা সন্ন্যাসীদলের গন্তব্য স্থল ঢাকা বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য ঢাকাকে উপযুক্ত ভাবে সুরক্ষিত করা হয়। কিন্তু একদল সন্ন্যাসী ঢাকা অভিমুখে আসিয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। উক্ত ঘটনার পর মনে হয়, সন্ন্যাসীদের কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন ঘটে।

৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসিগণ পুনরায় বংশী নদী পার হইয়া আতিয়া পরগণা অভিমুখে গিয়াছে। সন্ন্যাসীরা যখন মধুপুরের জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল তখন ঢাকার কালেক্টর হরকরা মারফৎ সংবাদ পান যে, কোম্পানী-সৈন্য বাইগুনবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

সন্ন্যাসীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবাদ জানিতে পারিয়া দিনাজপুরের কালেক্টর ও সারকিট কমিটি জলপাইগুড়িতে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে অবিলম্বে

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের সহিত যোগদান করিতে নির্দ্দেশ পাঠান। ইহা ছাড়া ক্যাপ্টেন জোন্সকে অবিলম্বে পাঠাইবার জন্য রংপুরের কালেক্টরকে আদেশ পাঠান হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে জানা যায় যে, হনুমন্ত গিরির অধিনায়কত্বে এক দল সন্ন্যাসী ৬ই ফেব্রুয়ারী আতিয়া হইতে পাকুল্লা পৌঁছিয়াছে। মিরজাপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক জমিদারের গোমস্তা রামলোচন বসুর নিকট হইতে ৪২০০৲ শত টাকা আদায় করিয়া জমিদারের উকিলকে ঢাকা যাইবার পথ জোর করিয়া দেখাইতে বাধ্য করে। উক্ত দল সেই দিনই বিমহাটি আসিয়া পৌঁছায়। তথায় কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যের অবস্থানের সংবাদ পাইয়া তাহারা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর, পাথরঘাটা হইয়া মধুপুর জঙ্গল অভিমুখে চলিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানের ধনী জমিদার ও তালুকদারগণ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হন।

এদিকে সন্ন্যাসীদের ঢাকা অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাহাদের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহারা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয় অবগত হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে সন্ন্যাসীদের অনুসরণে নিবৃত্ত হইবার নির্দ্দেশ পাঠান। কারণ, তাঁহার মতে দেশী সিপাহীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা বিপজ্জনক। কিন্তু তিন সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সম্মুখীন হওয়ার ফলে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় নাই।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড ও ডগলাস্ নিহত

সন্ন্যাসীদের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কোম্পানীর মূল সিপাহী সৈন্য হইতে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড ও সার্জ্জেণ্ট মেজর ডগলাস্ এবং বারো জন সিপাহী সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যরা সন্ন্যাসীদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিহ্বল হইয়া যায় ও চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। কিন্তু কোম্পানী সৈন্যের নায়ক ডগলাস্ ও এডওয়ার্ডের পক্ষে পলায়ন সম্ভবপর হয় নাই। তরবারি ও বল্লমের আঘাতে সার্জ্জেণ্ট মেজর ডগলাস্ যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু

ক্যাপ্টেন টিমোথি এডওয়ার্ডের মৃতদেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র তাঁহার টুপী সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বারিপুরের খালে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীদের সহিত যুদ্ধে কোম্পানী সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ওয়ারেন হেষ্টিংস্ জ্ঞাত হইলে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দেশী সিপাহী সৈন্যের নায়ক জয়রাম সুবেদারের উপর গিয়া পড়িল। তিনি মেদিনীপুরের কালেক্টরকে নির্দ্দেশ পাঠাইলেন যে, "ক্যাপ্টেন ফরবেস্, চতুর্দ্দশ ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষ জয়রাম সুবেদারকে—যিনি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন—যেন অবিলম্বে আটক করিয়া সামরিক পাহারায় সিপাহী জেনারেলের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির করে।" বিচারের প্রহসনের পর জয়রাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কামানের তোপের মুখে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

জয়রাম সুবেদারের মৃত্যুদণ্ড

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পরাজয়ের পর দেড় হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল কুমারখালি কারখানার আট মাইল দূরে ১১ই মার্চ্চ তাঁবু স্থাপনা করে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, পরে উক্ত দল মামুদশাহী ও যশোহর অভিমুখে চলিয়া যায়।

জয়ের উৎসাহে উৎসাহী হইয়া আরও কয়েকটি সন্ন্যাসীদল প্রধান দল হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যায়। তথায় গিয়া শ্রীহট্ট আক্রমণের জন্য জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে। ১০ই মে-র সংবাদে জানা যায় যে, স্থানীয় কালেক্টর মিঃ থ্যাকারে কয়েকটি কামান মাটির দুর্গে প্রোথিত করিয়া সন্ন্যাসীদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যখন সন্ন্যাসীদল কোম্পানীর অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজের সিপাহী সৈন্যের সহিত সন্ন্যাসীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। সন্ন্যাসীদলের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা তাহাদের রীতি অনুযায়ী গ্রামের জমিদারদের নিকট হইতে কেবল মাত্র কর আদায় করিয়া চলিয়া যাইত।

৩রা ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঘাটালের নিকটবর্ত্তী ক্ষীরপাই-এর নিকট প্রায় সাত হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণরের আদেশে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে পাঁচ কোম্পানী সৈন্য ও বর্দ্ধমান হইতে তিন কোম্পানী সৈন্য ঘটনাস্থলে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু সন্ন্যাসীরা এই সময় কোম্পানী সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ না করিয়া তীর্থ-পরিক্রমায় পুরীর পথে যাত্রা করিয়াছিল। পরে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া হইয়া তাহারা মেদিনীপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে।

কটকের কালেক্টর ২০শে অক্টোবর তারিখের এক পত্রে পুরী হইতে সন্ন্যাসীদের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া বলেন, যে "সন্ন্যাসীদল বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ইহারা সংখ্যায় প্রায় তিন সহস্র, তাহাদের সঙ্গে তিনটি কামান, গাদা বন্দুক, বর্শা ও তরবারি আছে।"

সন্ন্যাসীদল রাজসাহী অঞ্চলে পৌঁছিলে স্থানীয় কালেক্টর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রে জানান যে, সন্ন্যাসীরা কোথাও কোন অত্যাচার না করিয়া জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে মাত্র আবশ্যকীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সন্ন্যাসী দমন

সন্ন্যাসীদের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষের ফলে কোম্পানীর অস্তিত্ব বাংলা দেশে বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেশী সিপাহীদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি অনেকাংশে সন্ন্যাসীদের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ও তাঁহার কর্ম্ম পরিষদ্ সন্ন্যাসীদের হস্তে বিভিন্ন স্থানে কোম্পানী সৈন্যের পরাজয়ের ফলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং কঠোর হস্তে ইহা দমন করার জন্য এক সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনা করেন। সন্ন্যাসী দমনকল্পে বাংলার বিভিন্ন জেলার জমিদার তালুকদার হইতে গ্রামের চৌকিদার পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নিকট সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এক নির্দ্দেশনামা পাঠান হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা ব্যতীত সমস্ত সন্ন্যাসীদের নিরস্ত্র ও বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ১৭৭৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, "যে সকল বৈরাগী, সন্ন্যাসী, পথিক ও বিদেশীর দল এ দেশে উপস্থিত আছে তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার সাত দিনের মধ্যে বাংলা ও বিহার এলাকা হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু যে সকল রামানন্দী ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের বাংলায় মঠ-আখড়া প্রভৃতি আছে অথবা জমিদারের বৃত্তিভোগী হইয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে তাহারা এই আদেশের আমলে পড়িবে না।

"কিন্তু এই আদেশনামা বাহির হইবার পরেও যদি সন্ন্যাসীদের বিজ্ঞাপিত অঞ্চল সমূহে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া সারা জীবন রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে নিয়োগ করা হইবে। ইহা ছাড়া তাহাদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোম্পানী সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে।"

এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাস পরে কালেক্টরগণ জমিদার ও কৃষকগণের প্রতি এক নির্দ্দিষ্ট আদেশ জারি করিয়া বলেন যে, সন্ন্যাসীদের গতিবিধি জ্ঞাত হওয়া মাত্র কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। যদি জমিদারগণ এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোন সংবাদ পাঠাইতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোম্পানীর বিরাগভাজন হইবেন। কৃষকগণ এই আদেশ অমান্য করিলে কঠোর শাস্তি পাইবে। ইহা ব্যতীত সন্ন্যাসীদের দমনকল্পে ভুটানের রাজার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চুক্তি সাধিত হয়। এই চুক্তির বলে কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভুটান রাজ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ভুটানের রাজাও তাঁহার রাজ্যে সন্ন্যাসী প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন।

বিভিন্ন নির্দ্দেশনামা জারি করার পর কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহী সৈন্যকে নূতন ভাবে গঠিত করার জন্য মনোনিবেশ করেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সিপাহীদলের প্রধান সেনাপতি হিসাবে ইংরাজ সেনা নিযুক্ত হয় এবং পরগণা সিপাহীদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পরগণা-সিপাহীদের সম্পর্কে হেষ্টিংস্ "a rascally corps" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এবং ফকির ও সন্ন্যাসীদলের আত্ম-কলহের ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ এক তীব্র রূপ

ধারণ করে। বগুড়া ও ময়মনসিং-এর বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষের ফলে বহু ফকির ও সন্ন্যাসী হতাহত হয়।

কয়েক বৎসর পরে পুনরায় মজনু শাহের দলকে বাংলা দেশে দেখা যায়। ১৭৭৬ সালের মার্চ্চ মাসে কোম্পানী সৈন্যের সহিত কয়েকটি স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হয়। কিন্তু কোন স্থানেই মজনু শাহের দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। ১৭৭৬ খৃঃ হইতে ১৭৮৬ খৃঃ পর্য্যন্ত কোম্পানী সৈন্য ও সন্ন্যাসীদের সহিত ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মজনু শাহ্ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন।

অবশেষে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই আগষ্ট Lt. Ainslie এক দল সিপাহী লইয়া বগুড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। বগুড়া হইতে দশ ক্রোশ দূরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা হাতাহাতি সংগ্রামের ফলে মজনু শাহের দল সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়। পরাজিত হইয়া মজনু শাহ্ বগুড়া, রাজশাহী হইয়া মালদহ অভিমুখে তুলসীগঙ্গা অতিক্রম করার সময় অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া বিশেষ ভাবে আহত হন। মজনুর ইহাই শেষ অভিযান, কারণ পর-বৎসর মাখনপুরে তিনি মারা যান।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য মাদার বক্স ও মুসা শাহের নাম একমাত্র উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের নিকটে মুসা শাহের সহিত কোম্পানী-সেনার এক খণ্ডযুদ্ধের ফলে ইংরাজ সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মুসা শাহের দলে কোম্পানী-সেনার উর্দ্দি-পরিহিত অনেক সৈনিক ছিল।

মজনু শাহের দলভুক্ত অন্যতম শিষ্য ভবানী পাঠকের নাম ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন সরকারী কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলের তামাকের ব্যবসায়ী দল ঢাকার কাষ্টম্‌সের প্রধান অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ামসের নিকট অভিযোগ

**ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী**

করে যে, ভবানী পাঠক ও তাহার দল তাহাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। মিঃ উইলিয়ামস্ বণিক দলের সহিত কয়েক জন সিপাহী ও তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু পাঠক কোম্পানীর সিপাহী

ও পরোয়ানা উভয়কেই উপেক্ষা করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে তিনি বগুড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীকান্দিতে আর একটি নৌকা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন অধিকার করেন। ১৭৮৭ খৃঃ জুন মাসে লেঃ ব্রেনান্ জানিতে পারেন যে, পাঠক রংপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের দশ ক্রোশের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি চব্বিশ জন সিপাহী সমেত একজন হাবিলদারকে পাঠকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাহারা অতর্কিতে পাঠককে আক্রমণ করেন। সেই সময় তিনি ষাট জন বরকন্দাজ সমেত নৌকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর ভবানী পাঠক তাঁহার সহকারী প্রধান নায়ক একজন পাঠান সহ আরও দুই জন নিহত ও আট জন আহত হন। অবশিষ্ট বিয়াল্লিশ জন বরকন্দাজকে বন্দী করা হয়। ইহা ছাড়া সাতটি বড় নৌকা বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্রও কোম্পানী সেনা দখল করে।

ঠিক এই সময়েই লেঃ ব্রেনানের রিপোর্টে দেবী চৌধুরাণীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, ভবানী পাঠকের সহিত দেবী চৌধুরাণীর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণীর অধীনে অনেক বেতনভুক্ বরকন্দাজ ছিল। তিনি নিজে ডাকাতি করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা বাদে ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত অর্থেরও তিনি অংশীদারী ছিলেন। রংপুরের জেলা কালেক্টর ব্রেনানের নিকট দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী আদালতে হাজির করিবার জন্য নির্দেশ চাহিয়া পাঠান। ইহার উত্তরে ব্রেনান্ লিখিয়া পাঠান যে, "তোমার প্রেরিত বাংলা কাগজ-পত্র পড়িয়া যদি গ্রেপ্তারের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই নারীদস্যুকে গ্রেপ্তার করার আদেশ পরে পাঠাইব।" ইহার পর দেবী চৌধুরাণীর বিষয়ের উল্লেখ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৭৯৪ সালে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল এক লিখিত ঘোষণায় বলেন যে, ফকির ও সন্ন্যাসী দল কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যে-কোন জমিদার ও তালুকদার তাহাদের হত্যা করিতে পারে—সেই হত্যাপরাধের জন্য তাহাদের কোন বিচার হইবে না। ইহার পর সন্ন্যাসীদের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পায়।

## চুয়াড় বিদ্রোহ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই মেদিনীপুর অঞ্চলে জঙ্গল মহালের চুয়াড়গণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মীরকাশিম কর্ত্তৃক মেদিনীপুর ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করার পর স্থানীয় অধিবাসিগণ ইংরাজের অধিকার কিছুতেই মানিয়া লয় নাই।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জঙ্গল মহালের চুয়াড়গণ মেদিনীপুরের পশ্চিমে শিলদা পরগণার অন্তর্গত দুইটি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া ইংরাজ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মে মাসে তাহাঁরা রায়পুরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবর্দ্ধন দিকপতি নামক এক বাগ্‌দী সর্দ্দারের অধীনে চারিশত বিদ্রোহী চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় উপস্থিত হয়: পরে তাহারা কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। ক্রমশঃ সাফল্যলাভ করায় তাহাদের সাহস বাড়িয়া উঠে এবং ঐ বৎসরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতখানি বৃহৎ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড় চুয়াড়দিগের দুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে তাহারা অভিযানে বাহির হইত।

গোবর্দ্ধন দিকপতি

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠস্থিত কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ও জ্বালাইয়া দিয়া চুয়াড়গণ প্রচার করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে তাহারা মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিবে। ইংরাজ কালেক্টরের আশঙ্কা হইল যে, তাহারা তোষাখানা লুণ্ঠন করিতে পারে। কারণ তোষাখানায় তখন মাত্র সাতাশ জন প্রহরী ছিল, আর আক্রান্ত হইলে তাহারা পলায়ন না করিয়া যে যুদ্ধ করিবে তাহার সম্ভাবনা

খুবই কম ছিল। তদানীন্তন কালেক্টর Mr. Julius Mihoff ৭ই মার্চ্চ বোর্ডের নিকট এক পত্র লিখিলেন—"চুয়াড়দিগকে দমনের কোন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহারা প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে।"

১৬ই মার্চ্চ চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণের ফলে দুইজন কোম্পানী-সিপাহী ও কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী নিহত হয়। অবশিষ্ট সিপাহী সকল মেদিনীপুরে পলাইয়া আসে। কিন্তু মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল না। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর, কর্ণেল ডন্‌কে এক পত্রে জানান যে, ঐদিন রাত্রিকালে মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য তিনি তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ইহার পর ২১শে মার্চ্চ তারিখের পত্র হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাসী অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয়ও লইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুরতায় তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিলেন যে, চুয়াড়-দিগের সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ দুইদল দেশীয় সিপাহী ও পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্য সহরে আনিয়া রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিতে আর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই; তাহাদের অনেকেই রাত্রি-কালে পরিবারবর্গ ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের গৃহপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টর বোর্ডকে এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য পত্র লিখেন।

কোম্পানীর-কর্ত্তৃপক্ষ চুয়াড়দিগকে দমনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া কর্ণগড় ও আবাসগড় আক্রমণ করেন। চুয়াড়দিগের সহিত সহযোগীতার সন্দেহ

হেতু কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আনা হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচদল সিপাহী মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার প্রভৃতি ৩০৯ জন সৈনিক কর্ম্মচারী রক্ষিত হয়। কঠোর ব্যবস্থার ফলে চুয়াড়গণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া এক পরগণা হইতে অন্য পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল। জুন মাসের মধ্যে চুয়াড়গণের দ্বারা অধিকৃত সমস্ত গ্রাম কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দখলে আনেন। ইহার পর তাহারা দলবদ্ধ ভাবে আর কোন আক্রমণ করে নাই। চুয়াড় বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও সেটেলমেণ্ট অফিসার জে. সি. প্রাইস বলেন যে, জায়গীর বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সরদার ও পাইকগণ উন্মত্ত প্রায় হইয়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের এই অভিযানের ফলে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ ভীত হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল অঞ্চলের সকল দুর্দ্দান্ত জাতিই ঐ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটদের আক্রমণ করিত। মেদিনীপুরের স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্যগণ তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই—বাহির হইতে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানি করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল।

বিদ্রোহের মূল কারণ

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে তারিখে বোর্ডের নিকট লিখিত জেলা-কালেক্টরের পত্রে জানা যায় যে, "পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াড়দিগকে অসভ্য ওঅশিক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, চুয়াড়গণ ইংরাজ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, সহসা তাহাদের পুরুষানুক্রমে অধিকৃত জমি পুলিশের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইতেছে তখন তাহারা মনে করিল, যাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা করা বৃথা; সেই জন্য তাহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী

হইয়া দেশ মধ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, রাজস্ব আদায় এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।"

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমির ব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হ্রাস ও আদায়ের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাইকান জমির বন্দোবস্ত স্থগিত থাকিবে। পুলিশের দারোগাগণ চুয়াড়দিগের আক্রমণ নিবারণে অক্ষম হওয়ায় জঙ্গল মহালের জমিদারদিগের হস্তে ঐ সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল জমিদারের প্রজারা চুয়াড়দিগের লুণ্ঠনে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সম্পর্কেও কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।

জঙ্গল-খণ্ড কোম্পানীর সম্পূর্ণ দখলে আসিবার পর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর মানভূম, প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি করিয়া জঙ্গল-মহাল নামে একটি নূতন জেলা গঠন করা হয়। তৎকালে ঐ জেলার তেইশটি মহাল ছিল এবং একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উঠাইয়া দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

জঙ্গল-খণ্ডে চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারিত হইতে না হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বন্যজাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহ "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণ প্রায় চুয়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত। তাহারা কুক্কুট-মাংস আহার করিলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ও গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্তৃক উহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহারা সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্যক হইলে রাজ-সরকারে পাইক-সৈন্যের কাজ করিত। কোম্পানীর আমলে বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে

বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা

গড়ীর জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা হয় এবং নাএকদিগের ায়গীরও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ছত্রসিংহের পতনে বহুসংখ্যক নাএক আপন বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচলসিংহ নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংরাজ-শক্তির বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়।

নাএকগণ গড়বেতার নিকটবর্ত্তী নিবিড় বনভূমি-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। গড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্তস্থল পর্য্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। নাএকগণ ইংরাজ-অধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদ আক্রমণের লে কোম্পানীর শক্তির মূলকেন্দ্র বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

গভর্ণর জেনারেলের আদেশে ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ একদল বৃটিশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গণগনির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশিক্ষিত একগণের সহিত সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদের ভীষণ ব আক্রমণ করিত। এইরূপে ইংরাজ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে র এক দিন রাত্রে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া মাগত গোলাবর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিদ্ধস্ত করিয়া ফেলিল। নাএকগণ ই আক্রমণের ফলে প্রমাদ গণিল। অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা চিয়া থাকিল তাহারা গোলার সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া যে যেদিকে ারিল পলাইল। ইংরাজ সৈন্য সেই রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আবাস-স্থল সে করিয়া দেয়।

গণগনি অরণ্যের যুদ্ধ

পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে ও নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বহু- খ্যক নাএক নর-নারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল, কিন্তু অচল সিংহের কান সন্ধান পাওয়া গেল না। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিবার দেশে কয়েক জন সৈন্য বগড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরে দিলেন।

অচল সিংহ গণগনির বন হইতে পলাইয়া গিয়া জঙ্গলময় বগড়ীর পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়া যায় সেই বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাএক ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে চারি দিকে পলায়ন করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারিয়াছিল, তাহারা আবার একে একে আসিয়া অচল সিংহের নূতন শিবিরে সমাগত হইল। ইহা ছাড়া রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অচল সিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা ইংরাজ অধিকৃত পল্লীসমূহে আক্রমণ করিয়া ইংরাজদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যে সকল ইংরাজ সৈন্য অচল সিংহকে বন্দী করিবার জন্য বগড়ীর জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইল। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্র সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অচল সিংহকে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে ধরাইয়া দিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নাএক বীর অচল সিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

অচল সিংহ

অচল সিংহের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ অন্যান্য সৈনিক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া আরও কিছু দিন ইংরাজগণের সহিত খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য নাএকগণকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে। তাহাদের আবাস-স্থল ধ্বংস করিয়া ১৭ জন দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়। ঐ বৎসরে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে বিদ্রোহের অভিযোগে হত্যা করা হয়।

বগড়ীর রাজা যাদবচন্দ্রের রাজত্বকালে মেদিনীপুরে মোগলশাসন বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী বগড়ী রাজ্যের বার্ষিক কর নির্দ্ধারণের জন্য রাজপ্রাসাদে সমাগত হন। জনশ্রুতি, তাঁহারা কোন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে নিহত হওয়ায় কোম্পানী রাজা যাদবচন্দ্রকে বিদ্রোহী স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। যাদবচন্দ্র সে অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় তাঁহার পুত্র ছত্র সিংহ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিরূপিত সময়ে উহা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজ বণিক দল সমস্ত বগড়ী রাজ্য গ্রাস করিয়া লয়। মাত্র বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার আয়ের "তরফ বেহালা" নামক জমিদারীর স্বত্ব রাজাকে প্রদান করেন। রাজা গড়বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ শ্যামসেরের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলাপোতা গ্রামের বাগান-বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় অচল সিংহের নেতৃত্বে নাএক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে হতভাগ্য রাজা ছত্র সিংহ সেই সুযোগে ইংরাজ কোম্পানীর কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় এবং রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচল সিংহকে ইংরাজ সেনাপতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু ছত্র সিংহ যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। ইংরাজ বণিক দল তাঁহাকেও সেই হাঙ্গামার অন্যতম নেতা স্থির করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করিলেন। পরে তিনি মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। ছত্র সিংহের কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন এবং আজীবন বার্ষিক তিন সহস্র টাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

নাএকরা স্বভাবতঃই উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ড যে অনিবার্য্য, ইহা জানিত বলিয়াই তাহারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়া কোম্পানীর সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। এই কারণে নাএক-বিদ্রোহ মেদিনীপুর জেলায় কিরূপ ভীষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত মিঃ হ্যামিল্টনের বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বাংলার অন্যান্য প্রদেশে ব্রিটিশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেও ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দুরবর্ত্তী স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। সে দেশে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারিগণ সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না।"

## ওয়াহবী বিদ্রোহ

চুয়াড় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা ও ফরিদপুর অঞ্চলে ওয়াহবী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বৃটিশ রাজশক্তির ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবদুল ওয়াহব নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন তাহাই পরে 'ওয়াহবী বিদ্রোহ' নামে খ্যাতি লাভ করে। ওয়াহব তাঁহার ধর্ম্মীয় লোকদের অনাচারে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি বিভিন্ন সহরে পরিভ্রমণ করার পর অবশেষে মহম্মদ ইবন সৌদকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন এবং পরে তাঁহাকে নিজের জামাতারূপে গ্রহণ করেন।

আবদুল ওয়াহব

ইহার পর তিনি বেদুইনদের একত্রিত করিয়া এক সংস্কারবাদী সেনাদলের সৃষ্টি করেন এবং নেজ্‌দ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া নিজে ধর্ম্মগুরুর স্থান অধিকার করেন। ধর্ম্মীয় অনাচার নিবারণকল্পে তিনি সাতটি নির্দ্দেশ দান করেন। এই মতবাদই পরে ওয়াহবী মতবাদ বলিয়া প্রচারিত হয়। এই ওয়াহবী সম্প্রদায়ই সুন্নী সম্প্রদায়ের অগ্রগামী দল—যাহারা গোঁড়া ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত।

ওয়াহবের আদর্শ ও মতবাদ আরবদের মনে গভীর রেখাপাত করে। বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও অনেকে এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ওয়াহবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ একজন তীর্থযাত্রী ছিলেন যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমেদ। তাঁহার নেতৃত্বেই ভারতে ওয়াহবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মুসলিম কৃষক, মৌলবী ও আদালতের কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিম্ন ও নিম্নমধ্য শ্রেণীর বিক্ষোভই ভাষা পায় ওয়াহবী আন্দোলনে। কোরাণ-সম্মত সমাজবাদের প্রেরণায় তাহারা অত্যাচারী বৃটিশরাজ, হিন্দু ও শিখের বিরুদ্ধে জেহাদ

ঘোষণা করে। ইংরাজ, হিন্দু বা শিখ সকলেই তাহাদের নিকট বিধর্মী, সকলেই তাহাদের নিকট ম্লেচ্ছ ওয়াহবী নেতাগণ ধনী, ব্যবসায়ী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। এই কারণেই বৃটিশের আশ্রিত হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ ও ধনীরা এই আন্দোলনে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। হাণ্টারসাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ওয়াহবী শক্তি কোন ধনী বা প্রভাবশালী শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। তাহাদের আবেদন ছিল জনগণের কাছে এবং তাহাদের ধর্ম্ম বা রাজনীতির মূল সূত্র ছিল বিক্ষুব্ধ জনগণের আশা ও আতঙ্ক।"

ওয়াহবী আন্দোলনের গুরুত্ব এই দিক দিয়া যে, তাহাদের সংগ্রাম ভারতের সাধারণ মানুষেরই সংগ্রাম। ইহার পিছনে আমীর ওমরাহদের রাজনৈতিক কারসাজী ছিল না। অত্যাচারী ইংরাজ সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাপকতার দিক দিয়াও এই আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময় সমগ্র উত্তর-ভারতে—সুদূর সীমান্তের পার্ব্বত্য কেন্দ্র হইতে মধ্য বাংলার জেলাগুলি পর্য্যন্ত এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থলে তাহাদের শাখা ও কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ওয়াহবিগণ একাধিক বার বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহাদের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাহাদের গুপ্ত অথচ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শাসকদের সর্ব্বদা সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের মূল উৎপাটনের সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ওয়াহবী আন্দোলনের মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়াই আন্দোলন পরিচালনায় প্রভূত দুর্ব্বলতা থাকা সত্বেও ওয়াহবী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই আন্দোলনে দুইটি প্রধান দোষ ছিল—ধর্ম্মের ভিত্তিতেই এই আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ওয়াহবীরা এই ভারতবর্ষকে "দার-উল্-হার্ব" বলিয়া অভিহিত করিত। দার-উল্-হার্ব অর্থ শত্রুদের—অর্থাৎ মুসলিম কর্ত্তৃত্বের অভাবে এই দেশ শত্রুভূমিতে

পরিণত হইয়াছে। হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাহাদের শত্রু—সকলেই কাফের। এই দুর্ব্বলতার ফলাফল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক শোচনীয় সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

সৈয়দ আহমেদ

ভারতে ওয়াহবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ ১৭৮৬ সালে মহরম মাসে রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি আমীর খান পিণ্ডারী—পরবর্ত্তীকালে টঙ্কের নবাবের অধীন অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে শিখ-রাজ্য তথা হিন্দু-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহমেদের জীবনে এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত শাহ্ আবদুল আজিজের নিকট তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসর পর তিনি নিজে ধর্ম্মপ্রচারকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে সকল আচার অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইস্‌লামের সংস্কার সাধন ব্যাপারে তিনি যেমন গোঁড়া মৌলভীদের সমর্থন লাভ করিলেন তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত ফৈজুল্লা খানের জায়গীরদারীতে সৈয়দ তাঁহার কর্ম্মস্থল বাছিয়া লন। ফৈজুল্লা খানের বংশধরগণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় সৈয়দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রোহিলাদের নির্ম্মূল করার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের দানবীয় অত্যাচারের ইতিহাস ভারতে ইংরাজ শাসনের মসীলিপ্ত কাহিনীকে আরও কলঙ্কিত করিয়াছে।

১৮২০-২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমেদ সমগ্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন। এই সময় বহু লোক তাঁহার শিষ্য হয় এবং সৈয়দ আহমেদ তাহাদের মধ্য হইতে বিশ্বাসী লোক দেখিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহাদের ধর্ম্ম-কর সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। পরে মুসলমান সম্রাটগণ যে ভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিতেন ঠিক্ সেই অনুকরণে মৌলভী ওয়ালেয়ত আলি, মৌলভী এনায়েত আলি, মৌলভী মরহুম আলি এবং মৌলভী ফুরাত হোসেন প্রভৃতি

চার জন শিষ্যকে প্রধান ধর্ম্মগুরু হিসাবে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি পাটনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার মতবাদ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার জনপ্রিয়তা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহার পক্ষে শিষ্যত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার উষ্ণীষের কাপড় বিছাইয়া দিয়া বলেন, যাহারা তাঁহার উষ্ণীষখণ্ডের যে কোন স্থানে স্পর্শ করিবে তাহারাই তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার পর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া ওয়াহবীদের সংস্পর্শে আসেন। এই স্থানেই তিনি ওয়াহবীদের দলভুক্ত হয়েন এবং পর-বৎসর অক্টোবর মাসে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। উত্তর-ভারতে পাঠানদের লইয়া তিনি একটি দুর্দ্ধর্ষ দল গঠন করেন। উক্ত দলের সহায়তায় শিখ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইলেন। ওয়াহবীদের সংগঠন দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ইহারা টঙ্কের নবাবের নিকট হইতে অর্থ ও লোকবলের যথেষ্ট সাহায্য পায়। ওয়াহবিগণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার দখল করিয়া লয়। পেশোয়ারের পতনের পর সৈয়দ আহমেদ নিজেকে খালিফ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে টাকা প্রচলন করেন।

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বিবাহ-সম্পর্কিত এক নির্দ্দেশের ফলে তাঁহার দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায় এবং সংঘর্ষে তাঁহার দলের অনেকে নিহত হয়। অবশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বালাকোটে সৈয়দ আহমেদ শিখ সৈন্যের গুলীতে নিহত হন এবং ওয়াহবীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইহার পর ওয়াহবী আন্দোলনের অন্যান্য নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সৈয়দ আহমেদের মৃত্যু হয় নাই, আল্লার নির্দ্দেশে ও ইস্লামের স্বার্থে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন এবং গোপনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায়

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই অর্থাৎ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করিবেন। সাধারণ মুসলমানেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। নিভৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলে সিতানায় ওয়াহবীদের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল।

তিতু মিঞা

ওয়াহবী আদর্শ বাংলা দেশে যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করে তাহা এক বিচিত্র কাহিনী। ওয়াহবীদের সংগ্রামের ইতিহাসে "তিতু মিঞা" বা তিতু মীরের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মনিষ্ঠার বলে তিনি এক বিরাট্ ওয়াহবী বাহিনী সংগঠিত করিতে সমর্থ হন। তিতু মিঞা বারাসতের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার আসল নাম নিসার আলি। পেশাদার মল্লবীর হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিতু মিঞা ছিলেন চাষী-গৃহস্থের পুত্র। ছোট-খাট এক জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। এই সময় কিছু দিন তিনি মুষ্টি-যোদ্ধা হিসাবেও কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহাকে জেলে যাইতে হয়।

জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মক্কার-পথের যাত্রী হন। মক্কাতে সৈয়দ আহমেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিতু মিঞা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই হইতে তিনি ওয়াহবী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন; ইহারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার ওয়াহবীদের দখলে আসায় প্রকাশ্যভাবে তিতু মিঞা মুসলমান ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে ইংরাজের বিরুদ্ধে না গিয়া হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরগুলির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ইছামতী নদীর তীরের অধিবাসী কৃষ্ণ রায় নামক এক জমিদার ওয়াহবী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক ও প্রজাদের উপর ৩৲ টাকা হিসাবে এক কর ধার্য্য করেন। ইহার

ফলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। শীঘ্রই তিতু মিঞার অনুগামিগণ দলে ভারী হইয়া উঠিল। বহু হিন্দু-গ্রাম লুণ্ঠিত হইল।

ইংরাজ সরকারের সহিতও তিতু মিঞার শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিল। নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈয়ারী করিয়া তিতু মিঞা তাঁহার দল-বল সহ সেই স্থানে সমবেত হইলেন। কলিকাতার পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের গ্রামসমূহ, ২৪পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর অঞ্চল, তিন-চার হাজার বিদ্রোহীদের করতলগত ছিল। ওয়াহবী আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণ তিতু মিঞাকে খাদ্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৬ই নভেম্বর প্রায় ৫০০ ওয়াহবী সৈনিক একটি ছোট সহর আক্রমণ করিয়া ইংরাজ-শাসনের অবসান ঘোষণা করে। জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে এক দল শক্তিশালী কোম্পানী-সৈন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানী-দল ওয়াহবী সৈন্যদের প্রথমে ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে। কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হয়। বিদ্রোহী দল কোম্পানী সৈন্যের উপর প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। ১৭ই নভেম্বর ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে আরও এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। ইউরোপীয় সৈন্যগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে কোম্পানী-সৈন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। পরাজিত ব্রিটিশ সৈন্যদল নদীপথে পলায়নকালে অধিকাংশই ওয়াহবী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়।

ইংরাজ সৈন্যের পলায়ন

তিতু মিঞার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দমনের জন্য ইহার পর কোম্পানী-কর্ত্তৃপক্ষ অশ্বারোহী, পদাতিক ও দেহরক্ষী সৈন্যের এক বিরাট্ বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতু মিঞা আমৃত্যু সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু বিপুল সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষে বেশীদিন যুদ্ধকরা সম্ভব হইল না। শিষ্যেরা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিতু মিঞা শত্রুর গুলীতে নিহত হন। ইহার পর ব্রিটিশ সৈন্য তিতুর বাঁশের কেল্লা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যুদ্ধে ৩৫০

জন ওয়াহবী সৈন্য বন্দী হয়। তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড এবং তিতুর সহকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

তিতু মিঞার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে ওয়াহবী সমাজ প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরাজ শক্তির সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাহারা অর্থ ও লোকবল দিয়া সাহায্য করিত। বাংলা দেশে নীল-কুঠীয়াল ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান বিশেষ ভাবে চলে।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওয়াহবী মতবাদ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় তাহার সকল প্রকার চেষ্টা করেন। সমগ্র উত্তর-ভারতে, সুদূর সীমান্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে মধ্য-বাংলার জেলাগুলি পর্য্যন্ত এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়।

ওয়াহবীদের মধ্যে একটি যুদ্ধ-সঙ্গীতও প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গীত যুদ্ধ-কালে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা জোগাইত। নিম্নে সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইল :

"First I glorify God, who is beyond all praise ;
I land his prophet and write a song on Holy War :
Holy war is a war carried on for religion, without any lust of power.
In the sacred scriptures its glories are related ; I mention a few,
War against the Infidel is incumbent on all
Musalmans ; make provision for it before all things.
He who from his heart gives one farthing to the cause,
Shall here after receive seven hundred fold ;
And he who both gives and joins in the fight,
Shall receive seven thousand fold from God.
He who shall equip a warrior in this cause of

God shall obtain a martyr's reward ;
His children dread not the trouble of the grave ;
Not the last trump ; nor the day of judgement.
Cease to be cowards ; join the divine leader, and smite the infidel.
I give thank to God that a great leader has been born in the 13th century of the Hijra.
Oh friend, since you must some time die, is not
Better to offer up your life in the service of the Lord ?
Thousands go to war and come back unhurt ;
Thousands remain at home and die.
You are filled with worldly care, and have
Forgotten your maker in thinking of your wives and children ?
How long to escape death ?
If you give up this world for the sake of God,
You enjoy the pleasures of heaven for ever.
Fill the uttermost ends of India with Islam,
So that no sounds may be heard but "Allah ! Allah !"

ওয়াহবীরা সামরিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ১৮৫৮, ১৮৬৩ এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক বারই তাহারা পরাজিত হয়। ক্রমে সরকার তাহাদের গুপ্ত প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া তাহাদের গুপ্তকেন্দ্রগুলির উপর কড়া নজর রাখে। কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারে যে, সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি ওয়াহবীদের প্রতি ; তখন তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়িয়া প্রলোভনের পথে তাহাদের আয়ত্তে আনিতে সচেষ্ট হয়।

# সাঁওতাল বিদ্রোহ

সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর আমলাতন্ত্রের অত্যাচার ও কু-শাসনের ফলে বাংলার নিরীহ সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

ওয়াহবীদের পরাজয় হইলেও তাহারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। ইহারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। সিপাহী যুদ্ধের সময় পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত ওয়াহবী সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট দল ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই বৎসর পরেই বিপ্লবের পুণ্যভূমি বাংলা দেশেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের শঙ্খ বাজিয়া ওঠে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই সাঁওতালগণের মধ্যে অস্বস্তি ও অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। ঐ বৎসর ভাল ফসল হইলেও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বীরভূমের ব্রিটিশ ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় অবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনকরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের কাজে স্থানীয় সাঁওতালগণ নিযুক্ত হইয়া বেশ সুখেই আছে বলিয়া তিনি পত্র লেখেন। কিন্তু বিদ্রোহের অগ্নিশিখা এই ভাবে চাপিয়া রাখা সম্ভব হইল না।

**ব্রিটিশ কু-শাসনের প্রতিক্রিয়া**

বাগনাডিহীর সিধু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল দল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কু-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদন-নিবেদন করে। কিন্তু ইহাদের কোন আবেদন শোনার মত সময় উদ্ধত ব্রিটিশ বণিকদের ছিল না। খাজনা আদায় করা ছাড়া আর তাহাদের অন্য কাজ ছিল না। পরে সাঁওতালগণ ইংরাজ জেলা-কমিশনারের নিকট তাহাদের অভিযোগ দূর করার জন্য বলে, অন্যথায় নিজেরাই তাহারা অন্যায়ের প্রতিকার করিবে। কিন্তু কমিশনার সাহেব অভিযোগের কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন যে, নিরক্ষর সাঁওতালদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবেই খাজনা আদায় হইতেছে।

সাঁওতালদের প্রথমে কোন প্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিকল্পনা ছিল না। কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল সেই আবেদন কলিকাতায় গিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।

অবশেষে সাঁওতালদের জাতীয় প্রতীক শাল গাছের ডাল হাতে লইয়া চর সমূহ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ভাবী বিদ্রোহের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রায় ত্রিশ সহস্র সাঁওতাল তীর-ধনুক ও বর্শায় সুসজ্জিত হইয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে সাঁওতালদের নেতাগণ ভাগলপুর ও বীরভূমের কমিশনারগণকে চরম পত্র প্রেরণ করে। ইহা ছাড়া কলিকাতা যাইবার পথে যে সকল থানা পড়ে সেই থানা সমূহের ইন্‌স্পেক্টরদেরও ভাবী কর্ম্মপন্থার বিষয় জ্ঞাপন করে।

সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থায় নিরাশ হইয়া সাঁওতালগণের কলিকাতা অভিমুখে অভিযান আরম্ভ হয়। সাঁওতাল-গণ তাহাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের লইয়া বিরাট্ এক শোভাযাত্রা সহকারে চলিয়াছে। তাহাদের দলের সম্মুখে মাদল ও ঢাকীর দল সাঁওতালদের অগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সমগ্র রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৭ই জুলাই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। সাঁওতালদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রথম দিবস। যতদিন গ্রাম হইতে আনীত খাদ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল তত দিন সাঁওতালগণ কোন প্রকার লুণ্ঠনের প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিন্তু তাহাদের রসদ নিঃশেষিত হওয়ার পর তাহারা গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্য অথবা লুণ্ঠন দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন মিটাইত।

বিদ্রোহী নেতার আদেশে সাঁওতাল সৈনিকদের খরচের জন্য প্রত্যেকটি পরিবারের উপর প্রায় সাড়ে ৭ টাকার মতন খাজনা ধার্য্য করে। এই সময় কোম্পানীর এক জন বেতনভোগী ইন্‌স্পেক্টর সাঁওতালদের অগ্রগতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহী সাঁওতাল ভ্রাতৃদ্বয়কে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া ফেলার নির্দ্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁওতাল দল ক্ষিপ্ত হইয়া

ওঠে এবং ইন্‌স্পেক্টরকে তাহার দলবল সহ বাঁধিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার হওয়ার পর সিধু নিজে ইন্‌স্পেক্টরকে হত্যা করে। ইহা ছাড়া আরও নয় জন পুলিশ নিহত হয়। এই ইন্‌স্পেক্টার ও পুলিশ হত্যার ফলে সাঁওতালদের সুপ্ত বন্যভাব জাগ্রত হইয়া ওঠে।

এই ঘটনার পর এক পক্ষ কাল যাবৎ বিদ্রোহী সাঁওতাল দল গ্রামের পর গ্রাম নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেয়। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজ সৈন্য প্রতিরোধ করিতে গিয়া কয়েক স্থানে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। বারো শত কোম্পানী সৈন্যের একটি দল বিদ্রোহীদের আশী মাইলের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

২৫শে জুলাই জেনারেল লয়েডের অধীনে এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের দমনের জন্য প্রেরিত হইল। ইহা ছাড়া স্থানীয় জমিদারগণ ও ইংরাজ ব্যবসায়ী-গণও ও বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। মুর্শিদাবাদের নবাব এক দল সুশিক্ষিত হস্তী ও সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্ব্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী এক জন ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত হইল।

সাঁওতালদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বলা অপেক্ষা ইংরাজ কর্ত্তৃক নিরীহ সাঁওতালদের নিছক হত্যা বলাই সঙ্গত। যখনই কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ধুম নির্গত হইতে দেখা যাইত, তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে জঙ্গল ঘিরিয়া বিদ্রোহী সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেন, অন্যথায় নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইত। একবার ৪৫ জন সাঁওতাল একটি কুটীরে আশ্রয় নেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের সকলকে আত্ম-সমর্পণের নির্দ্দেশ দেয়। ইহার উত্তরে এক ঝাঁক তীর কোম্পানী সেনাদের উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় সিপাহিগণ ঐ মাটির কুটীরের দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া এক ঝাঁক গুলী চালাইল। ইহারা পুনর্ব্বার সাঁওতালদের আত্মসমর্পণের কথা বলায় কুটীরের দরজা সামান্য খুলিয়া পুনরায় তাহারা এক

সাঁওতালদের হত্যা

ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করিল। এই সময় সাঁওতালদের সহিত যুদ্ধের ফলে কয়েক জন কোম্পানী-সিপাহী বিশেষ ভাবে আহত হয়। সমগ্র গ্রাম সেই সময় জ্বলিতেছিল, কতক্ষণ তীর ও গুলী বিনিময়ের পর সাঁওতালদের কুটীর নিস্তব্ধ হয়। ইহার পর কোম্পানীর সৈন্যরা কুটীরে প্রবেশ করিয়া শোণিতাপ্লুত এক বৃদ্ধকে মৃতের স্তূপের উপর কুঠার হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। জনৈক সৈনিক উক্ত বৃদ্ধের নিকট গিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করার জন্য বলিলে সেই বৃদ্ধ শাণিত কুঠারের আঘাতে তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

মেজর জারভিস বিদ্রোহীদের অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "ইহা একেবারেই যুদ্ধ নয়। সাঁওতালরা আত্মসমর্পণ করা কাকে বলে তাহা জানে না। যতক্ষণ যুদ্ধের দামামা বাজিতে থাকিবে ততক্ষণ গুলী করিয়া হত্যা না করা পর্য্যন্ত তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিবে। সাঁওতালদের তীর-বিদ্ধ হইয়া আমাদের সৈনিক নিহত হইত বলিয়াই আমরা গুলী চালাইতে বাধ্য হইতাম। রণ দামামা স্তব্ধ হইলে তাহারা কিছু দূর পিছু হটিয়া যাইত। কোম্পানীর সৈনিকগণ এই ভাবে সাঁওতালদের হত্যা করিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করিত।"

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সাঁওতালদের কর্ম্মতৎপরতা স্তিমিত হইয়া আসিল। কোম্পানীর পক্ষ হইতে বিদ্রোহের নেতা ব্যতীত আর প্রত্যেককে মার্জ্জনা করিয়া ঘোষণা করা হয়। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইলেন যে, গত সাত সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত শান্ত আছে। সাঁওতালদের কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা স্বল্পকালের জন্য বর্ত্তমান ছিল।

সাঁওতালদের শক্তি বৃদ্ধি

ইহার এক মাস পরে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, "বিদ্রোহিগণ আশীটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। ডাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং সমস্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত। বিদ্রোহীদল দুই ভাগে বিভক্ত। একদল অপরবাঁধের নিকটবর্ত্তী রক্ষাদঙ্গলের আর এক দল সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী তেলাবুনীর নিকট অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় বারো হইতে চোদ্দ হাজার।"

মুচিয়া কোমনাজেলা, রামা ও সুন্দরা মাঝির নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর কয়েকটি থানা ও গ্রাম দখল করে। থানার দারোগা ও বরকন্দাজেরা বেগতিক দেখিয়া এক কাপড়ে পলায়ন করে। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বাহ্নেই থানা আক্রমণের সংবাদ অবগত হইয়া প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ দেওঘরে স্থানান্তরিত করেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সৈন্য-সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গভীর জঙ্গল ও দূরত্বের জন্য কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করেন।

মিঃ ওয়ার্ডকে এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, এক দল সৈন্যকে রাণীগঞ্জ হইতে জামতাড়া পাঠান হইতেছে, তাহারা বর্ষার শেষে অন্য সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত থানা সাহনা, অপরবাঁধ এবং আফজলপুরে অপেক্ষা করিবে। বর্দ্ধমানের কমিশনারের নিকট সিউড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে আরও জানা যায় যে, "বিদ্রোহী সাঁওতালগণ অন্যান্য দলের সহিত যোগদান করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জমায়েৎ হইতেছে। সৈন্যদল আসিয়া পৌছান মাত্র আমি থানায় পুলিশ ফেরৎ পাঠাইব এবং যাহাতে ডাক চলাচল করে তাহার ব্যবস্থা করিব। বর্ত্তমানে হলদিগড় পাহাড়ে রামা মাঝি তাহার দুই শত লোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ঐ অঞ্চলের পথচারীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে। বর্ত্তমানে দেওঘরে অসামরিক কোন অফিসার না থাকা বিশেষ দুঃখের কারণ। ইহা পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি।"

উক্ত পত্রে তিনি আরও বলেন যে, "সিরু মাঝির নেতৃত্বে পাঁচ হইতে সাত হাজার সাঁওতাল তেলাবুনীর অন্তর্গত সুলিয়াটাকু অধিকার করিয়া পুকুর কাটিয়া মাটির বাঁধ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের আরও শক্তিশালী করিয়াছে। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে দুর্গা পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছে; এবং এই জন্য নানগুলিয়া থানা লুণ্ঠন করিয়া আসার পথে গ্রাম হইতে দুইজন ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়াছে, গতকল্য আমাদের যে গুপ্তচর আসিয়াছে তাহার মুখে অবগত হইলাম যে, রক্ষাদঙ্গলের দল আসিয়া পড়িলে তাহারা সিউড়ী অভিমুখে অভিযান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

যুদ্ধের সময়েও সাঁওতালদের শালীনতার অভাব ছিল না। জয়ের অব্যবহিত পরেও তাহারা শত্রুকে সাবধান না করিয়া আক্রমণ করিত না। ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বীরভূমের স্থানীয় লোকদের মধ্যে সাঁওতালদের আক্রমণের সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইতে দেখা যায়। বিদ্রোহীদল এক জন ডাক-হরকরাকে পথিমধ্যে আটক করিয়া ডাক লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং তাহাকে সাঁওতালদের জাতীয় প্রতীক শাল গাছের তিনটি পাতাযুক্ত একটি ডাল বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য করে। তিনটি পাতার অর্থ এই যে, তাহাদের ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে আর মাত্র তিন দিন বিলম্ব আছে।

অবশেষে পশ্চিম জেলা-সমূহ চার মাস সাঁওতালদের দখলে থাকার পর ১৩ই নভেম্বর উক্ত অঞ্চলে সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়। ব্রিগেডিয়ার এল. এস. বার্ড বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে অধিনায়কের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শীতকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সাঁওতালদের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালগণ দলে দলে আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর সাঁওতাল নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের প্রহসন চলে! বীরভূম জেলে একজন সাঁওতাল নেতা বলে যে, "তোমরা আমাদের যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছ। আমরা যাহা ন্যায় তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু যখন আমরা প্রতিকারের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলাম তখন জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের ন্যায় আমাদের নির্ব্বিচারে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ।"

সাঁওতাল দমন

সাঁওতাল দমন করার পর পুরাতন অত্যাচারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিদায় দেওয়া হয় এবং সাঁওতাল-প্রধান স্থানসমূহে ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। এই বিদ্রোহের পর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের চৈতন্যোদয় হইল যে, এতদিন তাহারা কেবল মাত্র খাজনা আদায় করিয়াছে কিন্তু প্রতিদানে নিরীহ সাঁওতালদের কিছুই দেয় নাই। এই ছয় মাস বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের যে ব্যয় হয় তাহা দশ বৎসর শাসন করার ব্যয় অপেক্ষাও অধিক।

সাঁওতাল বিদ্রোহের এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদকামী বিদ্রোহী সিপাহীদের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয় "হিন্দুস্থান ছোড় দো।" এই সিপাহী অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাহাকে কেবল মাত্র "সিপাহী বিদ্রোহ" বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে এই বিদ্রোহকেই ভারতের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম বলা চলে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করার পর হইতেই পরবর্ত্তী এক শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের আমলে শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গের দুর্নির্ব্বার সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার যে ভয়াবহ নগ্নরূপ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই উৎকট অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল।

এই মুক্তি-সংগ্রামে সেদিন ভারতবাসী পরাজিত হইয়াছিল। কাজেই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করার মতন কোন নেতাই জীবিত ছিলেন না। সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সিপাহী অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকৃতভাবে দেখাইয়া আসল রূপটি চাপা দিয়াছেন। চর্ব্বি-মাখান টোটার জন্য ভারতব্যাপী এত বড় একটা বিপ্লব হইয়া গেল, ইহা সম্পূণ অবাস্তব ও অযৌক্তিক। কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকগণ সিপাহীদের ভাতা বন্ধ, বেতনের স্বল্পতা, ছুটির অভাব, সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রার নির্দ্দেশ, সেনাবাহিনীতে উচ্চ জাতির লোকনিয়োগ এবং সেনা সংগঠনের অন্যান্য দোষ-ত্রুটির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। চর্ব্বি-মাখান টোটা ব্যবহার ও এই সকল আনুসঙ্গিক কারণের ফলে সিপাহীদের মধ্যে সাময়িক কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত কারণের ফলে এত বড় ব্যাপক ও বিরাট্ ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট

সন্দেহের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, শতবর্ষব্যাপী ইংরাজ বণিকের নিপীড়ন ও অনাচারের ফলে ভারতবাসীর মনে যে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এই অভ্যুত্থান তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি এবং ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষই সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ। ইহার পশ্চাতে ছিল এক শত বৎসরের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ

এক শত বৎসর বিদেশীদের পদানত থাকিবার পর হিন্দু-মুসলমান মর্ম্মে-মর্ম্মে পর-শাসনের জ্বালা অনুভব করিয়াছিল, সেই জন্য পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সেদিন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ দেশবাসীর অন্তরে ভেদ-বুদ্ধি জাগাইয়া তোলার জন্য তখন সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন বিচক্ষণ জননায়ক থাকায় সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বুঝিয়াছিল যে, ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ রাজ্য-অপহারক, ইংরাজ শাসনের নামে সমগ্র দেশকে ও জাতিকে শোষণ করিতেছে, ইংরাজ দেশের শত্রু।

লর্ড ডালহৌসী সমগ্র ভারতবর্ষে একছত্র ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনে ব্রতী হইয়া যে সকল রাজন্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, যে সকল জমিদারকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অবমাননা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অযোধ্যার নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁহার দত্তকের রাজ্য অপহরণ, সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ ও ঝাঁসী রাজ্যে ব্রিটিশ-বিরোধিতার অনল-শিখা প্রজ্বলিত করিল। সিপাহীদের খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ অফিসারদের অসাধু প্রচেষ্টা সিপাহীদিগকে দিন দিন ব্রিটিশের প্রতি বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহারে সিপাহীদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এক দিন ভারতব্যাপী প্রচণ্ড দাবদাহে পরিণত হইল। দেশবাসীর অনুকূলতা সে অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি

দিল। সমগ্র ভারতব্যাপী দেখা দিল রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য দেখা দিল প্রথম গণ-সংগ্রাম।

পলাশী যুদ্ধের শত-বার্ষিকী

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩এ জুন পলাশী যুদ্ধের শত-বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সিপাহীরা একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে স্থির করিয়াছিল। সংগ্রাম ঘোষণার সংবাদ বিদ্রোহীদের পরস্পরের মধ্যে প্রচারের জন্য এক ক্যাম্প হইতে আর এক ক্যাম্পে রক্তপদ্ম চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় ইউরোপেও রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই কারণে ভারতে বেশী ইংরাজ সৈন্য রাখা সম্ভবপর ছিল না। তখন ভারতে ইংরাজ সৈন্য ছিল চল্লিশ হাজার। আর ভারতীয় সেনা ছিল দুই লক্ষ পনের হাজার। কাজেই ভারতীয়রা ভাবিয়াছিল যে, একসঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিলে তাহাদের জয় সুনিশ্চিত।

পলাশীর পরাজয়ের এক শত বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ ছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন। অভ্যুত্থানের সময়টাও ছিল বেশ অনুকূল। ভারতে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আসে, জুন মাসের গ্রীষ্মের উত্তাপ তাহাদের বিশেষ কাবু করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া এই সময় রবি শস্য উঠিবে বলিয়া সরকারী কোষাগারও বেশ পূর্ণ থাকিবে। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীর বাদশাহের কাছে গেল, তখন বাদশাহ বলিয়াছিলেন, "দিল্লীর বাদশাহের আর সেদিন নাই, বাদশাহী তোষাখানা আজ শূন্য, তোমাদের ভরণপোষণ যোগাইব কোথা হইতে?" বিদ্রোহীরা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিয়াছিল, "আমাদের শোষণ করিয়া ব্রিটিশ বণিক যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থ আপনাকে আনিয়া দিব।"

বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও কর্ম্মসূচী

অভ্যুত্থান-পরিকল্পনায় বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না। সিপাহীরা এক দিনে বিদ্রোহ করিয়া সমস্ত ইউরোপীয় সেনানীদের হত্যা করিবে, কারাগৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিবে, সরকারী কোষাগার দখল করিবে, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া

ও রেল-লাইন উঠাইয়া যোগাযোগ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবে, তোষাখানা ও দুর্গ অধিকার করিবে। ইহার পর গণ-অভ্যুত্থানের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হইবে।

গেরিলা প্রণালীতে যুদ্ধ চালান হইবে বলিয়া স্থির হয়। এ সম্পর্কে বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁর নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি উল্লেখযোগ্য :—

"বিধর্ম্মীদের নিয়মিত সৈন্যের মুখোমুখী হইতে চেষ্টা করিও না। তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খল ও তাহাদের বন্দোবস্ত পাকা। তাহা ছাড়া তাহাদের বড় বড় কামান আছে। বরং তাহাদের সেনা-পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ কর; নদীর ঘাট সমূহ চৌকী দাও, তাহাদের চিঠি-পত্র হস্তগত কর, খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ কর। তাহাদের চিঠির থলিয়া কাট এবং সর্ব্বক্ষণ তাহাদের শিবির সমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান কর। তাহাদের বিশ্রাম করিতে দিও না।"

সংগ্রাম ঘোষণার বেশ কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রাম প্রস্তুতি সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে গোপন চিঠি-পত্র আদান-প্রদান চলিতে থাকে। এইরূপ একটি পত্রে লেখা হয়, "সিপাহীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে শ্বেতাঙ্গরা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ হইয়া পড়িবে। বিদ্রোহ ঘটিলে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিনা বাধায় দখল হইবে।"

এই অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহেরও সমর্থন লাভের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা আজিমউল্লা খানকে সেই সময় নানা সাহেব ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের সামর্থ্য নির্দ্ধারণ করেন, এমন কি ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া ইংরাজদের রণকৌশল আয়ত্ত ও ক্ষমতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আজিমউল্লা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামে তুরস্ক ও আফগান দেশ যাহাতে ভারতীয়দের সমর্থন করে, তজ্জন্য চেষ্টা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণার জন্য ভারতীয়রা বহু দিন হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল। এই অভ্যুত্থান যে কতখানি ব্যাপক হইয়াছিল, তাহা বিদ্রোহের পরিসর ও বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। এক লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক ভূখণ্ড এই সময় বিদ্রোহীরা দখল করে এবং চার কোটি ভারতীয় কিছু দিনের জন্য বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরমত জ্বলিতে থাকে এবং দুইলক্ষ ভারতীয় এই সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করে। বিদ্রোহ দমন করিতে খরচ লাগিয়াছিল চার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। সিপাহীদের বিদ্রোহই ছিল আসলে অভ্যুত্থানের প্রধান ভিত্তি। সৈন্যরা যেখানে অনুগত ছিল সেখানে সামন্ত নৃপতি বা জনগণের অভ্যুত্থান বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মাদ্রাজ বাহিনী সমগ্র ভাবে এবং হিন্দুস্থানী সৈন্য বাদে বোম্বাই বাহিনী অনুগত ছিল। 'বেঙ্গল আর্মি'ই বিদ্রোহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাড়া দেয় এবং ঘাঁটির পর ঘাঁটিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে থাকে। এই বাহিনীতে মাত্র এগাটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ান ব্রিটিশের অনুগত ছিল।

বিদ্রোহের ব্যাপকতা

বিদ্রোহ যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইবে সামরিক আইন জারীর বহর হইতে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে —দিল্লী, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগ্রা. কাশী ও এলাহাবাদ বিভাগে, বাংলা, পাটনা ও ছোটনাগপুর বিভাগে, মধ্য-ভারতে, নিমুচ ও আজমীড়ে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছিল। পাঞ্জাব ও অযোধ্যায় কাগজে কলমে সামরিক আইন জারী না হইলেও কার্য্যতঃ কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল পঁচিশ হাজার, দিল্লীতে ত্রিশ হাজার, মধ্য-ভারতে পঞ্চাশ হাজার। বিদ্রোহ ঘোষণার পর দিল্লী, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড,ও বুন্দেলখণ্ড বিদেশী শাসকদের কর্ত্তৃত্ব মুছিয়া ফেলিল এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ( বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ ), মধ্য-ভারত, মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং পশ্চিম-বিহারে প্রচণ্ড যুদ্ধ

চলিতে লাগিল। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোষাগার বেদখল, খাজনা অনাদায় এবং সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইয়াছিল দেড় কোটি পাউণ্ড। বিদ্রোহ দমনের জন্য গভর্ণমেণ্টের ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল চার কোটি ষাট লক্ষ টাকা। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় বাংলা দেশে—ব্যারাকপুরে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুরে এক দল সিপাহী ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার করে। তাহাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় অথচ ভারতীয় সৈন্যদের ভারতের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইবে না বলিয়া তাহাদের নিয়োগের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঘটনার পর হইতেই 'বেঙ্গল আর্মি'তে অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহে ক্ষতির পরিমাণ

বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুরে চারি দল ভারতীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। এই চারি দলের মধ্যে ২য় ও ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্ট কান্দাহার এবং কাবুল যুদ্ধে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করে। অবশিষ্ট ৪৩ সংখ্যক ও ১৭ রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রথমোক্ত দলকে এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য সৈন্যশ্রেণী হইতে দূরীভূত করা হইয়াছিল এবং নূতন আর এক দল তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। সৈনিক-নিবাসের কর্ত্তৃত্ব চার্লস্ গ্রাণ্টের উপর ছিল। জন হিয়ারসে সমস্ত সৈনিক বিভাগের সেনাপতি ছিলেন।

সেনাপতি হিয়ারসে ২৮শে জানুয়ারী অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেলের কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন যে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্রমেই তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কতিপয় চক্রান্তকারী—সম্ভবতঃ বালিপাড়ার ব্রাহ্মণ—এইরূপ গুজব তুলিয়া দিয়াছে যে, সিপাহীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে।

শীঘ্রই বিদ্রোহের অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত হইল, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ব্যারাকপুরের ষ্টেশন পুড়িয়া গেল। এই অগ্নিকাণ্ড শীঘ্রই থামিল না। দেখা গেল, প্রতি রাত্রেই ইংরাজ অফিসারদের খড়ের চালে প্রজ্বলিত আগুনযুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাষ

উক্ত সময়ে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রাণীগঞ্জে ২ রেজিমেণ্টের এক শাখা অবস্থান করিতেছিল। সেখানেও ঠিক একই উপায়ে ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল।

ইহার পর রাত্রিকালে সিপাহীদের মধ্যে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রতি রাত্রিতেই উত্তেজিত সিপাহীদল সভায় ব্রিটিশের অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকে। সিপাহীরা কেবল সভা করিয়া নিরস্ত হইল না। তাহাদের অনেক চিঠি কলিকাতা ও ব্যারাকপুর হইতে বিভিন্ন সৈনিকাবাসে যাইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে ব্যারাকপুর হইতে এক শত মাইল দূরে বহরমপুর সৈনিক-নিবাসে ১৯ সংখ্যক দেশীয় সিপাহীর এক দল পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী এবং কতিপয় কামান-রক্ষী অবস্থান করিতেছিল। ব্যারাকপুরের উত্তেজিত সিপাহীদিগকে ইংরাজ সেনাপতির আদেশে সেই সময় বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করিয়া পাঠান হইতে থাকে। ইহাদের সকলেরই বহরমপুর পর্য্যন্ত যাইবার কথা থাকে। বহরমপুরের সিপাহীরা ইহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিলে উক্ত সৈনিকগণ পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পায়।

বহরমপুরে সৈনিকদের অসন্তোষ

৩৪ সংখ্যক সিপাহীদল ব্যারাকপুর হইতে বহরমপুরে পৌঁছিবার পর ১৯ সংখ্যক সৈনিক দলের মধ্যে আদেশ প্রচারিত হয় যে, তাহাদিগকে আগামী কাল প্রাতে কাওয়াজ করিতে হইবে। আদেশ প্রচারের দিন প্রাতঃকালে সৈনিকদের অসন্তোষের কোন বাহ্যিক চিহ্ন দেখা যায় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কর্ণেল মিচেলের সহকারী সিপাহীদিগের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেনাপতিকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের সময় সিপাহিগণ বন্দুকের ক্যাপ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। সেনাপতি মিচেল এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "টোটা এক বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, অফিসারদের আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যদি এই

কথার পরেও কেহ ইহা ব্যবহারে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশ কিংবা চীন দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে মৃত্যু ভিন্ন ইহাদের অদৃষ্টে আর কিছুই ঘটিবে না। যাহারা গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

সেনাপতি মিচেলের কথায় সিপাহীদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ভয় দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদিগকে পরদিবস প্রাতঃকালে কাওয়াজের সময় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করেন।

এই আদেশ প্রচার করিয়া সেনাপতি মিচেল রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। এই সময় সৈনিক-নিবাসের দিকে জয়ঢাকের শব্দ ও বহু সংখ্যক লোকের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যে চীৎকার ও কোলাহল উত্থিত হইল তাহাতে সেনাপতি মিচেল বুঝিতে পারিলেন, সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া বিপদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। অফিসারগণ কর্ণেল মিচেলের নিকট হইতে চলিয়া গেলে সিপাহীদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহারা সকলেই প্রাতঃ-কালের কাওয়াজের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের গভীর আশঙ্কা গভীর-তর হইল। সিপাহী দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষিপ্ত সিপাহী দল কেহ কেহ বন্দুক ভরিতে উদ্যত হইল, কেহ কেহ "ছোড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ কেহ অস্ত্রাগার অধিকার করিতে চলিল। গভীর নিশীথে বহরমপুরের সৈনিকনিবাসে এই ভাবে বিপ্লবের ধূমায়মান বহ্নির ক্ষীণ শিখা দেখা গেল।

সেনাপতি মিচেল এই কোলাহল শুনিয়াই শয্যা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহীদিগকে শীঘ্র সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন; কামান-রক্ষকদিগকেও আপনাদের কামানগুলি যথোপযুক্ত স্থলে লইয়া যাইতে আদেশ

দিলেন। সেনাপতির আদেশ প্রতিপালিত হইল। অশ্বারোহী সৈনিক দল সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। অন্ধকারময় নিশীথে মশালের আলোকে কামানরক্ষকেরা আপনাদের কামান সকল সিপাহীদিগের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সিপাহীরা দূরে কামানের চাকার শব্দ শুনিতে পাইতেছিল, প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সুসজ্জিত অশ্বারোহীদিগকে তাহাদের অভিমুখে আসিতে দেখিল। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেনাপতি মিচেল এই সময় ইউরোপীয় অফিসারদের শয্যা হইতে উঠাইয়া কামান সঙ্গে করিয়া কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সিপাহীদিগের হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহ সামরিক পরিচ্ছদ গ্রহণ করে নাই। সেনাপতির আদেশে কামান ভরা হইল এবং অশ্বারোহীরা কামানের নিকট সন্নিবেশিত হইল। মিচেল অতঃপর দেশীয় অফিসারদের একত্র হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন, আদেশ অনুসারে কার্য্য হইল। সেনাপতি মিচেল ক্রুদ্ধভাবে সিপাহীদের সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও দেশীয় সৈনিকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সমস্ত অবাধ্য সিপাহীকে কামানের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তিনি ইহার জন্য আত্ম বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছেন। সিপাহিগণ সমূহ বিপদের সম্মুখে সম্পূর্ণ অটল রহিল। অবশেষে দেশীয় অফিসারদের উপদেশ অনুযায়ী মিচেল অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদের আপন আপন স্থানে যাইতে ও পরদিবস প্রাতে কাওয়াজ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিলেন। সিপাহীদল ইহার পর ধীরে ধীরে নিজেদের আবাসস্থলে ফিরিয়া গেল।

সেনাপতি মিচেলের ক্রোধ

বহরমপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ কলিকাতায় কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন। গভর্ণর জেনারেল ভাবী বিপদের আভাষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদ্রোহী সৈনিকদের শাস্তি বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ঐ সময় কলিকাতা হইতে তিন শত মাইল দূরে দানাপুরে মাত্র এক রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। সুতরাং রেঙ্গুন হইতে ৮৪ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেণ্টকে আনিবার জন্য একটি ষ্টীমার প্রেরণ করা হয়।

ইতিমধ্যে বহরমপুরের সিপাহীদের হাঙ্গামার এক সপ্তাহ পরে কর্ণেল মিচেল বিদ্রোহী সৈনিকদের নিরস্ত্র করিবার জন্য ব্যারাকপুরে আনিতে আদিষ্ট হন। রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসে পূর্ব্বে জানিতে না পারিলেও সৈনিক নিবাসের প্রায় সকলেই জানিতে পারে। ইহার ফলে সৈনিকদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক দেখা দেয় এবং ইংরাজদের মনোভাব সম্পর্কে তাহারা আরও সন্দিহান হইয়া উঠে।

বহরমপুরের ঘটনার প্রতিক্রিয়া

ব্যারাকপুরের সিপাহীরা প্রধানতঃ কলিকাতার দুর্গ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানের পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময়ে ২ সংখ্যক সৈনিক দলের কয়েক জন দুর্গে পাহারা দিতেছিল। ঠিক এই সময় টাঁকশালার পাহারার ভার ৩৪ সংখ্যক সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। সন্ধ্যার সময়ে ২ সংখ্যক দলের দুই জন সিপাহী টাঁকশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। সুবাদার আলোর নিকট বসিয়া নিজেদের কার্য্য-সংক্রান্ত একটি পুস্তক দেখিতেছিলেন, এই সময়ে দুই জন সিপাহী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল যে, "গভর্ণর জেনারেল ব্যারাকপুরে গিয়া অস্ত্রাগারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং তথায় সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কলিকাতার সিপাহীরা কেল্লার সান্ত্রীদিগের সহিত একত্র হইবে। সুবাদার যদি এই সময়ে আপনার দল লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন তাহা হইলে কোম্পানী-সরকারকে পর্য্যুদস্ত করা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।" সুবাদার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সুবাদার এই দুই জন বন্দী সিপাহীকে দুর্গে পাঠাইলেন। সামরিক বিচারে ইহাদের চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

সেনাপতি হিয়ারসে বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষের ইঙ্গিত মনে করিয়া এই ঘটনাকে সামান্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলেন না। হিয়ারসে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর পরামর্শ অনুযায়ী সিপাহীদিগকে ১৭ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে কাওয়াজের

স্থলে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। হিয়ারসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্বারোহণে সিপাহীদিগের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার স্তোক বাক্যে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া বলেন যে, "তোমাদের শক্রগণ এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমরা এই অলীক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ, কিন্তু আমার অনুমতি না পাইলে কোন ইউরোপীয় সৈন্য ব্যারাকপুরে আসিতে পারিবে না।" এই ভূমিকার পর তিনি ১৯ সংখ্যক সিপাহীদলের অবাধ্যতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত সিপাহীদল ঘোরতর অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিবেন। যদি তিনি এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ইউরোপীয় এতদ্দেশীয় সমস্ত পদাতি, অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক সৈন্যকে, এই আদেশ যেরূপে কার্য্যে পরিণত হয় দেখিবার জন্য একত্র হইতে হইবে।

গভর্ণর জেনারেল এই সময়ে প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন, "১৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ৩০শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে বোধ হয় ব্যারাকপুরে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাদিগকে যে নিরস্ত্র ও সৈনিক দল হইতে নিষ্কাসিত করা হইবে, ইহা তাহারা নিশ্চিত জানে না। আমার বিবেচনায় ইহা তাহাদিগকে না বলাই ভাল।"

কিন্তু এদিকে ব্যারাকপুরে সেনাপতি হিয়ারসের বক্তৃতা সিপাহীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ধূমায়িত বহ্নি এত দিন পর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল ১৯ সংখ্যক সিপাহীদল সঙ্গে লইয়া ২০শে মার্চ্চ বহরমপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মিচেল সৈনিক দলের সহিত ৩০শে মার্চ্চ ব্যারাকপুর উপনীত হইয়া গভর্ণমেণ্টের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, ব্যারাকপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় অফিসার উত্তেজিত সিপাহীর অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।

২৯শে মার্চ্চ বৈকালে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা সংবাদ পাইল যে, ইউরোপীয় সৈন্যপূর্ণ জাহাজ শীঘ্রই ব্যারাকপুরে আসিয়া পৌছিবে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় সৈন্যদলকে চুঁচুড়া পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় হুগলী নদী পার হইয়া ব্যারাকপুরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা হয়।

মঙ্গল পাঁড়ে

ইউরোপীয় সৈন্য আসার সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন ৩৪ সংখ্যাক দলের ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, ইংরাজের সহিত শক্তি পরীক্ষার দিন আগত। উত্তেজনায় তরুণ সিপাহী যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং তরবারি ও গুলীভরা পিস্তল হস্তে আবাস-গৃহ হইতে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া তিনি সহকর্ম্মীদের তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। যুদ্ধের সময় যাহারা ভেরীধ্বনি করে, তাহাদের ভেরীধ্বনি করিয়া সকলকে একত্রিত করিবার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল না। সিপাহী যুবক উন্মত্তের ন্যায় সৈনিক নিবাসের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময় এক জন ইউরোপীয় অফিসার সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল, কিন্তু ইহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৪ সংখ্যাক দলের সিপাহীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলেও মঙ্গল পাঁড়েকে নিরস্ত কিম্বা তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; ইহাদের মধ্যে একজন হাবিলদার, অ্যাডজুটাণ্টের গৃহে যাইয়া সংবাদ দেয়।

উক্ত সিপাহীদলের অ্যাডজুটাণ্ট লেঃ বগ সংবাদ পাওয়া মাত্র যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীর অনুসন্ধান করিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে একটি কামানের পশ্চাদ্দেশ হইতে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। গুলী অশ্বারোহীর কোন অনিষ্ট করিল না কিন্তু উহার আঘাতে তাহার বাহনটি ভূতলশায়ী হইল। অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে লেঃ বগও মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বগ নিমেষ মধ্যে উঠিয়া

আক্রমণকারীর দিকে পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, বগ তখন অসি নিষ্কোশিত করিলেন। এই সময়ে সার্জেণ্ট মেজর হিউসন অসি হস্তে তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়ে অসীম সাহসে অসি চালনা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদ্বয় ইহার আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহী সিপাহী যুবকের অসিচালনা কৌশলে লেঃ বগ ও তাহার সহকারী উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে সেখ পলটু নামে এক জন মুসলমান সৈনিক, ইউরোপীয় সৈনিক-দ্বয়ের প্রাণরক্ষার জন্য ঘটনা-স্থলে অগ্রসর হইল। মঙ্গল পাঁড়ে, লেঃ বগকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইয়াছিলেন, এমন সময় পলটু ত্বরিত-গতিতে আসিয়া দক্ষিণ বাহু দ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। পলটুর বাম বাহু সিপাহী যুবকের উত্তোলিত অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পলটু মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিল না। লেঃ বগ ও সার্জেণ্ট মেজর হিউসন শোণিতাপ্লুত অবস্থায় স্বকীয় আবাসে যাইবার সময় উপস্থিত সিপাহীদের গালি দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িবার জন্য পলটুর উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। পলটু আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। কাথত আছে, ইউরোপীয় সৈনিকদ্বয় আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলে, কোন কোন সিপাহী আপনাদের বন্দুকের বাঁট দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই সময় এক জন সুবাদার ও কুড়ি জন সিপাহী পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইহারা কেহই মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিবার চেষ্টা করে নাই।

সেখ পলটু

উপস্থিত গোলযোগের সংবাদ ক্রমে সেনাপতি হিয়ারসের নিকট পৌছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও সামরিক পোষাকে অশ্বারোহণে পিতার অনুগামী হইলেন। মঙ্গল পাঁড়ে অধীর ভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিল, এমন সময় সেনাপতি হিয়ারসে এবং অন্যান্য সকলে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়েকে

বন্দুক উঠাইতে দেখিয়া হিয়ারসের একটি পুত্র চীৎকার করিয়া বলে, "বাবা! উন্মত্ত সিপাহী আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে।" কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে সেনাপতিকে লক্ষ্য করিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া বিদেশী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, তখন তিনি বিরাগে হতাশ্বাসে আপনার বন্দুক আপনার দিকে ধরিয়া পা দিয়া ঘোড়া ফেলিয়া দিলেন। গুলীর আঘাতে মঙ্গল পাঁড়ে বিশেষ ভাবে আহত হন।

৩০শে মার্চ্চ ১৯ সংখ্যক সৈনিক দল যখন বারাসতে অবস্থিতি করিতেছিল, তখন ব্যারাকপুরের সিপাহীদিগের কয়েক জন গুপ্তচর তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। চরেরা এই সকল পুরাতন বন্ধুদের তাহাদের সহিত বিপ্লবে যোগদান করিতে অনুরোধ করে। যদি তাহারা তাহাদের সহিত যোগদান করে তাহা হইলে কলিকাতা ও ব্যারাকপুরে, ইউরোপীয় সৈন্যের পরাজয় সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বারাসতের সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। তবে তাহারা ব্যারাকপুরের সিপাহীদের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিল না।

সেনাপতি হিয়ারসে ১৯ সংখ্যক সিপাহীদিগের ৩১শে মার্চ্চ নিরস্ত্রীকরণের দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই সময় দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিক দল আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগে হয়ত অসম্মত হইতে পারে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের সিপাহীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে বাধা দিতে পারে বলিয়া ব্যারাকপুরের ইউরোপীয়গণ মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদ পাইলেন যে নিরস্ত্রীকরণের পূর্ব্ব দিন সিপাহী দল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে এবং উত্তেজিত সিপাহীরা সমস্ত ইংরাজ অফিসার ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করিবে। অনেক ইংরাজ মহিলা এই সময় কিছু দিনের জন্য ব্যারাকপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিক দল সেনাপতি হিয়ারসের আদেশে কাওয়াজের মাঠে শান্ত ভাবে দণ্ডাদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত ছিল। কামানের পার্শ্বে ইংরাজ সৈন্য রণ-সাজে সজ্জিত। এই সময়

সজ্জার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অবাধ্য সৈনিকদের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা। অদূরে ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলও দাঁড়াইয়াছিল। ব্যারাকপুরের সিপাহী দল নীরবে ইংরাজ সেনাপতির আদেশে সামরিক চিহ্ন সকল ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ঐ দিন আর কোন প্রকার গোলযোগ হইল না।

মঙ্গল পাঁড়ের বিচার ও ফাঁসী

১৯ সংখ্যক দলের নিরস্ত্রীকরণের ছয়দিন পরে মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারীকে আঘাতের অপরাধে বিচার আরম্ভ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়ামে সুবেদার মেজর জবাহিরলাল তেওয়ারীর সভাপতিত্বে ১৪ জন দেশীয় সামরিক কর্ম্মচারীকে লইয়া এক আদালত গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হ্যাচ ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেন। মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে পাঁচ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মামলা আরম্ভ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গল পাঁড়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত এক জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন—তোমার কি কিছু প্রকাশ করিবার আছে, অথবা তোমার কোন বক্তব্য আছে ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—গত রবিবারে তুমি যাহা করিয়াছিলে তাহা কি তুমি স্বেচ্ছায় করিয়াছ অথবা অন্যের প্ররোচনায় করিয়াছ ?

উত্তর—আমি স্বেচ্ছায় করিয়াছিলাম। আমি মৃত্যুর আশা করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—তুমি কি নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য বন্দুকে গুলী ভরিয়াছিলে ?

উত্তর—না, আমার জীবন শেষ করিতে চাহিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—তুমি কি অ্যাডজুটাণ্টের জীবন নাশ করিতে চাহিয়াছিলে, না অন্য কাহাকেও গুলী করিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল ?

উত্তর—যে কেহ আমার সম্মুখে আসিত তাহাকেই গুলী করিতাম।

উক্ত ঘটনার সহিত আরও কেহ জড়িত আছে কি না ইহা বন্দীকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁহাকে ইহাও আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের

কারণ নাই—নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু বন্দী দৃঢ়ভাবে অন্ত কিছু বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

বিচারের প্রহসনের পর বন্দী কোন প্রকার জেরার উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। ইহার পর বিদ্রোহী মঙ্গল পাঁড়ের উপর নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করা হয়।

"The court sentence the prisoner, Mungal Pandey, Sepoy, No 1446, 5th Company, 34th Regiment, Native Infantry, to suffer death being hanged by the neck until he be dead."

Approved and confirmed.

Barrackpore } (sd.) J. B. Hearsey. Maj-Genl
The 7th April 1857. } Comdg. the Presy. Divn.

৮ই এপ্রিল প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসীর সময় নির্দ্ধারিত হয়। গুলীর আঘাতের ক্ষত তখনও তাঁহার ভাল হয় নাই। অবিকার চিত্তে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণের জন্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন। অন্তিম সময়েও সতীর্থগণের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। ফাঁসীর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা গ্রহণ করা হয়। চুঁচুড়া হইতে ইংরাজ সৈন্তদল ব্যারাকপুরে নদীর কিনারায় অপেক্ষা করিতে থাকে। কাওয়াজের মাঠে সমুদয় সৈন্তের সম্মুখে ফাঁসীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ধীর শান্ত পদক্ষেপে বীর যুবক ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিয়া ফাঁসীর রজ্জু চুম্বন করিয়া স্বহস্তে আপনার গলায় পরাইয়া দেন।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বলি মঙ্গল পাঁড়ে!

এই ঘটনার দুই দিন পরে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের সামরিক আদালতে বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি বিপন্ন ইংরাজের জীবনরক্ষার্থে বিদ্রোহী মঙ্গল পাঁড়েকে ঘটনা-স্থলের নিকটে থাকিয়াও গ্রেপ্তার করিতে সাহায্য করেন নাই।

বন্দী নিজেকে নির্দোষী বলে।

তিন দিন বিচারের প্রহসনের পর ঈশ্বরী পাঁড়ের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া

হয়। সেনাপতি হিয়ারসের উপর এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হয়। ২১শে এপ্রিল অপরাহ্নে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের ফাঁসী হয়।

মুসলমান আর্দালী সেখ পলটু মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ হইতে লেঃ বগ ও সার্জ্জেণ্ট মেজর হিউসনকে রক্ষা করার জন্য পদোন্নতি হয়। সেখ পলটু হাবিলদার শ্রেণীতে নিবেশিত হয়।

এ পর্য্যন্ত ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। সেনাপতিদিগের মতে এই সৈনিক সম্প্রদায় ১৯ সংখ্যক সিপাহী দল অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ইহারা ধীর ভাবে মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ চাহিয়া দেখিয়াছিল, অবজ্ঞার সহিত লেঃ বগের কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল। ব্যারাকপুরের ইউরোপীয়-দিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দল সশস্ত্র থাকিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই সৈনিক দলের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি সামরিক কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়। কমিটি বিশেষ অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের শিখ ও মুসলমান সৈন্য বিশ্বাসী, কিন্তু এই দলের হিন্দু সৈন্য তাদৃশ বিশ্বাসী নহে। "The court, from the evidence before them, are of opinion that the Sikhs and Mussalmans of the 34 Regiment, Native Infantry are trustworthy soldiers of the state, but the Hindus generally of that corps are not trustworthy."

কলিকাতার টাঁকশালার যে সুবাদার কেল্লার দুই জন উত্তেজিত সিপাহীকে অবরুদ্ধ করিয়া আপনার বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন, বিচারকগণ তাঁহাকেও ঘোরতর অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের যে সাত কোম্পানী সৈন্য ব্যারাকপুরে ছিল তাহাদের ৬ই মে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়। এই নিরস্ত্রীকরণের পালা শেষ হইবার পর ৮৪ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেণ্টকে লর্ড ক্যানিং যখন বর্ম্মায় ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই সময় মীরাটে সেনানিবাসে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। তাহারা মীরাটের সমস্ত ইংরাজ সেনানায়ককে বধ করে। তাঁহাদের বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভারতবর্ষের সিপাহী সেনা বারুদের স্তূপের মত অগ্নিগর্ভ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে সারা ভারতে সেই দাবাগ্নি-শিখা পরিব্যাপ্ত হইল।

ভারতব্যাপী গণবিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণবিদ্রোহ দেখা দিল। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দী, ঝান্সী, বিহারের কিয়দংশে প্রথম হইতেই জনসাধারণ সিপাহীদের সহিত যোগদান করিয়া সিপাহী বিদ্রোহকে গণ-সংগ্রামে পরিণত করে। বিদ্রোহী সিপাহীদল চলিল দিল্লী অভিমুখে, সিপাহীদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।"

বাহাদুর শাহের জয়ধ্বনি করিয়া সিপাহীরা সেদিন দিল্লী দখল করিল, সমস্ত ইংরাজ নিহত হইল, তাঁহাদের ধনাগার লুণ্ঠিত হইল, দিল্লীর লাল কেল্লায় মোগল সাম্রাজ্যের বিজয়-কেতন আর একবার সগৌরবে উড্ডীন হইল।

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়াড় প্রভৃতি দেশের হিন্দু রাজন্যদের নিকট বাহাদুর শাহ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, হিন্দুস্থান হইতে ইংরাজ বিতাড়নই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত ভাবে অস্ত্রধারণের আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন, দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ।

বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রবল বেগে সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হইল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মীরাট, বেরেলী ও ঝান্সী। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র নানা সাহেব। নানা সাহেবকে লর্ড ডালহৌসী পেশবার বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন।

বেরেলীতে মে মাসে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করে। এক বৎসর যাবৎ সেখানে বিদ্রোহীদের আধিপত্য চলিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্যার কলিন ক্যাম্পবেল উহা অধিকার করেন।

ঝান্সীর বিদ্রোহের নায়িকা ছিলেন ঝান্সীর বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী রাণী লক্ষ্মীবাঈ। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পুরুষ-বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এই বীরাঙ্গনা। তাঁহার নিজ সৈন্য সহ তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন ; ঝান্সীতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। রাণী রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দেন।

গোয়ালিয়র রাজ্য, গোয়ালিয়রের ঐতিহাসিক দুর্গ দখল করেন মহারাষ্ট্র বীর তাঁতিয়া টোপী। শিবাজীর শৌর্য্য ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া তিনি বহুবার বিপ্লবীদের রক্ষা করিয়াছেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগদান করে নাই, ফলে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ সফল হয় নাই। একমাত্র তাঁতিয়া টোপীই নর্ম্মদার দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

ফৈজাবাদের নেতৃত্ব করেন মৌলবী আহম্মদ শাহ। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বাণী এবং ব্রিটিশ-বিদ্বেষ তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অযোধ্যার হিন্দু-মুসলমানকে সম্মিলিত ভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলে।

দিল্লী অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বাদশাহ বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয়। আম্বালার বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী আক্রমণ করে। সেনাপতি নিকল্‌সন ছিলেন তাহাদের অধিনায়ক। বিদ্রোহীরা দিল্লী শহরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। অবরোধকারী ব্রিটিশ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। যমুনা-পথে আক্রমণের চেষ্টা হইলে দিল্লীর লাল কেল্লা হইতে ইংরাজ সৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি হয়। অবশেষে নিকল্‌সন কাশ্মীর দরওয়াজার উপর অবিরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর দরওয়াজা ১৪ই সেপ্টেম্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইংরাজ সৈন্য ভগ্ন দ্বারপথে অগ্রসর হইল। বাদশাহের সিপাহীরা বিনা যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিল না। এই যুদ্ধে সেনাপতি নিকল্‌সন নিহত হইলেন। নিকল্‌সনের সহকারী হাডসন সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে সিপাহী সৈন্যকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দিল্লীর পথে পথে

যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মন্দিরে-মসজিদে বীরের রক্তচিহ্ন অঙ্কিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দু-মুসলমানের—দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের—দিল্লী নগরীর পতন হইল।

সেনাপতি হাডসন বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয় ও এক পৌত্রকে স্বহস্তে গুলী করিয়া নিহত করেন।

বর্ত্তমানে যাহাকে গোরিলা যুদ্ধ বলা হয় সিপাহীরাই তাহার প্রথম নমুনা দেখাইয়াছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গণ-সংগ্রামে। অকস্মাৎ আক্রমণ ও অতর্কিত যুদ্ধই ছিল বিদ্রোহীদের রণনীতি। এই গোরিলা যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করিয়াছিল বিহার প্রদেশে, জগদীশপুরের অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা কুমারসিংহের নেতৃত্বে। রণ-পণ্ডিত কুমারসিংহ ব্রিটিশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বারংবার ধ্বংস করিয়াছেন। স্বাধীন জগদীশপুরের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ অসি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাণদান করেন।

সাম্রাজ্য-লোলুপ ইংরাজ কোম্পানীর অত্যাচার ও কু-শাসনের কবল হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিবার এই সংগ্রামে দুই লক্ষাধিক ভারতবাসী আত্মাহুতি দেয়। বিদ্রোহ দমনকল্পে ইংরাজরা ভারতীয়দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, নৃশংসতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়া ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। ক্রমাগত কিছু কাল ধরিয়া ইংরাজরা দোষী, নির্দ্দোষী, স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু-নির্ব্বিশেষে ভারতীয়দের হত্যা করে। তাহাদের বাড়ী-ঘর পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে; গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়। প্রায় প্রত্যেক ইংরাজের মনে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যেন রক্তের নেশা পাইয়া বসিয়াছিল। এক একটি শহরে ভারতীয় সৈন্যদের বিনা বিচারে পাইকারী হারে ফাঁসীতে লটকান হয়। ঊর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অসমর্থিত এক পুস্তকে বলা হইয়াছে; "তিনমাস কাল প্রতিদিন মৃতদেহ বোঝাই আটখানি গাড়ী সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শব স্থানান্তরিত করার কাজে যাতায়াত করিত। ঐ সকল শব চৌমাথা ও বাজারে ঝুলান থাকিত। এই ভাবে ছয় হাজার লোককে সরাসরি মৃত্যুর কবলে পাঠান হয়।" ইংরাজদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

# নীল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক সময়েই ( ১৮৫০-১৮৬০ ) বাংলা দেশে নীল-চাষীদের বিদ্রোহ দেখা যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া নীল-চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনিলেন। নীল-চাষের ইতিহাস নীলকরগণের অত্যাচার নিপীড়নের কালিমায় রঞ্জিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রথমে নীল ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে তাহার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হইলে বে-সরকারী শ্বেতাঙ্গরা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

নীল বিদ্রোহ

নীলকরগণ নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের খাতিরে দরিদ্র নীলচাষীদের উপর অত্যাচার বহু দিন হইতেই চালাইয়া আসিতেছিল। এই অত্যাচার নদীয়া, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চরমে উঠে। নীলকরগণের অত্যাচার বাংলা দেশে যেমন ছিল বিহারের কয়েকটি জেলাতেও সেইরূপ ছিল। নীল-চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার সার্ফ ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। নীলকরগণ কর্ত্তৃক টাকা দাদন দিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীদের প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন না হইলে, পর-বৎসর নীল উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট চাষীকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বৎসরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে তাহাদের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরগণের জমিদারী, তালুকদারী ক্রয়, প্রজাদের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে পারে, নির্ব্বিচারে অব্যাহত ভাবে চালান হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে মফঃস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেহ কেহ সরকারী

ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। ইহার ফলে প্রজাদের দুর্দ্দশা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।

নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌগাছার অধিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এই দুই ভ্রাতা কুঠিয়ালদেরই দেওয়ান ছিলেন; কিন্তু নীলকরদের ক্রম-বর্দ্ধমান অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়েন। বিশ্বাসভ্রাতৃদ্বয় কাজে ইস্তফা দিয়া প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও গান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রজাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্রজার পক্ষ লইয়া মোকদ্দমা, লড়াই, লাঠিয়াল পাঠাইয়া প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়, তবুও তাঁহারা বিন্দুমাত্র দমেন নাই। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুই ভ্রাতার নাম নীলকৃষাণ-বন্ধু হিসাবে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

হিন্দু-মুসলমান কৃষাণদের এই যুক্ত আন্দোলনে মালদহের নারায়ণপুর গ্রাম-নিবাসী রফিক মণ্ডলের অবদানও বড় কম নহে। এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক এই রফিক মণ্ডল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, 'নীল-সংক্রান্ত আন্দোলনে রফিক সর্ব্বাপেক্ষা বড় নায়ক'।

নীল-আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিতে থাকেন। বারাসত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্ম্মে এক পরোয়ানা জারি করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন, এই জন্য চাষীদের উপর জোর জুলুম করা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই ঘোষণায় আশান্বিত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ এই ধর্ম্মঘট পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। চাষীদের এই ধর্ম্মঘট বা জোট 'নীল হাঙ্গামা' নামে পরিচিত।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে বিভিন্ন জেলায় অবস্থানকালে নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফল বিখ্যাত "নীলদর্পণ" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। পাদ্রী জেমস্ লঙ উক্ত নাটকটি কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে দিয়া অনুবাদ করাইয়া ইংরাজ মহলে প্রচার করেন। ইহাতে বাংলার সমস্ত ইংরাজ-গোষ্ঠীই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট, লঙের বিরুদ্ধে এক মামলা জুড়িয়া দিলেন এবং বিচারে বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ লঙকে অর্থদণ্ড এবং এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানার টাকা দিয়া দেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। নাটকটি অনুবাদ করার কালে মধুসূদনকে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। এই সময় হরিশচন্দ্র মারা যান। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'আট আইন' দ্বারা নীল-চুক্তি আইন রদ করা হয়। নীল-আন্দোলনে লঙ এবং হরিশচন্দ্রের ত্যাগস্বীকার ও বিশ্বাসভ্রাতৃদ্বয়ের এবং রফিক মণ্ডলের সক্রিয় প্রতিরোধ বৃথা যায় নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যে নীল-অত্যাচার দমিত হয়।

কোম্পানী শাসনের অবসান

এদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও এই বিদ্রোহের ফলে বিলাতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহার ফলাফল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরপক্ষে সামলান কঠিন হইয়া পড়ে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নূতন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। ইহার পর "কোর্ট অব ডিরেক্টরস্" তুলিয়া দেওয়া হয় এবং ভারত-শাসনের চূড়ান্ত দায়িত্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। (১) প্রথমতঃ, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করিবার নীতি গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন। যে যে অঞ্চলের সৈন্যরা বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের যথাসম্ভব সেনাবিভাগে প্রবেশাধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। (২) সিভিল সার্ভিসকেও যথাসম্ভব মজবুত করা হয়। ছোটখাটো সরকারী চাকুরীগুলিতে ভারতীয়

গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। (৩) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং পরবৎসরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির প্রবর্ত্তন করা হয়। শেষোক্ত বৎসরেই সুপ্রীম কোর্ট তুলিয়া দিয়া হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ জাতি ভারত শাসনের ভার গ্রহণের পর নবগঠিত শিখ ও গুর্খা বাহিনী সরকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ব্রিটিশ নীতি-চাতুর্য্যের ফলে শিখ ও গুর্খারা ইংরাজের পরিবর্ত্তে নিতান্ত ভ্রমবশতঃই স্বদেশবাসী হিন্দুস্থানী সিপাহীদের শত্রু বলিয়া গণ্য করিত। সেনাপতি ম্যান্‌সফিল্ড বলেন, 'শিখরা যে সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমাদের পক্ষ লইয়া লড়াই করিয়াছে তাহার কারণ এই নয় যে, তাহারা আমাদের অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখে; তাহার কারণ এই যে, তাহারা বাঙ্গালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে!'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার ছিলেন সার জন লরেন্স। তিনিও স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলেই বলিয়াছেন যে, 'বাঙ্গালী পল্টনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যমত আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছে'। সরকার বাঙ্গালী পল্টনের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, রাজপুত ও গুর্খা দিয়া সৈন্যদল পূর্ণ করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যও অধিক সংখ্যায় ভারতে রাখার ব্যবস্থা করা হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের অনাচারের ফলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। কোম্পানীর আমলে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের ক্লেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও এক-জাতীয়ত্ব বোধে অনুপ্রাণিত করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারী ও বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজ এমনি একান্ত ভাবে স্বদেশ ও স্বজাতীর স্বার্থ-রক্ষায় অগ্রসর হইল যে, ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের মনে উপস্থিত হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই লিখিয়া শেষ করেন। মেঘনাদবধ বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন বা তাহার প্রশস্তিবাদ করিতে তখন কেহই ভরসা করিত না। ক্যানিং-এর আমলে যে প্রেস আইন নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হয়, তাহার বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক পুস্তিকা সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইতে পারিত। মধুসূদন কাব্যচ্ছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জাতিদ্রোহিতা এবং তাহার বিষময় ফল স্বদেশবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে কংগ্রেসের জন্মলাভের সময় পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকবর্গের দমন-নীতির প্রতিবাদে দেশপ্রেমিক মনীষীদের লেখনীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে ভারতের গণ-চেতনার বৈপ্লবিক বিবর্ত্তন এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ভারতের ভাবধারার এক ঐক্যসূত্র বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ডরূপ দান করিলেও রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম এই ঐক্যবোধে জাগ্রত হইয়া ভারতীয়দের চিন্তাধারায় বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। সেদিক দিয়া রাজা রামমোহন রায়কেই ভারতীয় জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও নব্য ভারতের স্রষ্টা বলিতে হইবে। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান ছাড়াও পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্যও তিনি আজীবন ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময় দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারতীয়দের চেষ্টায় ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ।

রাজা রামমোহনের এই প্রচেষ্টা বাংলা দেশে যে আলোড়ন জাগায় তাহার ফলে তাঁহার শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ইয়ং বেঙ্গল দলের নায়ক রামগোপাল ঘোষ এবং রামমোহনের সংস্কারের উত্তর-সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অখণ্ড ভারত সম্পর্কে রাষ্ট্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। রাষ্ট্রিক চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতে এই সময় সংবাদপত্র ও পত্রিকা সমূহের অবদান বড় কম নহে। রামমোহন রায়ের 'সংবাদ-কৌমুদী,' 'মিরাৎ-উল-আখবর' ও 'বেঙ্গল হেরাল্ড;' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফরমার;' তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর 'কুইল;' কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার;' রামগোপালে ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর;' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি সংবাদপত্র ও পত্রিকা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন

চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ক্রমশঃ ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্র-চেতনার উন্মেষ সাধন করিতেছিল।

এই নব্য ভাবধারার প্রতি জনমত আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া সরকার প্রমাদগণিলেন এবং পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস এক্ট' পাশ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ৩৫টি পত্রিকার মধ্যে ১৫টি পত্রিকার প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় যে, এইগুলি রাজদ্রোহমূলক। "'সমাজ-দর্পণ,' 'সাধারণী,' 'হিন্দু হিতৈষিণী,' 'সুলভ সমাচার,' 'প্রতিকার,' 'বিশ্বদূত,' 'ঢাকা প্রকাশ,' 'ভারত মিহির,' 'ভারত সংস্কারক' ও 'সোমপ্রকাশে'র উপর সরকারী রোষ তীব্র হইয়া উঠে। সংবাদপত্রগুলির মুক্তি-বার্ত্তা প্রচার বৃথা যায় নাই। 'ভারত সভা'র আন্দোলনের পর দশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বাংলার জেলায় জেলায় "পিপলস্ এসোসিয়েশন" নামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধনীপ্রভাবিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অত্যন্ত রাজভক্ত হইয়া উঠায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের লইয়া শিশিরকুমার ও তাঁহার ভ্রাতা হেমন্তকুমার ঘোষ একটি প্রগতিশীল দল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়া লীগের" প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষিত হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে চৈত্র বা 'হিন্দু মেলা' ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিকল্পে রাজনারায়ণ বসুর স্থাপিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার আদর্শে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈত্র মেলা'র উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" ইহার অপর উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেন্দ্রনাথ বলেন,

"যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" 'হিন্দু মেলা'র কর্তৃকপক্ষগণ জাতীয়-জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে সজীব করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। ঐক্যবোধ বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে মেলার কর্ম্মিবৃন্দ দৃষ্টিদান করেন। জাতীয়-জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কার-কল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এই সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য বহু দূরবর্ত্তী হইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ।

সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছিল এবং ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন অতঃপর ইউরোপীয় সমাজকে তাহাদের উপর ঈর্ষান্বিত ও কুপিত করিয়া তুলিলেও সমগ্র ভারতে বাঙ্গালী শিক্ষায় অধিক অগ্রসর হয়। এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি তাহাদের উপরই পড়িল বেশী করিয়া। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেই বাংলার বাহিরে কর্ম্মচারি নিয়োগ সম্পর্কে এই আদেশ জারি হইয়াছিল যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সরকারী কার্য্যে পারতপক্ষে যেন নিয়োগ করা না হয়।

রাজরোষ কেবল বাংলা ও বাঙ্গালীর উপর নিবদ্ধ থাকে নাই, অন্যত্রও ইহার প্রকোপ কম-বেশী পতিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ হইতেই মুসলমানদের উপর ইংরাজ বিরক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর ওয়াহবী আন্দোলন ভারতবর্ষে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সরকারের মতে ওয়াহবীদের, ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া ভারতের শাসন-যন্ত্র হস্তগত করারও অভিপ্রায় ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, উত্তর-ভারতে ওয়াহবী দলভুক্ত এক দল গোঁড়া মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইতে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়, বিদ্রোহের পরে অত্যাচার অনাচারে, দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত হইয়া ব্রিটিশের উপর বিশেষ ভাবে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। যদিও তাহারা সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল পাটনা। ওয়াহবী-নেতা আমীর খাঁকে সরকার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার প্রকাশ্য বিচারের জন্য কলিকাতা

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেন্টন নরম্যানের এজলাসে আবেদন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ্যানেষ্ট আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি সওয়াল জবাবে লর্ড মেও'র শাসন-কালের (১৮৬৯-৭২) অনাচার-অবিচারের কথা বিশদ ভাবে উল্লেখ করেন। এ্যানেষ্টর এই বক্তৃতা সমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহবীরা পুস্তিকাকারে চতুর্দ্দিকে বিলি করে। ইহার কিছু দিন পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রধান বিচাপতি নরম্যান, আবদুল্লা নামে এক আততায়ীর ছোরার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং সেই দিন রাত্রেই মারা যান। ইউরোপীয় সমাজ এ জন্য এত দূর ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, আবদুল্লার ফাঁসি হইবার পর তাহার শব কবর না দিয়া ভস্মীভূত করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণ কালে শের আলী নামক এক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড মেও প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই শের আলী খাইবার গিরির পাদদেশ জামরাদ গ্রামের বাসিন্দা। এই সকল ঘটনার মূলে ওয়াহবী দলের কার্য্য বলিয়াই সরকারের ধারণা।

বিচারপতি নরম্যান হত্যা

এই সময় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে সিভিল সার্ভিস হইতে বিতাড়ন একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতে ও ভারতে কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল; তাহাদের কর্ম্মশক্তি নব নব পথ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইল।

ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব বোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম দান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন এবং ক্রমাগত চার বৎসর কাল স্বহস্তে সম্পাদনা করিয়া আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর ধমনীতে নূতন রক্ত-প্রবাহের সৃষ্টি করে; জাতীয়-জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিয়া দেয়।

এদিকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা নগরীতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম আন্দোলনের তরুণ নেতৃবৃন্দ সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহার আদর্শ ও কার্য্য ধারার সহিত রাষ্ট্রিক মুক্তির এক নবরূপ প্রদানের অভিনব প্রকাশ দেখা যায় তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ ঘোষণা করিলেন, "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী এক মহা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাঁহাদের মধ্যে এক দল নবীন কর্ম্মী শিবনাথের অনুপ্রেরণায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; সেই 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেন, "একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের ভবনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্গীকার করেন। একটি অঙ্গীকারে স্পষ্ট এই নির্দ্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেহ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিবেন না। কারণ তাঁহাদের মতে ব্রিটিশ জাতি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে। তবে তাঁহারা সরকারী আইন ভঙ্গ করিবেন না।" শিবনাথ তখনও সরকারী চাকুরিয়া। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।' শিবনাথ ইঁহার কিছু কাল পরে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

নব্য বাংলার অভ্যুদয়

আনন্দমোহন বসু এই সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি-সাধকের দলে যোগদান করিলেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার সহিত সহানুভূতি বশতঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষও এই দলে যোগদান করেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে এলবার্ট হলে জনসভায় অধিবেশনে 'ভারত সভার' প্রতিষ্ঠা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগীতায় সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার যুগান্তকারী বক্তৃতা 'ম্যাটসিনী ও নব্য ইতালী,' 'শিখ-শক্তির অভ্যুদয়,' 'চৈতন্ত ও সমাজ বিপ্লব' ছাত্র সমাজকে নূতন প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করে।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, "সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনী বিষয়ক বক্তৃতা হইতে প্রেরণা পাইয়া আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিলাম। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হই নাই বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্ত-হত্যার কথাও চিন্তা করি নাই। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির বিষয় জানি—আমি অবশ্য ইহার সভ্য ছিলাম না—যাহার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করিয়া রক্ত বাহির করিতেন এবং সেই রক্ত দিয়া অঙ্গীকার-পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতিতেও তাঁহাদের একটি গুপ্ত সমিতির কথা বিশদ্ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইহার সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান কর্ম্মনায়ক।

## গুপ্তসমিতির গোড়ার কথা

ইউরোপীয় ধারায় এ দেশে গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণের নেতৃত্বে ঠাকুর-বাড়ীর তরুণের দল "হামচুপামুহাফ" নামক রহস্যময় নামে এক সমিতি গঠন করিয়া অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাস করিতেন।

হামচুপামুহাফ

এই সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে,—"জ্যোতি দাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীর দল। কলিকাতার এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল। ......এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে।...রাজ্যের মধ্যে বীর-ধর্ম্মের পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্ম্মে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত ও পরিণাম অভাবনীয়।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতিতে এই সভার সম্বন্ধে আছে যে,—"সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে তাহা কখনও অসভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না।...টেবিলের দুই পাশে দুইটি চক্ষু-কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।"

কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হইত। এই

গুপ্ত ভাষায় সঞ্জীবনী সভাকে "হামচুপামুহাফ" বলা হইত। এই ধারা গোপনে গোপনে শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল। ইংরাজ শাসন যে এদেশের স্বাধীনতার অন্তরায় তাহা বুঝিয়া এদেশবাসীর মন এই শাসনের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতে ও যুবজনের মনে স্বদেশের স্বাধীনতা আনিবার সঙ্কল্প জাগাইতে দেশের ভাবুক সমাজ মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিপ্লবাত্মক ভাবধারা প্রচার মানসে তৎকালে জাতীয় ভাবধারা উদ্দীপক সকল প্রচলিত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সঙ্কলন পুস্তক "জাতীয় সঙ্গীত" প্রকাশ করেন।

ঠিক এই সময়েই ম্যাটসিনী গ্যারিবল্ডি দেশ উদ্ধারের জন্য ইতালীতে যে গুপ্ত কারবোনারি আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই দেশে আসিয়া পড়ায় এক নব ভাবের বন্যা যুবজনের চিত্তকে ভরিয়া তুলিল। ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞদেরও এই সংগ্রাম-কাহিনী জানাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনীর জীবন কথা বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ম্যাটসিনীর জীবনের শেষাংশ অনুবাদ করেন নাই, কারণ তিনি বলিতেন যে, তাঁহার জীবনের শেষ দিকের ইতিহাস বিফলতার ইতিহাস, দেশের যুবজনচিত্তে যে অনুপ্রেরণা ম্যাটসিনীর প্রথম জীবনের কর্ম্মপ্রয়াস হইতে সঞ্চারিত হইবে, শেষ জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাসে সেই উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়িতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ বিপ্লবী দল গঠন মানসে হুগলি জেলার বহুস্থানে কুস্তি ও লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও বিপ্লবী দলের সহিত সক্রিয় যোগ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহার আত্মীয় অন্নদা কবিরাজ মহাশয় ও জামাতা ললিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপ্লবী দলের কর্ম্মী হন। ললিতবাবুর ভাগিনেয় বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ললিতবাবুর মধ্যস্থতায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "সঞ্জীবনী সভা" ও "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যে বিপ্লবী মনোভাব দানা বাঁধিবার আশ্রয় খুঁজিতেছিল, তাহা ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দের পর হইতে শুধু বাংলা কেন সমস্ত ভারতে দানা বাঁধিয়া উঠিবার মত সুযোগ লাভ করিল। আদেয়ার যুদ্ধে কৃষ্ণকায় আবিসিনিয়াবাসীদিগের নিকট ইতালীর বিষম পরাজয় ঘটে। এই ব্যাপার হইতে এক দল ভারতীয় ভাবুক শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে সন্দেহ প্রকাশ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতের পক্ষে শস্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সম্ভাব্যতা প্রচার আরম্ভ করেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশ্যভাবে গোরিলা যুদ্ধের বিষয় প্রচার করিতে থাকেন।

কাকাসু ওকাকুরা

বাংলার গুপ্ত আন্দোলনের যে ধারাটি ঠাকুর-বাড়ীর আওতায় জীবিত ছিল সেই ধারাটি জাপানী চিত্রশিল্পী অধ্যাপক কাকাসু ওকাকুরার আগমনে নব তেজে বিকসিত হইয়া উঠে। অধ্যাপক ওকাকুরা "হরি" নামক এক জন আর্টের ছাত্রের সমভিব্যাহারে শ্রীমতী ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতে আসেন। উভয়েই বেলুড় মঠে কিছু দিন অবস্থান করেন। অধ্যাপক ওকাকুরা সেই সময়ে Ideals of the East নামক একটা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ( Miss Margaret Noble ) দ্বারা পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছেন যে, "এশিয়া মহাখণ্ডের কৃষ্টি এক। এশিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছে—কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবাসী নিদ্রামগ্ন। এই জন্য এই ভারতকে স্বাধীন করিয়া এই সঙ্ঘের মধ্যে আনিতে হইবে।"

ওকাকুরা ভারতবর্ষে আসিয়া যখন এদেশের সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন, তখন ঠাকুর-বাড়ীর দলে সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও ডেবরিয়ার শশিভূষণ রায় চৌধুরীর যাতায়াত ছিল। ইঁহাদের উপর সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করিয়া আনিবার ভার পড়িল। সভায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সহিত তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আসিলেন। ওকাকুরা ভারতের পরাধীনতা মোচনে সাহিত্যিকগণের নিশ্চেষ্টতাকে গঞ্জনা করেন। এই সময়ে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট লোককে

লইয়া এক মণ্ডলী গঠিত হয়। যত দূর জানা যায়, ইহার মধ্যে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুল্লতাত হেমচন্দ্র মল্লিক, প্রমথনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মতভেদ উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাঁহার আন্দোলনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন। স্বামীজী বলেন, "নিবেদিতা কি রাজনীতি করিয়াছে? বিপ্লবোদ্দেশে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি, আমি কামান প্রস্তুত করিব। এই জন্যই আমি এক দল কর্ম্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।" এই সম্পর্কে সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে স্বামীজী বলেন যে, তিনি দেখিয়া যাইবেন ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনি জীবদ্দশায়ই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর ভুল করিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া আনিবে না।

স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বাংলায় স্বদেশহিতৈষীর ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া রুশ বৈপ্লবিক নেতা পিটার ক্রপটকিনের সহিত পরিচিত হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে সামাজিক অবস্থার কথাও উল্লেখ থাকে। নিবেদিতার বরোদায় বক্তৃতা উপলক্ষ্যে গমন কালে তথায় অরবিন্দ ঘোষের সহিত পরিচয় হয়। তিনিই অরবিন্দকে কলিকাতার দলের কথা বলেন।

নিবেদিতা

অরবিন্দ বিপ্লবী দলের কথা শুনিয়া বারোদা-রাজের দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকে, সরলা দেবীর নামে এক পত্র দিয়া কলিকাতায় এই বিপ্লবী দলের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য প্রেরণ করেন। পরে অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া প্রচার করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে কেবল ভীরু বাঙ্গালী সুপ্ত আছে। অরবিন্দ কলিকাতা

আসার পর পূর্ব্বোক্ত দলটি পূর্ণ বৈপ্লবিক দলরূপে পুনঃ সংগঠিত হয়। এই সংগঠনটি স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কলিকাতার ঠাকুর-বাড়ীতে যে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয় তাহার সভাপতি হন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। সহকারী সভাপতিদ্বয় ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু দাশ)। কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ হন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে দোল-পূর্ণিমার দিন উক্ত গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণ করে। এই সমিতির ব্যায়ামক্ষেত্র ২১ নং মদন মিত্র লেনে এবং ইহারই সন্নিকটে এক ছোট বাড়ীতে কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বিপ্লবাত্মক কর্ম্মধারাকে সংগঠনের পথে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ হইতেই অনুশীলন সমিতির নামকরণ করা হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠনের সময় পি. মিত্র এই সমিতির নামকরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, "আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি 'অনুশীলন সমিতি' তোমরা সেই নামই দাও, তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ হইতে এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি, অনুশীলন শব্দের অর্থ চর্চ্চা। আমরাও চর্চ্চা ও পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিব।"

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি বিষয়ে সতীশচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি আগে নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট) ব্যায়াম করিতাম। এই স্থান হইতে আমি জেনারেল এসেমব্লী কলেজের জিমনাষ্টিক ক্লাবে ভর্ত্তি হই। গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত) এই ক্লাবের মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক ওয়ান-এর কাছে প্রাথমিক ক্লাসে

সমিতির উৎপত্তির ইতিহাস

( First year ) পড়ি। ওয়ান উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। এই ক্লাবের সংযুক্ত 'কাশীনাথ লিটারারী ক্লাব' নামক একটি বিভাগ ছিল। একদা তথায় একজন সেক্রেটারী সভায় বিবরণী লিখিবার জন্য বিলাতি কাগজ আনয়ন করেন ; কিন্তু ওয়ান মহোদয় বলিলেন, 'India-made কাগজ আন, না-হয় আমি এই ক্লাস বন্ধ ক'রে দেব।' তখন আমার মনে পড়িল, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এতদ্বারা মনে ধাক্কা লাগিল—আমরা স্বামীজীর স্বদেশীজিমনাষ্টিক, লাঠিখেলা, বস্তীতে sanitary work প্রভৃতি করার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার পর আমরা স্বামী সারদানন্দের কাছে যাই। তিনি বলিলেন, 'স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, যে কার্য্য করিতেছ তাহা করিবে, তাহা কখনও ছাড়িবে না।" তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন : একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন মুক্তির জন্য ঝটপট করে, তেমনি তোমরাই বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবে না ? Sister Nivedita-র কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবে না। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন।' ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর উপদেশ জান, বস্তীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য করিবে, লাঠি ও মুগুর খেলা করিবে, শরীরচর্চ্চা করিবে।'

"তৎপর, একবার কলিকাতায় সাত দিন বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় প্লেগ হইয়া গিয়াছে। আমরা relief work করিবার জন্য ওয়ানের সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি ড্রেন সাফ করিতে আরম্ভ করান। তৎপর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হইল। স্বামী সারদানন্দ প্রথম সভাপতি হন। তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দ সোসাইটি ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকুক, আখড়া আলাদা থাকুক, তুমি ( সতীশ ) ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রচার কর।' তৎপর ওয়ানের অনুমতি-ক্রমে স্বামীজীর ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত কলেজের আমতলায় Histori-cal Club বসিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু লাঠি খেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ইহার পর মদন মিত্রের লেনে একটি ছোট লাঠি খেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম।

"এই সময়ে আমরা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়কে আখড়ার নামকরণের জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি 'অনুশীলন সমিতি' এই নাম ধার্য্য করেন। এই নামটি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। এই সময় ওয়ান বলেন যে, তোমাদের "ইংরাজ তাড়ান দল" বলিয়া বদনাম উঠিয়াছে।'

"ইত্যবসরে তেঘরিয়ার শশীভূষণ রায় চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে আমাদের লইয়া যান। শশীদা' বলেন, 'এই ছোকরারা আমাকে খুব উৎসাহ দেয়, আমার কুলুপ (তাঁহার স্থাপিত টেকনিক্যাল স্কুলে প্রস্তুত) প্রভৃতি বিক্রয় করেন। আমি শশীদা'কে বলি 'আমাদের সভাপতি বা নেতা নেই।' চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'এই কর্ম্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র।' চৌধুরী, মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন; পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-Chief (পরিচালক) হইলেন। সাত দিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্ব্বপ্রকারের সামরিক শিক্ষা তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের সংযোগ করিতে হইবে।' আমরাও রাজি হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার পর যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সময় দলে আসিলেন অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করিবার জন্য হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া এই সঙ্গে দলকে দান করেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, মদন মিত্র লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকুক, আর বয়স্ক সভ্যেরা যতীনবাবুর নেতৃত্বে আপার সর্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।

"এই সময় অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে মদন মিত্র লেনের আখড়ায় আসিয়া-

ছিলেন। এই কথা আমি মিত্র মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রবণ করি। অরবিন্দ আমাকে মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রেরণ করেন। সেইখানেই আমি তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দীক্ষিত করি এবং তথায় আখড়ায় boxing শিক্ষা প্রদান করি।

"এই সময়ে যে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে 'ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন' করার উল্লেখ ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তৎকালের training department-এর প্রথম দলের কর্ম্মীদের মধ্যে সব অনুশীলন সমিতির লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ইন্দ্র নন্দী (আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য), আমি (সতীশ), বারীন ঘোষ, রবীন্দ্র বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র) দলে ছিলেন। সখারাম বাবু অনুশীলনের Moral class-এ বক্তৃতা দিতেন।

অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ এমন একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন, "যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিবে। মানুষের দেহ ও মন লইয়া মানুষ। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব এবং তাহা অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। অনুশীলন-কল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্যবান, নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, কর্ম্মঠ এবং দীর্ঘায়ু হইবে।

অনুশীলন সমিতির আদর্শ

প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতে হইলে শৈশব হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হইবে এবং ব্যায়াম করিতে হইবে। একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং একজন বাঙ্গালীর মধ্যে দৈহিক পার্থক্যের কারণ—শ্বেতাঙ্গগণ শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে। একজন বাঙ্গালী যদি শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে, স্বাস্থ্যকর স্থানে উত্তম গৃহে বাস করে, তবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সহিত দৈহিক কোন পার্থক্য থাকিবে না। আমাদের দেশের লোকের দৈহিক অবনতির কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার অভাব এবং সংযমের অভাব।"

অনুশীলনের মতে শুধু শারীরিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ চাই। অনুশীলন কল্পিত সমাজে, "প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু হইবে। ইহা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। অনুশীলন-পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর ও দরিদ্র লোক থাকিতে পারিবে না, চরিত্রহীন, ভীরু লোক থাকিতে পারিবে না, দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকিতে পারিবে না, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিতে পারিবে না। ঐরূপ সমাজ তৈয়ার করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে। বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। মানব সমাজ হইতে ধনবৈষম্য, সামাজিকবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকবৈষম্য, প্রাদেশিকবৈষম্য দূর করিয়া মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভব। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন-কল্পিত সমাজ সম্ভবপর নয়, তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।"

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কলিকাতায় অনেকগুলি গুপ্ত সমিতি পরস্পরের সন্ধান না লইয়া আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের বরোদা হইতে আগমনের পূর্ব্বেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আত্মোন্নতি সমিতি নামক বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সেন, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—এই কয় জনে উদ্যোগী হইয়া সমিতির পত্তন করেন। সেই সময় খেলাতচন্দ্র ইনষ্টিটুশানে সমিতির আলোচনা সভা বসিত।

আত্মোন্নতি সমিতি

আত্মোন্নতির অন্যতম সভ্য ইন্দ্রনাথ নন্দী সমিতির উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "তরুণেরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া এই সমিতি করিয়াছিলেন, সমিতির বিশ-ত্রিশ জন সভ্য প্রায় সকলেই ছাত্র ছিলেন। স্কুলের শিক্ষকেরাও আলোচনায় যোগদান করিতেন, তৎপর আমিও আর দুই জন ঐ সমিতিতে যোগদান করি। আমি boxer বলাই চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে

বৈপ্লবিক motive ও method প্রাপ্ত হই। তিনি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ আমাকে দেন। আমি যতীন্দ্রনাথ হালদারের কাছ হইতে একটি সমিতির সংবাদ পাই। তিনি বলেন, বৰ্দ্ধমান ও শান্তিপুরে একটি দল আছে, তাহার সংস্পর্শে ইন্দ্রবাবু আসেন। এই শান্তিপুরের দলের ভূপতি গোস্বামী ঐ আত্মোন্নতি সমিতির সংবাদ আমায় দেন। তৎপর যতীন্দ্রনাথ হালদার, শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, আমি এই তিন জন আত্মোন্নতি সমিতিতে যোগদান করিলাম।

"এই সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফিরিঙ্গিদের সহিত সমিতির ছেলেদের প্রায়ই মারামারি হইত। এই সময় ফিরিঙ্গিদের Over-bearing attitude আমরা বড়ই অনুভব করিতাম। ইহাতে আমরা পরাধীনতার অপমান হৃদয়ে অনুভব করিতে থাকি। এই কালে হেমচন্দ্র মল্লিক মারামারির সময়ে তাঁহার বাড়ী আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিতে দেন। তিনি এক দল ছেলেকে উপযুক্ত নাগরিক আদর্শে গঠিত করিতে চাহিতেন। তিনি চাহিতেন যে, এক দল ছেলে civic duty, সাহস প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট হইয়া গঠিত হয়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সমিতির অফিসের উল্টা দিকে মাণিক দত্তের বাড়ীতে 'অনুশীলন সমিতি'র সভ্যেরা জমা হইতেন। এই সম্বন্ধে আমার তাঁহাদের সহিত আলাপ হয়। তাঁহাদের নামটা আমায় আকৃষ্ট করে।

"এই সময়ে হেমবাবু যখন উপরোক্ত প্রকারের দল সৃষ্টি করিতে চান তখন আমি তাঁহাকে অনুশীলনের কথা বলি। ইহাতে তিনি ছয় শত যুবককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজন প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ীতে হয়। সেই সময় অনুশীলনের একটা সমাবেশ হেমবাবুর বাড়ীতে হয় এবং অনুশীলন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে হেমবাবু অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষক সাহায্য-দাতা হন।

"তৎপর নিখিল মৌলিকের ( ভবানন্দ স্বামী ) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। শুনিয়াছিলাম, ইনি, পরেশ লাহিড়ী ( মহাদেবানন্দ স্বামী ) এবং আচার্য্য

ক্ষিতিমোহন সেন একটি বৃহৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলের নিখিলদা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে নামি এবং ছাত্রভাণ্ডার স্থাপন করি।

"ইহার পূর্ব্বে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক সমিতির সংবাদ পাই। যখন বৈপ্লবিক সমিতির আখড়া এবং কর্ম্মীদের বাসস্থান আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ছিল, তখন রঘুনাথ আমাকে লইয়া যান। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির রঘুনাথ, আমি ও জীবন মুখোপাধ্যায় প্রথমে বৈপ্লবিক সমিতিতে যাই। পরে ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি সমিতির সর্ব্ব সভ্যই বৈপ্লবিক সমিতিতে যাইতে থাকেন। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির সহিত বৈপ্লবিক সমিতির যোগাযোগ হয়। এতৎসম্বন্ধে কোন বুঝাপড়া ছিল না। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত লোক দেখিলেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এই উপায়ে আমরা বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হই। বাস্তব পক্ষে 'আত্মোন্নতি সমিতি' বৈপ্লবিক সমিতিতে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়াছিল অথচ আত্মোন্নতি সমিতি বাহিরে নিজের অস্তিত্বও রাখিয়াছিল। জীবন, রঘুনাথ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞাপত্রে Oath লইয়াছিলেন। বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দেব, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন junior সভ্য ছিলেন। প্রভাসকে আমিই আত্মোন্নতিতে প্রবেশ করাই। পবিত্র দত্ত, মণি মিত্র প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা যতীনবাবুর কাছে যান। পবিত্র বৈপ্লবিক দলে পরে প্রবেশ করিয়াছিল।

"ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক জগদীশ বসু, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বুদ্ধগয়ায় যান। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাই। এই সময়ে আমার সহিত পাটনার পুনিতলালের আলাপ হয়। তিনি বলেন, 'তাঁহাদের যৌবনে তাঁহারা বিহারে একটি বৈপ্লবিক দল গঠন করিয়াছিলেন।' পুনিতলাল লাহিড়ী কোম্পানীর পাটনাস্থ এজেন্ট ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার সহিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আলাপ আমিই করাইয়া দিই। এই সময় আমরা ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বদেশী ভাব প্রচার করিতেছিলাম। বুদ্ধগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর 'ছাত্রভাণ্ডার' স্থাপিত হয়। ছাত্রভাণ্ডার বৈপ্লবিক

কর্ম্মীদের একটা আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আমার অনুরোধে নিখিলবাবু, হরিশ শিকদার মিলিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাহার Head collector ছিলেন। এই অর্থ আমরা কর্ম্মীদের ব্যয়ের জন্য দিতাম। ছাত্রভাণ্ডার বর্ত্তমানের Seal's Mansion কলেজ ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। তৎপর তাহার উল্টাদিকে J. K. Sharma-র দোকানের পার্শ্বে স্থান পরিবর্ত্তন করে। তৎপর হ্যারিসন রোডের দুই স্থানে উঠিয়া যায়। পবিত্র ও নিখিলবাবু ইহার ভার নেন। ছাত্রভাণ্ডারের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন পবিত্র দত্ত। এই ভাণ্ডারের আচরণে বৈপ্লবিক কর্ম্ম ছিল। ছাত্রভাণ্ডারের ছাতের উপর সখারাম গণেশ দেউস্কর ক্লাশ করিতেন। আলীপুর বোমার মামলার পর পবিত্র দত্তকে পুলিশ Howrah gang case-এ গ্রেপ্তার করে; এবং বলে যে, ছাত্রভাণ্ডারের যে ম্যানেজার হইবে তাহাকেই পুলিশে ধরিবে। সেই শুনিয়া রঘুনাথ ও আমি যে পরিমাণে টাকা দিয়াছিলাম তজ্জন্য সেই পরিমাণের মাল লুকাইয়া সরাইয়া ফেলিলাম। এই প্রকারে ছাত্রভাণ্ডার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গুজব উঠিল, 'পুলিশ দোকান লুটাইয়াছে।'

ছাত্রভাণ্ডার

"এই সময় কালীঘাটে একটি উগ্র বৈপ্লবিক দল উদ্ভূত হয়। ইঁহারা সকলেই বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন হরিদাস হালদার। ইহার আত্মীয় গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কাব্যতীর্থ) কালীমন্দিরের এক জন পুরোহিত। এই পণ্ডিত মহাশয় একটি 'স্বদেশী রামায়ণ' রচনা করেন। এই পুস্তকের কতকগুলি গান পরে "স্বদেশী সঙ্গীত" বলিয়া বাজারে প্রচার করা হয়; যথা: "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখ রেখ মনে এই ধ্রুব জ্ঞান," "একবার ফিরে এস ফিরে এস গো" ইত্যাদি, এই স্বদেশী রামায়ণ কথকতা দ্বারা প্রচার করা হইত। এই কথকতা বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। এই রামায়ণ-কথকতা হইতে প্রমাণ হয় যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বারীন্দ্র দ্বিতীয় বার বাংলায় আসিবার পূর্ব্বেই অস্ত্র সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়ন চেষ্টা অনুশীলন-সমিতির সদস্যগণের সঙ্কল্প ছিল। গানগুলি হইতে অনুশীলনের ভাবধারা কিছুটা বুঝা যাইবে।"

কালীঘাটের দল

"সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ও মা
আন্‌লে কোথা হতে বিকট পশু দেখে ভয় পাই ও মা
পশুর রাজা সিংহ বটে তাই চরণ দিয়ে দিলি পিঠে
সে যে মহাশক্তির চরণ পেয়ে তাইতে ল্যাজ ফোলায় ও মা
দে মা অস্ত্র দয়া ক'রে বেটাকে তাড়াই দূরে
ও তোর অশান্ত বলে আর নাহি ভয় মা
শক্তিপূজা কর্ত্তে দেখে বেটা কটমটিয়ে থাকে
সে তো নাহি মনে ভাবে আমরা তোর তনয় মা।"

"স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে অতি মহাপাপ হোক না কেন
তবুও সেই জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাঁহারি জেন।
দেশহিত ব্রত এ পরশমণি পরশিবে যারে যখন
রাজভয় আর কারাভয় ঘুচিবে তাহার তখনি জেন
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় খণ্ডে তার যায় গোলোকে যায় সেই জন।"

এই সময় জেলা-জজ বরদাচরণ মিত্র প্রণীত সঙ্গীত বিপ্লবী তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

* * *

"শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নম্র শির।
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত মোরা ভক্ত বীর।
আবাহন মার যুদ্ধ ঝরণে
তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে

পশুবল আর অসুর নিধনে
মায়ের খড়্গা ব্যগ্র ধীর
মায়ের অরাতি নাশন
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছাপূরণ
শত্রু রক্তে মায়ের তর্পণ
জবার বদলে ছিন্ন শির—”

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সরলা দেবী ‘ভারতী’ পত্রিকার মারফৎ ‘বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইউরোপীয়দিগের সহিত ভারতীয়গণ সাহস করিয়া যে সমস্ত মারামারি করিতে আরম্ভ করিয়া শ্বেতজাতির ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী সমাজ হইতে পরাজিত মনোবৃত্তি দূর করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। বীরাষ্টমী মেলা, প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রভৃতির মারফৎ ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধন প্রচেষ্টাও তিনি আরম্ভ করেন। তাঁহার সহযোগিতায় প্রমথ মিত্র বিপ্লবী দল গড়িয়া তুলিবার আয়োজনে যখন রত ছিলেন, সেই সময় বরোদা হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হন।

সরলা দেবী

সরলা দেবীর পিতা জানকী নাথ ঘোষাল মহাশয় কংগ্রেসের এক জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু জাতীয় সম্পত্তির ব্যবহার ঠিক নিয়মিত ভাবে তিনি করেন না, এরূপ একটি অপবাদ তাঁহার ছিল। সেই কারণে সরলা দেবীকেও দলের কেহ কেহ অপছন্দ করিতে থাকেন।

বীরাষ্টমী উপলক্ষ্যে সরলা দেবী যে সমস্ত শক্তিচর্চ্চার প্রদর্শনী করিতেন সেই শক্তিচর্চ্চা প্রসারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর নিবাসী লাঠি ও তলোয়ার চালনায় সুদক্ষ তুরস্কদেশীয় ওস্তাদ প্রফেসর মার্ত্তাজাকে বহু ক্লাবের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অনুশীলনেও ইনি শিক্ষকতার কাজ করেন। বড় লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন উলুবেড়িয়ার অতুল ঘোষ। প্রফেসার মার্ত্তাজাকে লইয়া সরলা দেবী একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন।

বাংলায় যে ভাবে বিপ্লবাত্মক ভাবধারা ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বোম্বাই অঞ্চলেও প্রায় ঠিক অনুরূপ বিপ্লবের প্রচেষ্টা দানা বাঁধিয়া উঠে।

বোম্বাইয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টা

পৃথিবীতে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাব বিকাশ লাভ করিতে বহু বার দেখা গিয়াছে। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা একে অন্যের নিরপেক্ষ ভাবেই জমিয়া উঠে। এবং বিংশ শতাব্দীতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, চারুচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির প্রযত্নে এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। বাংলা দেশেও যেমন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক মনোভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে। বোম্বাই অঞ্চলে বিশেষতঃ পুণা শহরেও এই সময় হইতেই বিপ্লবাত্মক মনোভাবের বিকাশ দেখা যায়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাণাডের প্রেরণায় পুণায় সার্ব্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্করের যুগান্তকারী পুস্তক "নিবন্ধমালা" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলিতে বিষ্ণু শাস্ত্রী দেশবাসীকে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বজাতি, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ঐতিহ্যকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে উদ্বোধিত করেন। এই সব আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্র দেশে এবং বিশেষ করিয়া এই দেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তাহার ফলেই মহারাষ্ট্র দেশে স্বাধীনতার অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে।

এই অগ্নিশিখা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে মহারাষ্ট্র বীর যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিদ্রোহাত্মক কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া। ফাড়কে দেশকে স্বাধীন

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে

করিবার জন্য মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অনুসরণে পার্ব্বত্য জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরাজগণ ইহাকে লুঠতরাজ ও অরাজকতার প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়া ফাড়কের সাধনাকে খর্ব্ব করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ফাড়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তিনি যে দীপ জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতেই আগুন

ছড়াইয়া পুণা প্রভৃতি অঞ্চলে চাপেকার সঙ্ঘ, সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত অভিনব ভারত সমিতি, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্ম গুপ্ত আন্দোলন প্রভৃতি অগ্নিমন্ত্রের সাধনাত্মক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। প্রায় দুই বৎসর এক স্থান হইতে অপর স্থানে পলাইয়া যুদ্ধ চালাইয়া ফাড়কে হীনবল হইতে থাকেন। তাহার পর ফাড়কের বিদ্রোহ অতি সহজেই দমিত হয় এবং তিনি ধরা পড়িয়া এডেনে নির্ব্বাসিত হন। সেখান হইতে পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ব্যর্থ হন এবং নির্ব্বাসন ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফাড়কের বিদ্রোহের সহিত সহানুভূতি পুণার ব্রাহ্মণ নেতাদের বিশেষ করিয়া রাণাডে ও চিপলুঙ্করের ছিল মনে করিয়া ইংরাজ সরকার ইহাদের উপর বিরূপ হন ও রাণাডেকে নাসিক হইতে ধুলিয়াতে বদলী করা হয়।

ফাড়কের বিদ্রোহের পর কোনওরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহ কয়েক বৎসর দেখা দেয় নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরাজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে বাংলা দেশে যেমন 'হিন্দু মেলা' জাতীয় মন্ত্রপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চ্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়াইয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছিল, মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও তেমনিই সার্ব্বজনিক গণপতি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াও সেইরূপ কাজ হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সার্ব্বজনিক গণপতি উৎসব প্রচলিত হয়। এই মেলার স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অসিচালনাও শিক্ষা দেওয়া হইত। উৎসব দশ দিন ধরিয়া চলিত এবং রাস্তায় রাস্তায় যুবক দল ইংরাজ-বিরোধী সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শিবাজী মহারাজের মুকুট ধারণ দিবসের স্মারক হিসাবে প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত উৎসবের প্রাণ ছিলেন দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ হরি চাপেকার। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবন্ধকনাশক সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া তরুণ দলকে ইঁহারা গোপনে সামরিক কৌশল শিখাইতে থাকেন। ইঁহাদের গুপ্ত সমিতি পরে চাপেকার সঙ্ঘ নামে পরিচিত হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহা রোধ করিবার জন্ম সরকার পক্ষ হইতে যে সমস্ত ব্যবস্থা হয় তাহার কতকগুলি বিধান অকারণে

প্রজা-পীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাবিয়া জনসাধারণের মনে দারুণ অসন্তোষ জাগে। প্লেগ-কমিশনার মিষ্টার র‍্যাণ্ডকেই ইহার জন্ম দায়ী করিয়া তাঁহার আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া ৪ঠা মে তারিখে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় এক তীব্র সমালোচনা করেন।

চাপেকার সঙ্ঘ

চাপেকার সঙ্ঘ র‍্যাণ্ডের অত্যাচার নিবারণ করিতে বদ্ধ পরিকর হন। ২২শে জুন তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবের পর পুণার গণেশখণ্ডে অবস্থিত লাট-ভবন হইতে যখন মিঃ র‍্যাণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় দামোদর ও বালকৃষ্ণ তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে হত্যা করে। হত্যাকারীদের সন্ধানপ্রদানকারীকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করাতে হত্যাকাণ্ডের সহিত চাপেকারদিগের সংস্রবের সংবাদ দিয়া যাঁহারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাপেকার সঙ্ঘের সদস্যগণ হত্যা করেন। র‍্যাণ্ড হত্যার দায়ে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয় এবং পুণার বিখ্যাত নাটু ও তাঁহার ভ্রাতাকে বাংলার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হয়। চাপেকারদিগের সম্বন্ধে সংবাদদাতার হত্যাপরাধে চাপেকার সঙ্ঘের চারিজন সদস্যের ফাঁসী হয়। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম জীবন উৎসর্গ করেন দামোদর ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ এবং তাহার পর তাঁহাদের সঙ্ঘের এই চারি জন সদস্য।

চাপেকার সঙ্ঘের সহিত অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোগ ঘটে এবং বিষ্ণু ভাস্কর লেলেও এই দলের সমর্থক ছিলেন। চাপেকার সঙ্ঘের কার্য্যধারা বাংলায় বিস্তার করিতে আসিয়া যতীন্দ্র ও বারীন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। সেই সময় যতীন্দ্রনাথ প্রমথ মিত্রের সহায়তায় "অনুশীলন সমিতি" গড়িয়া তুলেন।

অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর ভগিনী নিবেদিতা বাংলার এই বিপ্লব-কেন্দ্রটিতে তাঁহার লাইব্রেরীর জাতীয়তা-বিষয়ক প্রায় দুই শত পুস্তক দান করেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ

রিপাবলিক, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনীর জীবনী, সিপাহী যুদ্ধের ও আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, টডের রাজস্থান, উইলিয়াম ডিগবীর ব্রিটিশ অর্থনীতির বই, ভারত, ইউরোপ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, War Made Impossible নামক একখানি আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসমূলক বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ সম্বলিত বই, ব্যারণ ওকাকুরার বই।

ভগিনী নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরীই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎস-মূল। নিবেদিতার সহিত যতীন্দ্রনাথের কথা ছিল, এই পুস্তকসমূহ অবলম্বনে রাজনীতি শিক্ষা দিবার ও কর্ম্মী গড়িবার বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেই স্কুলে বা study circle-এ বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতির উত্থান-পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচারকরূপে ভারতের নব জাগরণের চারণরূপে নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া সমগ্র দেশে অসংখ্য বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপন করিবে।

সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলে বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি ছিলেন প্রথম ছাত্রদল। বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে এই বিপ্লবকেন্দ্রটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পরম ভক্ত এই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন পূর্ব্বে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক, আমাদের ছাত্রজীবনের মন্ত্রগুরু। এঁর নেতৃত্বে সেই তরুণ বয়সে

সার্কুলার রোডের কেন্দ্র

আমরা দেওঘরে দাড়োয়া নদীর ধারে শিখতাম লাঠিখেলা, নন্দন পাহাড়ে দুই দলে মোগল ও মাওয়ালী সেনায় বিভক্ত হ'য়ে করতাম যুদ্ধের অভিনয়। দেওঘরের অত্যাচারী সাব ডিভিশন্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে 'হিতবাদী' কাগজে পত্রপ্রেরকের পত্র প্রকাশ করার সন্দেহে সখারাম বাবুর স্কুলের চাকুরী যায়। পরে তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক বিভাগে উচ্চতর বেতনে কাজ পেয়েছিলেন, এস্. ডি. ওর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর পক্ষে শাপে বর। স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর

এমন একটি দল দেশে গজিয়ে উঠেছে—এই সুসংবাদ আমার মুখে শুনে শিবাজী-ভক্ত তেজস্বী এই মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর! তিনি তখনই এসে যতীনদা'র সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে গেলেন এবং এই স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।"

সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে পলিটিক্যাল মিশনারী গঠনের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয় ইতিহাস পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন—বিশেষ করিয়া সিপাহী যুদ্ধের, শিখ অভ্যুত্থানের ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। সখারাম গণেশ দেউস্কর ব্রিটিশ-ভারতে আর্থিক শোষণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। উইলিয়াম ডিগবীর 'Prosperous British India' পুস্তককে ভিত্তি করিয়া তিনি 'দেশের কথা' রচনা করেন। পরে 'রণনীতি,' 'মুক্তি কোন পথে' প্রভৃতি পুস্তকের সঙ্গে এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হয়।

যতীন্দ্রনাথ পড়াইতেন রণনীতি এবং ছাত্রদের নিকট অগ্নিদীপ্ত ভাষায় ভাবী বিপ্লবের কথা বলিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত—ইটালীর জাগরণের কাহিনী, মার্কিণের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক পড়াইতেন।

বারীন্দ্রকুমার তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "বিপ্লবী ভাব প্রচার করার জন্য আমি প্রচারকরূপে প্রথম বের হই বর্দ্ধমানে। সেখানে তখন আমার ঢাকা কলেজের লজিকের তরুণ প্রফেসার বদলী হ'য়ে এসেছেন; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আমরা একটি গুপ্ত সমিতির উপশাখা গ'ড়ে তুললাম। শ্রীঅরবিন্দ সহ আমার দ্বিতীয় অভিযান মেদিনীপুরে। আমার দুই মামা যোগেন্দ্র বসু ও সত্যেন বসু ইতিমধ্যেই সেখানে তরুণ দলকে দিয়ে একটি গুপ্তচক্র গ'ড়ে ফেলেছেন; এইখানে প্রথম পরিচিত হলাম সত্যেন বসু, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি বহু প্রৌঢ় ও তরুণ কর্ম্মীর সঙ্গে। মেদিনীপুরের 'আনন্দমঠ' ছিল একটি একতলা ছোট এঁদোপড়া শ্রীহীন বাড়ীতে। দেখলাম, ছেঁড়া মাদুরের উপর ছেলেরা শোয়; তারই পাশে একটি তিন হাত উঁচু ধূলামাখা মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা অযত্ন-প্রদত্ত গুটিকয়েক আধ-শুকনো জবার নৈবেদ্য সামনে ক'রে

রক্তজিহ্বা বের ক'রে ক্ষেপাটে কর্ম্মীগুলির আদর্শেই যেন খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে রাঙতার খাঁড়া, পদতলে নিদ্রিত অসাড় হতচৈতন্য শিব ঠাকুরটি। এই মৃন্ময়ীকে কেন্দ্র ক'রে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে লাখ টাকার সপ্ন দেখার মত ইংরাজের সাম্রাজ্য উল্টে ফেলার শুভ কাজ চলেছে।

"নিরাপদ রায় ছিল খর্ব্বকায়, গৌরকান্তি শান্ত মৌনপ্রায় মানুষটি; সে ছিল শান্তিপুরের ছেলে, তার কটা চোখে ও নির্ব্বাক্ ওষ্ঠে হাসি থাকতো লেগে। একটা ময়লা ধুতি ও চাদর গায়ে খালি পায়ে সে দরকার হ'লে দশ-বিশ ক্রোশ পথ অক্লেশে যেত হেঁটে, যখন আর কোন অসাধ্য সাধনের কাজ না পেতো খুঁজে—তখন গম্ভীর মৌনতা ভরে হুঁকাটি হাতে বসেই থাকতো অসীম ধৈর্য্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—চোখে তার গোপন কৌতুকের হাসিটুকু নিয়ে।

"সত্যেন বসু ছিল শীর্ণকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলে দুরন্ত হাঁপানী রোগে রুগ্ন, মুখে বুদ্ধির সতেজ দীপ্তি, রোগা শরীরে অফুরন্ত কর্ম্মচাঞ্চল্য; এই ছোট্ট দলের দলপতি হ'য়ে চরকীর পাকের মত সে ছেলের পর ছেলের মাথায় বিপ্লবী আইডিয়ার ঘুন ধরিয়ে ঘুরে বেড়াত। অদূর ভবিষ্যতে এই সত্যেন বসুই আলিপুর বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে কানাই দত্তের সাহায্যে হত্যা ক'রেছিল!

"এই যাত্রা মেদিনীপুরে শ্রীঅরবিন্দ হেমচন্দ্রকে স্বহস্তে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র কানুনগো বয়সে প্রৌঢ় হ'য়েও এই দলেরই এক জন ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে পাউণ্ড ইনস্পেক্টর—গরু ছাগলের খোঁয়াড়গুলির তত্ত্বাবধায়ক অফিসার। হাসি, রঙ্গরস, সরস রসিকতা তাঁর ছিল স্বভাবজাত, মুখে থাকত অমায়িক হাসিটি লেগেই। এমন মিশুক সদাপ্রসন্ন মজলিসী মানুষ খুব কম দেখা যায়। অভিনয়ে দক্ষ সুগায়ক, উত্তম শিকারী ও সাইক্লিষ্ট, পাশ্চাত্ত্য চিত্রাঙ্কনে ও ফটোগ্রাফিতে অতি উচ্চ অঙ্গের আর্টিষ্ট, খুঁটিনাটি মেশিন মেরামতিতে নিপুণ, রসায়ন-বিদ্যায়ও পারদর্শী—এই সব কর্ম্মেতে হেমদা'র গুণের আর অবধি ছিল না।

"এই দলেরই অন্তর্গত ছিল ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম তখন নিতান্ত লাজুক, স্বল্পভাষী রোগা ছেলেটি, আমাদের সামনে সঙ্কোচে এগোতো না। আমার

মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মেদিনীপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি অবসর নিয়ে দেওঘরে বাস করার পর তাঁর ভাই দুর্গানারায়ণ বসু হন এই হেডমাষ্টারীতে বাহাল। জ্ঞান বসু ও সত্যেন বসু তাঁরই ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র, কর্ণেলগোলাতে তাঁর বসতবাটি এখনও আছে। এই বাড়ীর কাছেই একতলা বাড়ী—মেদিনীপুরের মা—কালীমার্কা আনন্দমঠ।

"আমার অস্পষ্ট মনে আছে, সখারামবাবুকে নিয়ে ছেলেধরার কাজে যাত্রার কথা এবং চাঁদের আলো-করা গঙ্গাতীরে বাঁধানো ঘাটের উপর এক দল তরুণকে নিয়ে আমাদের সেই প্রাণ মাতানো আলোচনা। সেটি বোধ হয় খড়-দহের গঙ্গাতীরের ঘটনা।

"তাছাড়া কলিকাতার পার্কে পার্কে সন্ধ্যা ও সকালে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করতাম, তার আকর্ষণে ছেলেরা এসে পরিচিত হ'য়ে পড়তো এবং ধরা দিতো। হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি পার্কগুলি আমাদের ছেলে-ধরার ফাঁদ ছিল। এখানে কবিরাজ সি. কে সেনদের চন্দরদা' নিত্য বসে ছেলে ক্ষেপাতেন।"

কিন্তু শীঘ্রই সার্কুলার রোডের বিপ্লব-কেন্দ্রে ফাটল ধরিল, এবং দলাদলি দেখা দিল। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপবাদ দিয়া তাঁহাকে এই বিপ্লব-কেন্দ্র হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করা হয়। উক্ত বিপ্লবী আড্ডা তুলিয়া মদন মিত্র লেনের এক বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাড়ীতে ২।৩ মাস থাকা হয়। ঐ সময় সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মীর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ও অবিনাশ। একটি চাকরের জন্য ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্যে তখন গুটিকয়েক রিভলভার সংগ্রহ করা হইয়াছে। এক দিন একটি রিভলভার ঘরে টেবিলের উপর রাখা ছিল, চাকরটি সেই রিভলভারটি হাতে লইয়া সামনের বাড়ীর দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করে। গুলী লাগিয়া দেওয়ালের কিছু প্লাষ্টার খসিয়া পড়ে, চাকরটির চাল-চলন সন্দেহজনক মনে করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। বাড়ীটিও গুলী চলার গণ্ডগোলে ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হয়।

সেই সময় বিপ্লব-কেন্দ্রের অন্যতম কর্ম্মী নলিন মিত্রের বাড়ী ছিল ১৭০ নং আপার সার্কুলার রোডে। নলিন এই বাড়ীর নিকটে একটি দোতলা ছোট বাড়ী কেন্দ্রের জন্য ভাড়া করে। এই সময় সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে পূর্ণ রক্ষিত বিপ্লব কেন্দ্রে যোগদান করে।

যতীন্দ্রনাথ সার্কুলার রোডের বাসা ছাড়িয়া দিয়া সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে এক মেসে আশ্রয় নেন। তিনি গুজরাট-কেন্দ্রের সভাপতি অরবিন্দকে পত্র লিখিয়া বংলার এই বিপ্লব-কেন্দ্রের গৃহ-কলহ মীমাংসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। যতীন্দ্রনাথের আহ্বানে অরবিন্দ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পূজাবকাশের সময় আসেন এবং দলাদলির অবসান ঘটান। বারীন্দ্র ও অবিনাশ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় চলিয়া আসেন এবং পূর্ব্বের আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হয়। নবোৎসাহে আবার দুই দল একত্রিত হইয়া কাজ করার সঙ্কল্প হয়, কিন্তু এই সদিচ্ছা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অল্প দিনের মধ্যেই আবার ভাঙ্গন ধরিল।

পি. মিত্রের নির্দ্দেশে সতীশ বসু পশ্চিমবঙ্গের এবং পুলিন দাস পূর্ব্ববঙ্গের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "আমরা সার্কুলার রোডের দল রইলাম আলগোছে পৃথক্ কর্ম্মধারা নিয়ে।"

ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রমথনাথ মিত্রকে ঢাকায় লইয়া আসেন।

অনুশীলন সমিতি ঢাকা কেন্দ্র

এক ঘরোয়া বৈঠকে কতিপয় উকিল, যুবক ও ছাত্রদের নিকট প্রমথ মিত্র বলেন যে "স্বদেশী, বিলাতি বর্জ্জন এ সবে কিছুই হবে না; ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও।" উকিলের দল 'সম্ভবপর নয়' বলাতে প্রমথ বাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন যে—"The sword has been drawn, it must be thurst in their breast of our enemies or in our own breast."

এই কথায় অনেকেই ভীত হইয়া আলোচনা-সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল মাত্র কয়েকটি যুবক ও ছাত্র প্রমথ বাবুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই রাত্রেই প্রমথ বাবু সুহৃৎ-সমিতির আহ্বানে ময়মনসিংহে চলিয়া গেলেন।

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় তিনি ফিরিয়া আসিলে, কয়েক জন যুবক গোপনে তাঁহার সহিত আলাপ করে। ঢাকায় যুবক দল ব্যতীত প্রমথ বাবুর আত্মীয় কলিকাতার ছাত্র তারক নাথ দাস (ইউরোপে বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত) এবং সুহৃৎ-সমিতির সদস্য ও প্রসিদ্ধ স্বদেশী সঙ্গীত-গায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও এই গুপ্ত মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় স্থির হইল —ঢাকায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। যুবক দলের মতানুসারে গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন উকিল আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক) ও ডাক্তার নিশি চৌধুরীর প্রস্তাবে সমিতির পবিচালক নিযুক্ত হইলেন পুলিনবিহারী দাস। পুলিন বাবু বাল্যকালে বরিশালে গৃহশিক্ষক তারাপ্রসন্ন বসুর নিকট ভারতে গুপ্তভাবে সন্ন্যাসী দলের বিপ্লব প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও রচিত কাহিনী শুনিয়া প্রথম বিপ্লব-মন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পর 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় মণিপুর যুদ্ধের বিবরণ পাঠে ইংরেজের ছলনা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে পুলিন বাবুর মনে বিদ্রোহের ভাব আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। তখন হইতেই ইংরেজকে ভারত হইতে তাড়াইবার বাসনা তাঁহার মনে জাগ্রত হয়।

তারকনাথ দাস, পুলিন দাসকে সঙ্গে লইয়া রংপুরে গুপ্ত সমিতি পরিদর্শনে গেলেন। তাহার পর তারকনাথ দাসের নির্দ্দেশক্রমে পুলিন বাবু ৪৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অনুশীলন সমিতিতে আসিয়া তথাকার পরিচালক সতীশ বাবুর অতিথি হইয়া কলিকাতায় কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই সময়ে কলিকাতার ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত জমিয়া উঠে ও কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। ঢাকায় অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত সদস্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলিয়া এক নির্দ্দেশ দিয়া, প্রমথ মিত্র পুলিন দাসকে ঢাকায় প্রেরণ করেন।

পুলিন দাস ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিপ্লবীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েক জন রাজপুত মিস্ত্রী সাহেবদের বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি মেরামত করিত। কয়েকটি যুবককে এই সকল মিস্ত্রীর

নিকট হইতে বিভিন্নরূপ অস্ত্র মেরামত ও অংশ সংযোজন প্রক্রিয়া শিখাইয়া লওয়া হইল। ঢাকার গেণ্ডারিয়া খালের নিকট যে সরকারী দুর্গ ছিল, সেখানকার দুই-এক জন সিপাহীকে বশ করিয়া তাহাদের সাহায্যে চুরি করা দুই-চারিটি বন্দুক কিনিয়া প্রথম অস্ত্রশালা হয়। মিস্ত্রীদের নিকট হইতে সন্ধান লইয়া নবাব-বাড়ীর দুঃস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অস্ত্র-শস্ত্র এমন কি রিভলবার পর্য্যন্ত ক্রয় করা হয়। কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া চীনা ও বাঙ্গালী নাবিকদের সাহায্যে গুপ্তভাবে রিভলবার আমদানী-কারকদের নিকট হইতেও কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করা হইল।

পুলিন দাসের প্রধান সহায় হইল ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ ও আশুতোষ দাশগুপ্ত। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আশুতোষ দাশগু ছিলেন এই সমিতির মস্তিষ্ক। কর্ণেল নন্দীর পুত্র ইন্দ্রনাথ নন্দী দমদমের সিপাহিগণের সহায়তায় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিত; তাহার নিকট হইতেও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্যগণ কিছু অস্ত্র ক্রয় করে। ঢাকা সমিতির সদস্যবর্গকে রীতিমত যুদ্ধের কায়দা শিক্ষা দিয়া নকল যুদ্ধের অভিনয়ও চলিতে লাগিল। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বন্দুকচালনা শিক্ষা, ড্রিল ও কৃত্রিম যুদ্ধের আকর্ষণে অনুশীলন সমিতির প্রভাব খুব শীঘ্রই হইল।

পুলিন দাসের অসাধারণ সংগঠন-শক্তির বলে ঢাকার কেন্দ্রই সমগ্র বাংলা বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলায় বিস্তার লাভ করে। অনুশীলন সমিতির উপর দিয়া নানা আঘাত-প্রত্যাঘাত সত্ত্বেও ভারত ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পুলিনবাবু ঢাকাতে থাকিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে অসি ও ছোরাখেলা এবং দেশীয় পাইকদের নিকট হইতে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। পুলিনবাবু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য দেশে ক্ষাত্রশক্তি জাগাইতে প্রয়াসী হইলেন এবং সমিতির মধ্যে অসিখেলা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রভৃতি প্রচলন করিলেন।

সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় একটি বোর্ডিং স্থাপিত হয়। সেই বোর্ডিং-এ

প্রায় দুই শত ছাত্র থাকিত। তাহারা সকলেই বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। এই যুবকদের ব্যয়ভার সমিতি হইতেই নির্ব্বাহ হইত। তাহারা সেখানে থাকিয়া লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শিক্ষা করিত এবং শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে গিয়া তাহার শাখা স্থাপন করিয়া সেখানকার নূতন সভ্যদের ঐ সমস্ত খেলা শিখাইত। এইভাবে অনুশীলন সমিতির শাখা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়ে অসিখেলা ও ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোন স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইলে সমিতির সভ্যগণ বীরত্বের সহিত তাহার সম্মুখীন হইত। ফলে, সমিতির উপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতে থাকে।

প্রতি বৎসর সমিতির কৃত্রিম যুদ্ধ হইত এবং সময়-সময় খেলারও প্রতি-যোগিতা হইত। এই কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। শহরের বহু লোক, এমন কি জেলার হাকিম, পুলিশ সাহেবেরাও উহা দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখিতে যাইতেন, তাহা বলা কঠিন। কৃত্রিম যুদ্ধে উভয় পক্ষে সমিতির পাঁচ-সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইত। যে দল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের ঐ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহু লোক এই যুদ্ধে আহত হইত। এ জন্য পূর্ব্ব হইতেই হাসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত, প্রত্যেক লাঠির মধ্যে রং মাখান থাকিত এবং কাহারও কাপড় জামায় ঐ রং লাগিলে সে আহত বলিয়া গণ্য হইত ও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিত না এবং অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইত।

সামরিক শিক্ষা

এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "এই কৃত্রিম যুদ্ধে আমি আহত হইয়াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের লাঠির আঘাতে আমার জামায় রং-এর দাগ লাগিয়াছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি মারামারি করিয়া যাইতেছি—এমন সময় একজন পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে বসাইয়া দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়া আমাদের দলের উপর সঙ্গীন চালনা করিল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পরিদর্শকটি চলিয়া গিয়াছে তখন একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ দলটিকে বাধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—আমরাও পাল্টা জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আসিয়া আমার কপালে পড়িল। তাহা ফিরাইতে না পারায় আমার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং একখানা গাড়িতে করিয়া হাসপাতালে রাখিয়া আসিল। সেই রাত্রেই হাসপাতালে থাকিয়া খবর পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় হইয়াছে।"

"নেতা হওয়া তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী—ফাঁসী, দ্বীপান্তর, গুলীর আঘাতে মৃত্যু। অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়তো সেখানে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথমে তাহাকে একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টি-ভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে। যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সে-ই ধীরে ধীরে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে। দলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়াছে। তখন কোন 'ইলেক্‌সন' ছিল না, তখন ছিল যোগ্যতা।"

নেতৃত্বের আদর্শ

সমিতির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই অর্থের অভাব কোন দিনই হয় নাই—নানা ভাবে অর্থ সমস্যার সমাধান হইত। মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া যে চাউল জমা হইত তাহা বিক্রয় করিয়া সমিতির তহবিলে জমা পড়িত। কিছু দিন পর আয়ের আর একটি পথ আবিষ্কৃত হইল। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাটিরপাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমিতির সভ্যদের ডাকিয়া বলেন—"শ্রাদ্ধের বৃষ ও বৎসতরী শাস্ত্রানুসারে অস্বামিক, বর্ত্তমানে গোয়ালারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা লইয়া যায়, তোমরা দেশের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পার।" ইহার পর যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানে গিয়া বৃষ ও বৎসতরী লইয়া আসা হইত। উহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা দেওয়া হইত। একবার গোতাসিয়া গ্রামে বীরেন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর শ্রাদ্ধে এই 'গোধন' লইয়া গোয়ালা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমিতির সভ্যদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। সমিতির সভ্যগণ জয়ী হইয়া গোধন লইয়া চলিয়া যান। পরে ব্রাহ্মণ ও গোয়ালাদের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় গিয়া নেতাদের অভিযোগ করেন এবং এই সর্ত্তে মীমাংসা হয় যে, গোধনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের সমিতির সভ্য করিয়া দিবেন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে সমিতিকে চাঁদা দিবেন।

কলিকাতা কেন্দ্রের খরচ সাধারণতঃ ধনী লোকেদের চাঁদার উপরেই নির্ভর করিতে হইত। ইহা ছাড়া অরবিন্দ মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। কিন্তু যখন দলাদলি দেখা দেয় তখন তিনি উক্ত মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন।

সমিতির কার্য্য প্রসার হওয়ার ফলে ইহার সংগঠন-প্রণালী বিশেষ ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন বিপ্লবী শাখার পরিচালক পুলিন দাসের এক প্রচারপত্রে জানা যায় যে, বিপ্লবকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য

সমিতির সংগঠন-প্রণালী

সমগ্র বাংলা দেশকে ডিভিসন, সাবডিভিসন, পরগণা, জেলা ও মহকুমায় ভাগ করিয়া এক যোগসূত্রে গ্রথিত করা হয়। প্রধান বিপ্লবী সমিতির অধীনে শাখা-কার্য্যালয় সমূহের

কার্য্যভার উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত হয়। শাখা-কার্য্যালয়ের প্রধানগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ বিবরণ প্রধান কার্য্যালয়ে জানাইতেন।

সমিতির সভ্যগণ সামরিক শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতেন, প্রত্যেক সভ্যকেই সমিতিতে যোগদানের পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। প্রতিজ্ঞা চারি প্রকারের ছিল। (ক) আদ্য প্রতিজ্ঞা, (খ) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা, (গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা, (ঘ) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা।

আদ্য প্রতিজ্ঞা—"আমি কদাপি সমিতির সহিত সংস্রব ছিন্ন করিব না। আমি সকল সময়েই সমিতির বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিব। আমি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ নির্বিবচারে পালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না।"

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা—"আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট কোনও কিছু প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দ্দেশ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির বিবরণ সকল সময়ের জন্য পরিচালকের নিকট জানাইব। যদি কোন সময় সমিতির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে পরিচালকের নির্দ্দেশ পালন করিব। সমিতির আইন অনুযায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অন্য কাহাকেও শিক্ষা দিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে না। একমাত্র সমপ্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণকে উক্ত শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে।"

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা—"ওঁ বন্দে মাতরম্—আমি মাতা, পিতা, গুরুদেব, নেতা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত পরিত্যাগ করিব। কোন প্রকার অজুহাত না দেখাইয়া গুরুদেবের আদেশ নির্বিবচারে পালন করিব। যদি আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হই তাহা হইলে ব্রাহ্মণের, পিতা-

মাতার, এবং বিশ্বের দেশপ্রেমিকগণের অভিশাপ যেন আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে ভস্মে পরিণত করে।"

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা—"ওঁ বন্দে মাতরম্ আমি পরমেশ্বর, অগ্নি, মাতা, গুরুদেব ও অধিনায়কের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। আমি সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করিব এবং সমিতির অন্তর্ভুক্ত যদি কেহ কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যথাশক্তি তাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিব। আমি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না। যদি আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অক্ষম অথবা বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, মাতা ও দেশ-প্রেমিকগণের অভিশাপে আমি যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হই।"

দীক্ষা

দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী প্রিয়নাথ আচার্য্য বলেন যে, "দুর্গাপূজার ছুটির পূর্ব্বে মহালয়ার দিনে রমেশ, আমি এবং ঢাকা সমিতির আরও কয়েকজন রমনার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে পুলিন দাস কর্ত্তৃক দীক্ষিত হই। আমরা সংখ্যায় প্রায় ১০।১২জন ছিলাম। পূর্ব্বেই আমরা আদ্য, অন্ত্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। সেই সময় মন্দিরে কোন পুরোহিত ছিল না। পুলিন দাস মহাশয় পূজা, হোম প্রভৃতি সমাপনান্তে আমাদের ছাপান প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে দেন এবং আমরা উহা দেবীর সম্মুখে পাঠ করি। মস্তকে তরবারি ও গীতা ধারণ করিয়া প্রত্যালীঢ়াসনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি।"

এই আসন শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক।

দীক্ষাপ্রার্থী এবং দীক্ষাগুরু সকলেই পূর্ব্বদিন এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সংযম করিয়া দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধভাবে

দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। দীক্ষাকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে দীক্ষাগুরু উত্তরীয় সহ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেন। দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্য্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত টাটকা কাঁচা দুধ সেবন করিতে দেওয়া হইত।

সমিতির সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নানা প্রকারের ছিল—তাহার মধ্যে গোপন প্রচারপত্র ও বক্তৃতার সাহায্য এবং ব্যক্তিগত সাহচর্য্য ও শিক্ষার মাধ্যম অন্যতম ছিল। সাধারণতঃ স্কুল, কলেজ হইতেই সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। ইহা ছাড়া সভ্যদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হইতে এবং সেবাকার্য্য উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য হইতেও সভ্য সংগ্রহ করা হইত। সাধারণতঃ এই সভ্য সংগ্রহ করিতেন সাধারণ শিক্ষক, অধ্যাপক, ও ব্যায়াম-শিক্ষকগণ। ছাত্রাবাস ও ছাত্রদের মেস প্রভৃতি সভ্য সংগ্রহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মেধাবী ছাত্রগণ তাহাদের সহপাঠী ছাত্রদের এবং নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিতেন এবং পরে সমিতির সভ্য করিয়া লইতেন।

সমিতির কর্ম্মপন্থা

সভ্যদের নিম্নলিখিত বয়স ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল—

প্রথম শ্রেণী—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ;

দ্বিতীয় শ্রেণী—বিবাহযোগ্য যুবক ;

তৃতীয় শ্রেণী—বিবাহিত যুবক ;

চতুর্থ শ্রেণী—বৃদ্ধ ও সংসারী ব্যক্তি।

প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া এই চারিটি শ্রেণীকে আরও চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—

প্রথম শ্রেণী—পাঠনিরত বালকগণ ;

দ্বিতীয় শ্রেণী—অসম সাহসী যুবকগণ, যাহারা মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া যে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ;

তৃতীয় শ্রেণী—যাহারা মাত্র অর্থ সাহায্য করিবে ;

চতুর্থ শ্রেণী—আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সমিতিকে সামরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার নির্দ্দেশ ছিল। নির্দ্দেশ অমান্য করিলে অপরাধ হিসাবে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

ভারতের এই বিপ্লব আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য রুশবিপ্লবের আদর্শ ও নিম্নলিখিত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হয়—

I—"A solid organization of all revolutionary elements of the country, allowing the concentration of all forces of the party where they are most necessary."

II—"A strict division of different branches or departments, i. e, persons working in one department ought not even to know that which is done in any other, and in no case should one control the direction of two branches."

III—"A severe discipline, especially in certain branches ( military and terroristic ), even of complete self sacrificing members."

IV—"A strict keeping of secrecy i. e, every member may only know, what he ought to know, and talk about business matters with companions who ought to hear such matters, and not with them who are not fit to hear."

V—"A skilful use of conspiring means i. e, paroles, ciphers and so on."

VI—"A gradual developing of action, i. e, the party ought not at the beginning to grasp all branches but to work gradually, for instance—(1)organization of a nucleus recruited among educated people, (2) spreading ideas among the masses through the nucleus, (3) organization of technical means ( military and terroristic ), (4) agitation, and (5) rebellion.

বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ কর্ম্মপন্থার মধ্যে সংগঠন, প্রচার ও আন্দোলন। বিশেষ কর্ম্মপন্থাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় কর্ম্মধারাকে সামরিক বিভাগ বলা হয়। বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পদার্থ নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশেষ কর্ম্মপন্থার অন্যতম বিভাগের মধ্যে আর্থিক বিভাগ সন্ত্রাসবাদী বিভাগের সাহায্যে পরিচালিত হইত। সন্ত্রাসবাদী সভ্যগণ বিত্তশালীদের ভয়

দেখাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। সমিতির প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে হিংস উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং মাত্র সাধারণের সাহায্য ও চাঁদার উপরেই নির্ভর করিত।

নিয়মানুবর্ত্তিতা

সমিতির নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর ছিল। সন্ত্রাসবাদী এবং সামরিক বিভাগের সদস্যগণ যদি অধিনায়কের আদেশ পালনে অবাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সমিতির সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত নিয়মাবলী রচিত হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত পালিত হইত:—

"শাখা-সমিতিগুলির পরিচালনা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিবে। সমিতির সহিত সংস্রবে আসার পূর্ব্বে সংগঠন নিয়মাবলী তিনি অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বার পাঠ করিবেন।"

"শাখা-সমিতিগুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকারী বিভাগ অনুযায়ী জেলাকে বিভক্ত করিবেন। বুদ্ধিমান ও উদারহৃদয় ব্যক্তির উপরে প্রত্যেকটি সাব ডিভিশনের ভার ন্যস্ত হইবে।"

"যদি কোন জেলায় কোন দলের নিকট কোন অস্ত্র থাকে এবং ঐ অস্ত্র অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমতি লইয়া যে কোন প্রকারে উক্ত অস্ত্র হস্তগত করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত সাবধানে দলের অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।"

* * * *

"সমিতির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানে বা কাহারও নিকট কোন সভ্য পত্র লিখিতে পারিবে না।"

* * * *

"যাঁহাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র অথবা গোপন কাগজপত্র থাকিবে তাঁহারা কোন ক্রমে কোন প্রকার হিংসামূলক সংগঠন অথবা কোন প্রকার গণ্ডগোলে

যাইবেন না ; তাঁহারা এমন কোন স্থানে যাইবেন না যেখানে বিন্দুমাত্র বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।"

"প্রত্যেক সদস্যের মনে এই ধারণা থাকা উচিত যে, তাঁহারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা করিতেছেন—কোন প্রকার আমোদের জন্য নহে। যাহাতে কোন সভ্য এই মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হন সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখেন।"

যখন বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি সকল দানা বাঁধিতেছিল ঠিক্ সেই সময় বাংলা দেশ বিভক্ত হইল। লর্ড কার্জ্জন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ঘোষণা করেন বাংলা দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বাংলা দেশকে বিভক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গের অপমান বাঙ্গালী নীরবে সহ্য করিল না। বাংলা দেশের হৃদয়ে অপমানের যে তীব্র অনল জ্বলিয়া উঠিল দেখিতে দেখিতে তাহা মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

বঙ্গবিভাগ

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতীদ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষীদের প্রবন্ধ ও যশস্বী গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতিবিশারদ হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতির গানে বাঙ্গালী উদ্বোধিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও বিপিন পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী অনল উদ্গিরণ করিতে থাকে। সরকার হিন্দুসমাজ হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা তখন ব্যর্থ হইয়াছিল।

মুসলমানগণও দলে-দলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। ঢাকার নবাব আকাতুল্লা বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলভী আবদুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, আবদুল গফুর সিদ্দিক, লিয়াকত হোসেন, ইসমাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ দিকে দিকে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। দেশীয় খৃষ্টানসমাজ, জমিদারসমাজ ও নারীসমাজ স্বদেশীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। বিলাতী বর্জ্জনকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে নানা সমিতি ও সঙ্ঘ গঠিত হইল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার "ব্রতী সমিতি," সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়," ভবানীপুর কালিঘাট অঞ্চলে স্থাপিত "সন্তান সম্প্রদায়" এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে স্থাপিত "স্বদেশী মণ্ডলী" প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের "স্বদেশবান্ধব সমিতি" ও ময়মনসিংহের "সুহৃদ্ সমিতি" স্বদেশী প্রচারে অগ্রণী হয়।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশীর ভাববন্যায় কখন যে শহর-পল্লী প্লাবিত হইয়া গেল, কেহ তাহা টের পাইল না। বাঙ্গালীর সংকল্পকে আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত নেতৃবৃন্দের নিজেদের মধ্যেই শক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই নব ভাব জাগরণের জন্ত দেশীয় সংবাদপত্রগুলি আগাইয়া আসিল। ইংরাজি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' এবং বাংলা 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাদী' এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় আরও কয়েকটি পত্রিকা নব ভাবের বাহন হইয়া পর-পর প্রকাশিত হয়। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'নবশক্তি'তে ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় নব ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবান্ধব বাংলা দেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক। "ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীর দ্বারাই সম্ভব" এই কথা তিনি অতি সোজা ও সরল ভাষায় বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়া তুলিলেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে শুনাইলেন, "রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল।"

১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের

প্রতীক করিয়া তুলিবার জন্য নেতৃবৃন্দ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এই দিনে রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ "রাখিবন্ধন" ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শোক প্রকাশের জন্য "অরন্ধন" পালন করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। বঙ্গভঙ্গ বাংলার হৃদয়তন্ত্রীতে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা সেদিনের কার্য্য-বিবরণীর ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সর্ব্বত্র হরতাল—কাজকর্ম্ম, যানবাহন চলাচল সব বন্ধ। রাখীবন্ধনের মিলন-মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ রচিত 'রাখী-সঙ্গীত' শত-সহস্র কণ্ঠে গীত হইল। সে দিন রাখীবন্ধন উৎসব সম্পন্ন হয় বিডন স্কোয়ার ও সেণ্ট্রাল কলেজ-প্রাঙ্গনে।

অপরাহ্ণে আপার সারকুলার রোডে মিলন-মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি স্থাপিত হয়। দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সর্ব্বজনপ্রিয় আনন্দমোহন বসু তখন রোগশয্যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার এই রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি এক প্রকার মৃত্যুশয্যা হইতেই আসিয়া এই সভার সভাপতিত্ব করিলেন। পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে বিপুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আনন্দমোহনের অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসুর স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা-পত্র পঠিত হইল। ঘোষণা-পত্রটি ইংরাজিতে পাঠ করিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় পাঠ করিলেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত ঘোষণা-পত্রে বলা হয় যে, "যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে-পরিণত করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, সেই হেতু আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, বঙ্গভঙ্গের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।"

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও ব্যাপক হইয়া উঠিল যে, সরকার বরিশালকে "Proclaimed District"—"আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গকারী" জেলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বস্তুত বরিশালবাসীর একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতায় স্বদেশী

আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি' নিয়মিত ভাবে স্বদেশী প্রচারে ব্রতী হন। মুকুন্দ দাস স্বদেশী গানে বরিশালবাসীকে মাতাইয়া তুলিলেন। অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বঙ্গের নারী-সমাজকে কাচের চুড়ি ছাড়িয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন।

বিদ্রোহী বরিশাল

কবির আহ্বানে নারী-সমাজ আশ্চর্য্য ভাবে সাড়া দিল। অশ্বিনীকুমার-প্রমুখ পাঁচ-ছয় জন নেতা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য এক অনুরোধ-পত্র প্রচার করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বরিশালের এই প্রতিরোধ-শক্তি ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্রতী হন। বরিশাল শহরে বানরীপাড়া কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হইল। বানরীপাড়ায় সরকারী অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশের চেষ্টা চলিয়াছিল। বিলাতী দ্রব্যের আমদানী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার সাহেব বরিশালে এক বাজার খুলিলেন, কিন্তু ক্রেতা নাই। একমাত্র দোকানী 'হৃদয়' বুলারকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিল, "এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই!" স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধকল্পে সরকার কঠোর দমননীতি অবলম্বন করিলেন। সভা, শোভাযাত্রা, সংকীর্ত্তনের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের জন্য শাস্তিবিধান, বালকদের দণ্ডদান এবং কারাগারে প্রেরণ, পিটুনী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া সরকার সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হইলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে শোণিত-রেখায় আপনার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল স্বদেশীর পীঠস্থান বরিশাল শহরে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে স্থির হয়। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সভাপতিত্ব করিবেন। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের লাট ফুলারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি. সি. লায়নের নির্দ্দেশে রাস্তাঘাট এবং পার্ক প্রভৃতিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির নিষেধাজ্ঞা

প্রচারিত হয়। এই নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে বহু যুবককে বেত্রদণ্ড ও অন্যবিধ দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

সম্মেলনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি বরিশাল পৌঁছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ,—বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, আনন্দচন্দ্র রায়, যাত্রামোহন সেন-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৩ই এপ্রিল বরিশালে উপস্থিত হইলেন। জেলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ষ্টেশনে কেহই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিলেন না। 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কিন্তু ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, সম্মেলনের প্রথম দিন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিবেন ও শোভাযাত্রা সহকারে সভামণ্ডপে গমন করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির হইল। পথের আশে-পাশে বহু পুলিশ মোতায়েন ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ-পরিহিত 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ যেমনি হাবেলী হইতে রাস্তায় পদক্ষেপ করিলেন, অমনি পুলিশ তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। লাঠিচালনার ফলে শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে অনেকে আহত হইলেন। ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার আঘাতই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লাঠির আঘাতে চিত্তরঞ্জন পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরের জলে ছিটকাইয়া পড়িলেন। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছিল। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন সভাপতি রসুল এবং পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিতেছিলেন। পুলিশ কর্ত্তৃক লাঠি চার্জ্জের সংবাদে নেতৃবৃন্দ ঘটনা-স্থলে ছুটিয়া আসেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প একমাত্র সুরেন্দ্র-নাথকে গ্রেপ্তার করেন। বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনায় দায়ে ২০০৲

টাকা জরিমানা হয়। ইহা ছাড়া আদালত অবমাননার দায়ে আরও ২০০৲ টাকা জরিমানা ধার্য্য হয়।

এদিকে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি [illegible] ঘোষ যখন কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ-লিখিত অগ্নিদীপ্ত ভাষায় আপোষ বিরোধী মূলক "No compromise" ও "ভবানী-মন্দির" পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে আসিলেন, তখন বাংলার দৃঢ়তাপূর্ণ বৈপ্লবিক ধারা অনেক বেশী জমাট বাঁধিয়াছে। বুয়োর যুদ্ধে ক্ষুদ্র বুয়োর জাতির সংগ্রাম এবং জাপানের নিকট রাশিয়ার স্থায় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের ভীষণ পরাজয়, বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গালী তরুণ মাত্রেই ক্রুজি, নোগুচি, নোগি প্রভৃতি বীরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাদের পথকেই প্রকৃত দেশসেবার পথ বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে জন্য অনুশীলন ও আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতিও দল বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইতে লাগিল।

'ভবানী-মন্দিরে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, 'ভবানী-মন্দির' ছিল ১৬ পাতার চটি বই, শ্রীঅরবিন্দের নিখুঁৎ কবিত্বময়(Intutive)প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাষায় ইংরাজিতে লেখা। এই অপূর্ব্ব পুস্তিকার বাংলা অনুবাদও হ'য়েছিল ব'লে অবিনাশ না কি মত প্রকাশ ক'রেছে। আমার কিন্তু এর বাংলা অনুবাদের কথা স্মরণ নেই। হিন্দু বাংলার জন্য পারমার্থিক ভিত্তিতে শক্তির নব প্রেরণায় জাতি-গঠনের এমন অনুপম আয়োজনের পুস্তিকার বাংলায় অনুবাদ হওয়াই খুব সম্ভব। 'ভবানী-মন্দিরে'র স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এই চটি বইএর আরম্ভে লেখা

ভবানী-মন্দির

ছিল—'Far from the contamination of modern cities and as yet little trodden by man in a high and pure air steeped in calm energy—' আধুনিক নগরীর মলিনতা ও কোলাহলের বাহিরে, জন মানবের গতিবিধি নাই —এমন তুঙ্গ গিরিশিখরের শুদ্ধ পবিত্রতার কোলে এই 'ভবানী-মন্দির' নির্ম্মিত হবে। এখানে মাতৃপদে দীক্ষিত সন্তানদল সমর্পিত সাধনায় শক্তি সংগ্রহ করবেন

—মায়ের সেবা ও কর্ম্মের জন্য। ছত্রপতি শিবাজী-পূজিত চতুর্ভুজা ভবানীর রূপের যথাযথ বিবরণ ও স্তবস্তুতি, ভাবগম্ভীর ভাষায় ছিল মায়ের আবাহন; দেশের কাজে এতদর্থে ছিল অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্যের আবেদন ছিল এই পুস্তিকায়।"

বারীন্দ্রকুমার বাংলা দেশে দ্বিতীয় বার আসার পর সর্ব্বপ্রথম দেবব্রতকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। দেবব্রতের বাড়ী ছিল সেই সময় ষ্টার থিয়েটারের পিছনে। নূতন কেন্দ্রের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা হইল দেবব্রতেরই বাড়ীর নিকটে গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে রাজাদের একটি ঘোড়ার আস্তাবলের উপর। একখানি বড় হল, রাস্তা হইতে সরু গলির ভিতর দিয়া সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই ঘরখানিতেই বারীন্দ্রকুমার ও দুই-এক জন কর্ম্মী বাস করিতেন। পরে খুলনার সুধীর সরকার আসিয়া যোগদান করেন। ইঁহার সঙ্গে সুদক্ষ কম্পোজিটার ব্রাহ্মণ যুবক যোশী আসিয়া মিলিত হন। সিঁড়ি হইতে উঠিবার মুখের স্থানটুকু পার্টিশনে ঘিরিয়া কিছু টাইপ কিনিয়া এই যুবককে "ভবানী-মন্দির" কম্পোজ করিতে দেওয়া হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই যুবকটি "ভবানী-মন্দির" ও 'No compromise' নামক পুস্তিকা দুইটির কম্পোজ সমাপ্ত করেন। পরে সুধীর সরকার ও আর একটি ছেলেকে লইয়া বারীন্দ্রকুমার কালীতলার গুপ্তপ্রেসে শেষ রাত্রে দ্বার বন্ধ করিয়া "ভবানী-মন্দির" পুস্তিকা ছাপেন। গুপ্তপ্রেসের কর্ত্তারা এই সর্ত্তে প্রেস ব্যবহার করিতে দিতে রাজী হন যে, তাঁহাদের সাধারণ কর্ম্মচারীরা চলিয়া গেলে গভীর রাত্রে প্রেসের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। পরে পুস্তিকা ছাপিয়া এই অবৈধ কাজকর্ম্মের সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করিয়া রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিতে হইবে।

"ভবানী-মন্দির" ছাপা শেষ হইলে দক্ষিণ-ভারতের গুপ্ত সমিতির নেতা বৃদ্ধ খাপার্দ্দে ও ডাঃ মুঞ্জেকে পাঠান হয় এবং গোপনে অনুরাগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইহার পর বারীন্দ্রকুমার অন্যতম কর্ম্মী হরিশ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বাহির

হন "ভবানী-মন্দিরে"র স্থান অন্বেষণে। প্রথমে মীর্জাপুরে গিয়া ডাক্তার কৈলাস বসুর পাইক-বরকন্দাজ ও শিকারী সাঁওতাল দল লইয়া শোণ নদীর তীরে রোটাস-গড় দুর্গের নিকট কাইমুর পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত উচ্চ গিরিমালাটি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এক মাসের মাথায় বিন্ধ্যাচলের ডেহরি-অন-শোণের ষ্টেশনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। "কোয়াখো" নামক দুর্গম ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনে জল-প্রপাতের উপর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চারিটি খোঁটা পোঁতা হয়।

কোয়াখো

স্থির হয়, কৈলাসবাবু এই জমি ভবানীর নামে ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করিবেন। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা স্থানে "ভবানী-মন্দির" নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্ভব হয় নাই। নানা কাজে ও যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ প্রকাশে 'মা ভবানীর' পীঠস্থান রচনার কার্য্য স্থগিত রহিল।

গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে বিপ্লবীদের নূতন আড্ডার বর্ণনা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, "এই বড় লম্বা হলঘরে ছেলেরা উপযোগী মানুষ ধরে ধরে আনতো ও আমি অনর্গল বক্তৃতায় তাদের বিপ্লবী ক'রে তুলতাম। দেবব্রতের ঘরেও বসতো আলোচনার বৈঠক। হরিশ ঘোষ এইখানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, কারণ সে ঐ গ্রে ষ্ট্রীটের কোন একটি প্রেসের সঙ্গে ছিল যুক্ত।

বিপ্লবীদের নূতন কেন্দ্র

আমরা "ভবানী-মন্দিরে"র স্থান অন্বেষণের কাজ শেষ ক'রে ফিরে এসে আবার লাগি লোক সংগ্রহের ও কেন্দ্র রচনার কাজে। তখন যতীন দা' প্রব্রজ্যায় চলে গেছেন, আমাদের বাংলা কেন্দ্রের সভাপতি পি. মিত্র মশাই ডুবে আছেন তাঁর অনুশীলন সমিতির লাঠি, ছোরাখেলার কাজে, আবার আমি এসে পূর্ব্ব যোগাযোগ স্থাপন ক'রে কাজে নামলাম বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ এবারকার চালক ও নেতা হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

"বিপ্লবমন্ত্র নিয়ে দ্বিতীয় বার দেশে ফিরে আমাদের পুরাতন মেদিনীপুরের কেন্দ্র, বাঁকুড়ার কেন্দ্র, রংপুর ও ঢাকার কেন্দ্র ক্রমশঃ নূতন প্রেরণায় নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হোল। তারা এত দিন স্বদেশীয় বন্যায় ক্রমশঃ গা ভাসিয়ে বিপ্লবী

পন্থায় কুটিলতা থেকে অনেকখানি সরে যাচ্ছিল। বিপ্লবের রক্তরাঙা মৃত্যু-গহন আয়োজনে আশু ফলের মত্ততা ও নেশা নাই ; পার্ব্বত্য নদীর জলের মতই চঞ্চল গণমনের গতি ও স্বভাব, পথে বন্ধুর পাষাণস্তূপের কঠিন বাধা পেলে সে উত্তাল প্রবাহমান স্রোত বাধাকে এড়িয়ে ঘুরপথে নরম মাটি ক্ষয় ক'রে পথ কেটে চলে। আমাদের ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রতিষ্ঠিত শাখাগুলি স্বদেশীর চটুল রঙে যাচ্ছিল রাঙিয়ে ; সে আন্দোলন তার প্রধূমিত অবস্থা কাটিয়ে যেমন প্রজ্বলিত অবস্থা লাভ ক'রেছিল, তেমনি দেশের রুদ্ধ সঞ্চিত রোষ ও তাপ নানা বহিঃপ্রকাশে ফেটে পড়তে চাইছিল।

"স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লব-যজ্ঞেরই বাহদ্বার। এই আন্দোলন দেশ-আত্মার জঠরাগ্নির মধ্যে সঞ্চিত অগ্নিকে ইন্ধন যুগিয়েছিল ; স্বদেশীর ব্যর্থতাই সশস্ত্র বিপ্লবকে অনিবার্য্য ক'রে এনেছিল, তবু স্বদেশী সশস্ত্রে বিপ্লব নয়। বরিশাল কন্‌ফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশ-যজ্ঞ পণ্ড হোল, এই ঘটনার ফলে বহু নরমপন্থীকে উগ্রপন্থীতে পরিণত করে। বরিশালের পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কেম্প ও ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন এই যজ্ঞমণ্ডপে আগুন দেবার বৈধ আইনের ছিলেন ভাড়াটে গুণ্ডা, সেখানে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার আদি নরমপন্থীর উপর চললো উৎপীড়ন। শ্রীঅরবিন্দ এ দক্ষযজ্ঞ নাশের ছিলেন নীরব নির্ব্বাক্ দ্রষ্টা।

"এর দুই মাস আগে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কিন্তু মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স হ'য়ে চুকেছে, সেখানে আমাদের মেদিনীপুর গুপ্তচক্রের কর্ম্মীরা ছিল প্রচ্ছন্ন ভাঙনের সেনারূপে। সত্যেন বসুর ইঙ্গিতে বালক ক্ষুদিরাম এই কন্‌ফারেন্সে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে গুপ্ত প্রচারপত্র "সোনার বাংলা" ও "No Compromise" বিতরণ করতে গিয়ে ধরা পড়েন ; সত্যেন বসুর চেষ্টায় ক্ষুদিরাম মুক্তি পান। তখন সত্যেন বসু কালেক্টরীতে একটি কেরাণীগিরির চাকুরী করতেন। এই ঘটনার কর্ণধার সন্দেহে ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যেনকে কড়া জেরা করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন না ক'রে নীরব থাকায় তাঁর কেরাণীগিরিটি খসে যায়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বহিরঙ্গ স্বদেশীর প্রজ্বলিত অবস্থা ও অন্তঃসলিলা সশস্ত্র মৃত্যু-যজ্ঞের ঠিক্ সন্ধিক্ষণ ; অরবিন্দ আমাদের গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় এসে কিছুদিন

ছিলেন। এই ঘরে বহু কুতার্কিক মানুষের বিপ্লবী-বিরোধী মতি ফেরাবার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্কজাল খণ্ডন ও বিস্তার করতাম, নীরব শ্রীঅরবিন্দ তা' মৌনী হয়ে বসে শুনতেন। আগন্তুকরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো না— এই নীরব শ্রোতাটি স্বরূপতঃ কে!"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন কালে বৈপ্লবিক-পার্টির প্রথম সম্মেলন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে আহুত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমথনাথ মিত্র এবং বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

গুপ্ত-সমিতির প্রথম সম্মেলন

যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মৈমনসিংহ হইতে পরেশ লাহিড়ী (বর্ত্তমান মহাদেবানন্দ গিরি), ঢাকা হইতে পুলিন দাস, ত্রিপুরা হইতে নিখিল মৌলিক ও ডাঃ কর্ম্মকার, নদীয়া হইতে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভাগিনেয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুর হইতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, বর্দ্ধমান হইতে নবীন উকিল সামন্ত (ইনি কার্যাবশতঃ পূর্ব্বদিনই কলিকাতা ত্যাগ করেন) ও বিভূতি সরকার, যশোহর মাগুরা হইতে বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার অনুশীলন সমিতি হইতে সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার সহকর্মী সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত কলিকাতার বিশিষ্ট কর্ম্মীরাও উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।—অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, অন্নদা কবিরাজ, বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। পাবনার প্রতিনিধিত্ব করেন অবিনাশ চক্রবর্ত্তী ও অন্নদা কবিরাজ, আত্মোন্নতি সমিতির পক্ষ হইতে ইন্দ্রনাথ নন্দী ও দিনাজপুরের কয়েকজন প্রবীন উকিল।

উক্ত সম্মেলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন,—সম্মেলনে ডেলিগেটদের সনাক্ত করিয়া যোগদান করিতে দেওয়া হয়। বর্দ্ধমানের বিভূতিবাবু পুলিশে কেরানীর কর্ম্ম করিতেন। ললিতবাবু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি পুলিশে চাকুরী করেন। ইহাতে ললিতবাবু চেঁচামেচি করেন যে, পুলিশের লোক ভিতরে ঢুকিয়াছে। এই সময় আমি

বাহিরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথা কহিতেছিলাম। তিনি তখন ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন।

আমি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "এখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠি নাই," এই সময়ে ললিতবাবুর ত্রস্ততার কথা শ্রবণ করিয়া আমি তথায় যাই এবং হাসিয়া বলি, বিভূতিবাবু আমাদের লোক, আমি তাহার জন্ম guarantee হইতেছি। বিভূতিবাবুর সঙ্গে শেষ দেখা হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের কংগ্রেসী সম্মিলনে। তিনি তখন বলিলেন, পুলিশের কার্য্যে পেনশন লইয়া বীরভূমে কংগ্রেস কর্ম্মী হইয়াছেন।

এই সময়ে পরেশ লাহিড়ীর সনাক্তকরণের কথা উঠে। নিখিল মৌলিক তাহার বন্ধু, কিন্তু তিনি তখনও সভায় উপস্থিত হন নাই। কাজেই সভাপতি যখন credintial চাহিলে তিনি ( বোধ হয় ভয়ে ) আসল কথা গোপন করিয়া বলিলেন আমার বন্ধু নিখিলবাবু বলিয়াছিলেন এই স্থানে একটি সভা হইবে, তাই এই স্থলে আসিয়াছি। তৎপর সভাপতি যখন বলিলেন, আপনি দীক্ষা লইতে রাজী আছেন ? তখনও তিনি সত্য গোপন করিয়া "না" জবাব দিলেন। তখন সভাপতি বলিলেন, Be pleased to leave the meeting ( অনুগ্রহ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করুন )। আমার সঙ্গে লাহিড়ীর আলাপ ছিল, কিন্তু তিনি যখন নিজের বৈপ্লবিক পরিচয় দিতেছেন না, এবং যাহার কাছে তিনি দীক্ষা লইয়াছেন তিনি যখন হাজির নাই তখন আমার উপর যাচা হইয়া তাঁহাকে সনাক্ত করা অনুচিত এবং দলের নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া চুপচাপ করিয়া থাকি। লাহিড়ী পরে আমাকে বলেন, নিখিলবাবু তথায় ছিলেন না বলিয়াই তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন, যদিও তিনি পার্টির মেম্বার।

তৎপর দিনাজপুরের সিনিয়ার উকিলের কথা উঠিল। তিনি তখনও দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু সভাপতি মিত্র মহাশয় বলিলেন—"I stand guarantee for him with my life"। তৎপরে সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা discipline মানিতে রাজী আছেন কিনা ?" সকলে একবাক্যে বলিলেন,

"আমরা রাজী আছি।" এই উত্তরের পর তাঁহার বক্তব্য তিনি বলিতে লাগিলেন। তিনি বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্মের সর্ব্ববিভাগের কথা বলিলেন। 'যুগান্তর পত্রিকা'র কথা বলিলেন এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে, একটা নিভৃত স্থান ক্রয় করিয়া তথায় সামরিক শিক্ষা দিবার কথা উঠে। মিত্র মহাশয় ইহাতে বিশেষ জোর প্রদান করিয়াছিলেন। এই কথাতে দিনাজপুরের বৃদ্ধ উকিলটির চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তিনি এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। শেষের কথা উঠিল, কে কোন্ জেলায় বিপ্লবের ভার গ্রহণ করিবেন। অনেকেই নিজ নিজ জেলার ভার লইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুলিন দাস বলিলেন তিনি ঢাকা জেলার ভার নিবেন; ডাঃ কম্মকার ত্রিপুরা জেলার ভার নিলেন।

"সভাপতির বক্তৃতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের সমন্বয় করিয়া বিপ্লবকে কি প্রকারে চালাইতে হইবে সেই বিষয়ে বলিলেন। বক্তৃতার শেষে মিত্র মহাশয় জ্ঞানেন্দ্র বসুকে চট্টগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞান-বাবু সেই সময়ে সাংসারিক কার্য্যে চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মিত্র মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আপনি যখন চট্টগ্রামে গিয়া-ছিলেন, তখন আখড়ায় কত লাঠির ভিড় দেখিয়াছিলেন কিন্তু পরে, তথায় একটি লাঠিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই (অর্থাৎ সব নির্ব্বাপিত হইয়াছে)"। তৎপরে কথা উঠে; মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিকদের সহিত বাংলার কর্ম্মীরা ভাব বিনিময় করিবে কি না? সভাপতি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই, আমাদের কর্ম্মের গুপ্তকথা তাহাদের বলিব না।" শেষে প্রতিনিধিরা বলিলেন, "তাঁহারা কংগ্রেসের ডেলিগেট হইয়া আসিয়াছেন, কংগ্রেসে না গিয়া সেই টাকা পার্টিকে দিতে তাঁহারা ইচ্ছুক কিন্তু, কংগ্রেসে 'আদর্শ' বিষয়ে যে নরম দল ও গরম দলের বিবাদ রহিয়াছে, তাঁহারা ডেলিগেটরূপে গরমদলকে এই বিষয়ে ভোট-দানে সাহায্য করিতে পারেন," সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "তাহা সত্য, তাহা হইলে আপনারা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করুন।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে পুনরায় গুপ্ত-সমিতির অধিবেশন হয়—উদ্দেশ্য ছিল, পথ ও কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করা।

## 'সন্ধ্যা'—'যুগান্তর'—'বন্দেমাতরম্'

অগ্নিযুগে যে তিনটি পত্রিকা সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের ধমনীতে অগ্নিপ্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে উপাধ্যায় ও ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' অগ্রজ। অপর দুইটি পত্রিকা—'যুগান্তর' ও শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'। এই পত্রিকা তিনটি সে যুগের বিপ্লব মন্ত্রের বাহন ও স্রষ্টা। তাহাদের পরিচয়ই জাগ্রত বাংলার প্রথম প্রাণস্পন্দনের পরিচয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'সন্ধ্যা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় এই পত্রিকাটি নৈষ্ঠিক হিন্দুর ফিরিঙ্গী-বিদ্বেষী সামাজিক মুখপত্র মাত্র; খৃষ্টান পাদ্রী ব্রহ্মবান্ধব তখন প্রবল প্রতিক্রিয়াবশে গোঁড়া হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। গো-ব্রাহ্মণ-দেবতায় অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রম ধর্মের তত্ত্ব প্রচুর ফৈরঙ্গী সভ্যতা-বিদ্বেষের সঙ্গে উদ্‌গিরণ করিতেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে 'সন্ধ্যা'য় ছিলেন বলাই দেবশর্ম্মা, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও অণিমানন্দ নামে একজন সিন্ধি খৃষ্টান সাধু।

'সন্ধ্যা' যাঁহার মানস কন্যা—সেই 'সন্ধ্যা'কে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মবান্ধবকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবান্ধবও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। সত্যের অনুসন্ধিৎসায় এই উদ্দাম মত মনস্বী পুরুষ বহু ধর্ম্ম ও পথের সন্ধান করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসী বেশে ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতীর কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। কলিকাতার পথে এই সংবাদ পাইয়া উন্মাদ সন্ন্যাসী চলিলেন বেলুড় মঠে এই যুগ-পুরুষের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে। সেখানে তিনি অন্তরের প্রেরণা পাইলেন—স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত ফিরিঙ্গীজয়-ব্রত তাঁহাকেই শেষ করিতে হইবে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

সংকল্পমত মাত্র ২৭৲ টাকা সম্বল করিয়া ৫ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা

করেন এবং ঐই নভেম্বর অক্সফোর্ডে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি 'হিন্দুধর্মে ঐশ্বরবাদ', 'হিন্দুর নীতিশাস্ত্র' ও 'হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। তৎপর কেম্‌ব্রিজে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শন সম্পর্কে আরও তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কেম্‌ব্রিজ বিশ্বালয়ে হিন্দু-দর্শনের অধ্যাপকের পদ প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাত প্রবাসকালে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি বিষয় সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। এই ব্রহ্মবান্ধবকেই চিনিতে পারিলেই গোঁড়া নৈষ্ঠিক হিন্দুত্বের মুখপত্র 'সন্ধ্যা'কেও বুঝিতে পারা যাইবে।

দৈনিক 'সন্ধ্যা'র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে বলেন—

'সন্ধ্যা'র উদ্দেশ্য

"দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবল মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বার শত বৎসর ধরিয়া কলির একটি সন্ধ্যা। এইরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

"প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।

"পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় সু-দশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুই শত বৎসর চলিয়া গেল তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতনকথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটা লম্বা রশিতে বাঁধা আছি, যত দূরই যাই না কেন, যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই।...

"কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা 'সন্ধ্যা' নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল এই এক-মাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকার জন্য, খান

সম্ভ্রমের জন্য, ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাব-ভাব ধরিতে হইবে নহিলে উপায় নাই। এতে কি আর খাঁটি ধর্ম্ম থাকে? সমস্যা শক্ত বটে কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ ও দেশ বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহারও মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও—বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবী ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প-স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই।"

'সন্ধ্যা' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশ বিভক্ত হইল। লর্ড কার্জ্জনের নির্মম আঘাতে বাংলার জাতীয় জীবনে যে বিপ্লবের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন তাহার অন্যতম হোতা। শিক্ষিত জনগণকে জাগাইবার ভার বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির হস্তে রাখিয়া স্বয়ং আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে সাড়া পাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'সন্ধ্যা'য় গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালী প্রভৃতির দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়।

স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, "আমাদের দশা কেন এমন হইল? কেন অহরহঃ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে হা অন্ন হা অন্ন রোল উঠিতেছে? কেন মহামারী মহারোগের প্রপীড়নে লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে? কেন শাসনপদ্ধতির প্রতি এত বিদ্বেষ? অতএব এমন অসামঞ্জস্য সমাজ স্থায়ী থাকিতে পারে না,—হয় আমরা আবার উঠিব—নয় একেবারেই মরিব।

"......কাঁদিবার মানুষ চাই—ব্যথায় ব্যথিত হইবার উন্মাদ সাধক চাই—সর্ব্বত্যাগী তপস্বী চাই—ভাগবৎমণ্ডলী চাই—তবে ভগবানের শুভাগমন সম্ভব। যিনি যেমন তাঁহার যোগ্য আমন্ত্রণকারী না হইলে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কেন? কোথায় তিনি—যিনি আহ্বান করিবেন; কোথায় তিনি—যিনি হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া মায়ের চরণে রক্তজবার অঞ্জলি দিবেন; কোথায় তিনি—যিনি ভারতের দুঃখে উন্মত্ত হইয়া, নরনারীর পাপ রুচিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেবতার দেবতা—রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ভয়ত্রাতা ভগবানকে ভক্তিভরে বাঁধিয়া আনিবেন? কে বুঝাইবে যে, পাপভরে ধরিত্রী চঞ্চলা হইয়াছেন—আর যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না? কে ঘন-ঘন ভূমিকম্পে, অনাবৃষ্টি, অতিপ্লাবনে, পর্ব্বতের অগ্ন্যুদগারে—মহামারীর পৈশাচিক লীলায়, দারিদ্র্যের অস্থিপেষণকারী বেদনায়, ঝঞ্ঝাবাতে ধরার চাঞ্চল্য বুঝিয়া উর্দ্ধমুখে করযোড়ে আত্মস্বরে দয়াল প্রভুকে ডাকিবে? কে দ্বারে দ্বারে যাইয়া শুভবার্ত্তার ঘোষণা করিবে?"

ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে তীব্র ও তিক্ত সমলোচনা করিতেন তাহার এক কৈফিয়ৎ দিয়া বলেন, "আমরা সাদা-সিধে বুলিতে প্রাণের কথা লিখি—তাই সেই সভ্য বাবুদের ভাল লাগেনা। তাঁহারা ছেঁদে-বেঁধে কথা কয়েন ও লেখেন। আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অত সভ্যভাবে প্রকাশ করিতে পারি না তাই আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই। কিন্তু যাঁরা আমাদের বুলিটা কিছু কড়া বলিয়া নালিশ করেন তাঁহাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমাদের স্বাভাবিক বুলি এত চোয়াড়ে নয় তবে যখন রাগ দেখাতে হয়—হাঁক ডাক করিতে হয়—তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলে? দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজের উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। এ সকল কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে শানাইবে না। আর একটা উপমা দিই—পুকুরের নীচে পচা পাঁক

সন্ধ্যার কৈফিয়ৎ

জন্মিয়াছে। সেই জল খাইয়া লোকের জ্বর বিকার ধরিতেছে। ঐ পাঁক একেবারে ঘাঁটিয়া দিতে হইবে। এখন ঘাঁটিতে গেলেই জল ঘোলা হইবে। এই ঘোলানো দেখিয়া আমাদের সভ্য বাবুরা নাক সিটকান। কিন্তু মানুষ যে মরে—সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন সাড়া নাই—ব্যথা নাই। তাঁহারা বুঝেন না যে, ঘোলানোটার পরে যখন জল থিতুবে, তখন সরোবর নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর হইবে।"

এর কিছুদিন পরে 'সন্ধ্যা' পূর্ণ মুক্তির ঘোষণা করে। "আমরা চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীর আধিপত্যের লেশ মাত্র থাকতে দেশের কোন উন্নতির আশা নেই এবং বিদেশী বয়কট সবই নিরর্থক, সেগুলি যদি আমাদের পূর্ণ মুক্তি অর্জ্জনের উপায় না হয়।.... ফিরিঙ্গীর দেওয়া কৃপার দানে আমরা থুথু দি, তাকে বর্জ্জন করি। আমরাই নিজের শক্তিতে গড়ে তুলবো আমাদের মুক্তি।"

যে দু'টি লেখার জন্য উপাধ্যায় পুলিশের প্রকোপে পড়িয়া গ্রেপ্তার হন তাহার শিরোনামা ছিল "ফিরিঙ্গী আমার পরম দয়ালু। ফিরিঙ্গীর কৃপায় দাড়ি গজায়—শীতকালে খাই শাঁক আলু" এবং "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।"

'সন্ধ্যা' পত্রিকা উগ্র আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজবাদ হইতে যুগান্তরী গরম রাজনীতিবাদে রূপান্তরিত হইবার অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন যে, "একবার কি সূত্রে, তাঁর অবর্তমানে 'সন্ধ্যা'র পরিচালনার ভার অস্থায়ীভাবে পড়ে 'যুগান্তর' অফিসের উপর। আমরা প্রায় রাতারাতি এই অবসরে 'সন্ধ্যা'কে কালী মাঈর বোমার ওকালতিতে গরম আসরে নামিয়ে দিই।" ব্রহ্মবান্ধব ফিরে এসে খুসী হ'য়ে অবিনাশকে ব'ললেন, 'তা বেশ ক'রেছ, এখন 'সন্ধ্যা' গরম সিদিসনই চালাবে।' ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কয়েকটি প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে "প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শক্তিসম্পন্ন বোমা প্রস্তুত হইয়াছে এবং সকল দেশ-ভক্তেরই এই সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।"

রাজদ্রোহের দায়ে সন্ধ্যা

কেবল মাত্র 'সন্ধ্যা' প্রকাশ ও পরিচালনাই এই কৃতী পুরুষের জীবন কথা

নয়, ব্রহ্মবান্ধব জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরিকল্পয়িতা ও স্রষ্টা এবং 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

'সন্ধ্যা'য় উগ্র লেখার জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার পর যখন বিচার আরম্ভ হইল তখন ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন—"ছিঃ! ফিরিঙ্গীর আদালতে গেরুয়া পরিয়া যাইব? আমাকে পৈতা গ্রন্থি করিয়া দাও, আমি যজ্ঞোপবীত পরিয়া শাদা কাপড়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রূপে ফিরিঙ্গীর কাছে হাজির হইব।"

বিচারকের সম্মুখে 'সন্ধ্যা'র যাহা কিছু দায়িত্ব সকলই আপন স্কন্ধে লইয়া বিচারককে বলিলেন যে, "ভগবৎ প্রেরণায় তিনি ভারতে স্বরাজ-সংস্থাপন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সে জন্য বিদেশীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিবেন না।"

এই মামলা বিচারকালীন ব্রহ্মবান্ধব গুরুতর পীড়িত হইয়া ক্যাম্বেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হন। হাসপাতালে যাইবার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে উপাধ্যায় তাঁহার কোন এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইয়া কয়েদীর মত খাটিব না। আমি কখনও কাহারও ফরমাইস খাটি নাই—কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকি নাই। চিরজীবনটা একভাবে কাটাইয়া শেষে প্রৌঢ়ের সীমায় আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে—আর আমি বেগার খাটিব? আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।" চিরকুমার সন্ন্যাসীর বাণী সত্যে পরিণত হইল। তিনি ইহলোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সমসাময়িক সময়েই 'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাব। এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্রের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে দেশে বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা লইয়া মতবিরোধ দেখা দিল। মিত্র মহাশয় যখন বিপ্লব আন্দোলনের মূল সূত্র হিসাবে দেশের যুবকদের মধ্যে লাঠি, ফুটবল খেলা, বক্সিং, কুস্তী প্রভৃতি শরীরচর্চ্চার আন্দোলন যাহাতে বিস্তারলাভ করে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন বারীন্দ্র, দেবব্রত, অন্নদা কবিরাজ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কর্ম্মিগণ দেশকে

সশস্ত্র অভিযানের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করাইবার জন্য 'যুগান্তর' নাম দিয়া বিপ্লব-তন্ত্রের কাগজ বাহির করিবার জন্য মনস্থ করেন।

যুগান্তর

যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইঁহাদের সহিত 'আত্মোন্নতি সমিতি' রাজনৈতিক কার্য্যে সহায়তা করিত। যুগান্তর দল পৃথক হওয়ার মূলে অন্য একটা কারণ ছিল, তাহা হইতেছে দলের নেতৃত্ব লইয়া মতবিরোধ। অনুশীলন দল প্রমথ মিত্রের অধিনায়কত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, আর যুগান্তর দল অরবিন্দ ঘোষকে অধিনায়করূপে দেখিতে চাহেন। এই বিভেদের ফলে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ প্রমথ মিত্রের দলে থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া বঙ্গে যে-সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহারা সকলে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে আসিল। যুগান্তর পৃথক্ ভাবে গড়িয়া উঠিলেও অনুশীলন, আত্মোন্নতি প্রভৃতির কয়েক জন প্রধান এই দলের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শিথিল হইলেও এই যোগের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-সূত্র বরাবরই ছিল। বিপ্লবীদের বাৎসরিক যে সম্মেলন হইত তাহার সভাপতিত্ব করিতেন প্রমথনাথ মিত্র।

পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, "যুগান্তর" নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। যুগান্তর-দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত, প্রবন্ধ লেখা, সমস্ত কর্ম্ম পার্টির অভিপ্রায় অনুসারেই হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপর ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং অবিনাশ চক্রবর্ত্তী। আমাদের উদ্দেশ্য

ছিল, একবার এই বাংলাকে তাহার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া সত্য কথা বলিয়া যাইব। গুপ্ত ভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালাইতেই হইবে। টাকার টানাটানি চিরকালই ছিল। কাগজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, টাকার খবর তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জানেন; টাকার খবর টাকার অনটন হইলে অরবিন্দ ঘোষ ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইতাম। যদিও টাকার অনটন সর্ব্বদাই ছিল, কিন্তু কার্য্যের সময় টাকা পাওয়া যাইত। এই প্রকারে হাতে-চলা প্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে আমরা ইলেকট্রিক মেশিনের ছাপাখানা করি।"

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা ৩৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীটের কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস নামক ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে। ২৭ নং কানাই ধর লেনে ইহার কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানাইয়া কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে পাঠান হইল। হকারদের নিকট কাগজ বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইলেও উহা মোটেই বিক্রয় হইল না। 'যুগান্তর'কে অন্তর দিয়া চিনিতে বাঙ্গালীর কয়েকমাস লাগিয়াছিল।

কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের মালিক বীরেশ্বর সেন পত্রিকার মতবাদে ভীত হইয়া দুইমাস পরেই প্রেসে উক্ত পত্রিকা মুদ্রণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ঘোষের সাধনা প্রেস হইতে উক্ত পত্রিকা মে মাস হইতে প্রকাশ হইতে থাকে। 'যুগান্তর' প্রতি বুধবারে একহাজার ছাপা হইত। ইহার মধ্যে কলিকাতায় মাত্র ১৪ খানা বিক্রয় হইত। 'যুগান্তরে'র গরম লেখা কয়েকমাস বাহির হইবার পর জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ ইন্সপেক্টার বিনোদ গুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথকে থানায় ডাকাইয়া লইয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সম্পাদকের মুখে ঐ কয়খানি নগদ বিক্রয়ের কথা শুনিয়া বলেন, "হ্যাঁ, এই কাগজ ত বাজারে দেখিতে পাই না।" যাহা হউক, ময়মনসিংহের জামাল-পুরের হাঙ্গামা বিষয়ে নানা সংবাদ বাহির হইলে পত্রিকার নগদ বিক্রয় কয়েক সহস্র পর্য্যন্ত উঠে। প্রায় এক বৎসরের কিছু বেশী দিন কাগজ বাহির হইবার পর

মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। কিংসফোর্ডের আদালতে বিচারের পর ভূপেন্দ্রনাথের কারাবাস ও সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হাইকোর্টে আপিলের ফলে সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্তের আদেশ নাকচ হইলে প্রেসের মালিক হরিশ্চন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে অবিনাশ ভট্টাচার্য্য মালিকরূপে ডিক্লারেশন লন। হরিশের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইলে তিনি পলাতক হন। রাজদ্রোহের অপরাধে ভূপেন্দ্রনাথের জেল হওয়ার ফলে 'যুগান্তরে'র খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা সপ্তাহে ২০,০০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'যুগান্তরে'র আদিপর্ব্বে ছিলেন না। তিনি অনেক পরে আসিয়া যোগদান করেন। উপেন্দ্রনাথ প্রথমে 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদকীয় দলে কার্য্য করেন। পরে অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের প্রচেষ্টায় তিনি 'যুগান্তরে' যোগদান করেন। মায়াবতীর আশ্রম ফেরত উপেন্দ্রনাথ তখন মুণ্ডিতশির, নগ্নপদ, গৈরিকধারী ব্রহ্মচারী। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে "ব্রহ্মের পশ্চাদ্দেশে কিরূপে মায়া ঢুকলো" তারই সন্ধানে ঘুরিয়া বিফলকাম হইয়া উপেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'যুগান্তরী' আড্ডার সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা উপেন্দ্রনাথ এক অপূর্ব্ব বর্ণনায় বলেন—"১৯০৬ খৃষ্টাব্দের তখন শীতকাল। কলিকাতায় 'যুগান্তর' আফিসে আসিয়া দেখিলাম—৩৷৪ জন যুবক মিলিয়া একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলীগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরাজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দু'দিন পরে 'যুগান্তর' অফিসটা যে গভর্ণমেণ্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। * * * * দেবব্রত 'যুগান্তরে'র সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগল-

দের সংসারে গৃহিণীবিশেষ। বারীন্দ্র তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। * * * পরে বারীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ভারত উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না। আমিও বাসা হইতে পুঁটলি পাঁটলা গুটাইয়া 'যুগান্তর' আফিসে আসিয়া বসিলাম।"

"কিছু দিন পর দেবব্রত 'নবশক্তি' আফিসে চলিয়া গেল। ভূপেনও পূর্ব্ব-বঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং 'যুগান্তর' সম্পাদনের ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। * * * হু হু করিয়া দিন দিন 'যুগান্তরে'র গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।

"ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্সে 'যুগান্তর' বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখনও কাহাকে দেখি নাই। কত টাকা আসিত, আর কত টাকা খরচ হইত, হিসাবও কেহ লইত না।

"একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, 'যুগান্তরে' যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কি রে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট্, গভর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা?"

'যুগান্তরে'র বহুল প্রচার বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'যুগান্তর' আফিস কানাই ধর লেনের বাড়ী হইতে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনে স্থানান্তরিত হয়। চাঁপাতলাই তার পুর্ণ শ্রীবৃদ্ধির কাল এবং ঐখানেই আরম্ভ হইল ঘন ঘন পুলিশের হানা, অনুসন্ধান ও সম্পাদক গ্রেপ্তার। কেশব গুপ্ত নামক একজন পরম উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন; উত্তর কলিকাতায় কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস নামে তাঁহার মামার ছিল একটি বড় প্রেস। এইখানেই 'যুগান্তর' দলের অনেক কাজ হইত। কেশবের মামার নিকট হইতে হ্যাণ্ড-প্রেসটি ক্রয় করিয়া সুমতি প্রেস নামে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনে বসানো হয়। এই জন্য কেশব

প্রিন্টিং পরে পুলিশের হস্তে নির্য্যাতিত হয়। মানিকতলা বোমার মামলার সময় কেশব গুপ্ত আত্মগোপন করে। নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় তিনি খৃশ্চান ধর্ম্ম লইয়া পাদরী বেশে পাহাড়ীদের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা উৎসবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

'যুগান্তর' পত্রিকার আদর্শ ছিল—মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালীকে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা। তজ্জন্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ব, রাজনীতিক সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ, ইউরোপে কি প্রকারে রণনীতি শিক্ষা প্রদান করা হয় সেই বিষয়ে নানা পুস্তক হইতে আলোচনা, বৈদেশিক সংবাদ সমূহ ইত্যাদি নানা প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হহতে থাকে। এই পত্রিকার সর্ব্বোচ্চ সুর ছিল আত্মনির্ভরশীলতা। তখনকার লোকসমাজে প্রচলিত নাসিকা ক্রন্দনের সুর পরিত্যাগ করিয়া 'যুগান্তর' গুরুগম্ভীর স্বরে বলিত, "মা ক্লৈব্যং গমঃ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" 'যুগান্তর' ছিল ঐতেরেয় ব্রাহ্মণোক্ত "চরৈবেতি" মন্ত্রের উপাসক। পরাজিত মনস্তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী যাহাতে আক্রমণশীল মনস্তত্ব পায় তাহার জন্যই ছিল 'যুগান্তরে'র সাধনা।

যুগান্তরের প্রকাশিত অগ্নিস্রাবী লেখনীর অনুপম ভাষা ও টঙ্কার আজ কালের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও সরকারী নথীপত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্বের স্বাধীনতাকামীদের মনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কার্য্য করিবে। ১৯০৭ সালের ১১ই এপ্রিল "এসো অরাজকতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধে বলা হয় —"অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি —ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।...ইংরাজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে। তা'হলে শাসক শক্তির সঙ্গে কার্য্যতঃ সংঘর্ষ বাধলে বিপ্লবীরা এই সৈন্যদের বিদ্রোহীদলে শুধু যে পাবে তা নয়, শাসক প্রদত্ত তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।"

এই সকল লেখাতে প্রমাণিত হয় 'যুগান্তর' কি প্রকার প্রকাশ্য ভাবেই বিপ্লবের বীজ দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইতেছিল। দেশে বিপ্লবের জন্য কি ভাবে

অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা করিয়া বিস্ফোরক তৈয়ারী করা যায়। ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্টের 'যুগান্তরে' দেবব্রত বসু 'যোগাক্ষ্যাপার' ছদ্মনামে এক পত্রে লেখেন—"আর এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুশীয় বিপ্লবে দেখা গেছে—রুশ সম্রাট্ জারের সৈন্য দলে বহু বিপ্লবী অনুরাগী লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া এই সব সৈন্য বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও এই নীতি সুফল প্রসব করেছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশী হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা; কারণ বিদেশী শাসককে দেশবাসীর মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়।

"সম্পাদক ভায়া আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে, যদি অন্ততঃ সপ্তায় ১৫,০০০ সংখ্যা বিকায় তা' হ'লে মাসে ৬০,০০০ তা লোক পড়ছে। এই ষাট হাজার পাঠককে গুটি কতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে লেখনী ধারণ করছি। আমি পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপছে ভরে ওঠে যখন আমি চারিদিকে অরাজকতা দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মূক হ'য়ে থাকতে পারি নে। চারি দিকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি—যেন ভাবী গরিলা যোদ্ধার দল অর্থ লুণ্ঠনে লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হ'য়ে গেছে ঐ লুটতরাজের আকারে।…হে লুণ্ঠন, আমি তোমায় পূজা করি আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্প কীটের মত গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় ক'রে আনছিলে। এখন এসো সর্ব্বত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্র-বীর্য্য মানুষের বুকে। তুমি সেদিন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণ কৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমাকে পূজা করি।"

'যুগান্তরে' উগ্রপন্থী ও প্রবন্ধ লেখা ক্রমান্বয়ে বাহির হইবার ফলে পর পর রাজদ্রোহের মামলার ধুম পড়িয়া গেল। একে একে অনেকেই রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেন। তখন বারীন্দ্রকুমার বলিলেন, "এরূপ

বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই, বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। এত দিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে দেখাইতে হইবে। ১৯০৭ সালে আগষ্ট মাসে আমরা নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের তরুণ দলের হাতে 'যুগান্তর' পরিচালনার ভার দিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের কার্য্যকরী আয়োজন ও ব্যবস্থার জন্য মুরারিপুকুর বাগানে গোপন-চক্র রচনা করিয়া বসি।"

'যুগান্তর' যখন পাঁচ মাসের তখন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও হরিদাস হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় দৈনিক ইংরাজি 'বন্দে মাতরম' বাহির হয়। এই 'বন্দে মাতরমে'র স্তম্ভে বারীন্দ্রকুমার ও যুগান্তরে'র কর্ম্মীদল 'যুগান্তর' ত্যাগের ঘোষণা করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে 'যুগান্তর' দেশের ভাবী সংগ্রামে দেশবাসীকে চরম আত্মাহুতির আহ্বান জানাইয়া আবেগপূর্ণ একটি কবিতায় বলা হয় :—

"সেদিনের তরে করলি কি ?
যেদিন আসবে আহ্বান ওরে সন্তান,
চাইবে মা পূজার বলি।
পথঘাট সব রাখিস্ চিনে
বলির পাঁঠা রাখিস্ গুনে
হাঁকফাঁক করে মরতে যেন হয় নারে সেদিন !
ওরে লুটতরাজে নানান কাজে শক্ত করিস্ বুক,
নইলে কাঁপবে হাত, হবি চিৎপাত ধরিলে বন্দুক।"

বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পরে উক্ত পত্রিকায় যে কবিতাটি বাহির হয় তাহা বিপ্লব সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদরূপে সর্ব্বকালের জন্য পরিগণিত হইবে।

"না হতে মা বোধন তোর
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,

জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার
আবার পূজিব চরণ তট।
ঐ বিল্বদল র'য়েছে পড়িয়া
পূজার ফুল যায় মা শুকাইয়া,
জাগো মা জাগো মা সময় নিকট
রক্তাম্বুধি করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।"

'যুগান্তরে'র শেষ পর্য্যায়ে কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন তারানাথ রায়চোধুরী। এই পত্রিকার শেষ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'যুগান্তর' হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে আমারই ডাক পড়িল, 'যুগান্তরে'র ভার গ্রহণ করিতে। আমি কিন্তু ঐ দায়িত্ব লইতে রাজী ছিলাম না। * * * উপায়ান্তর না দেখিয়া কতকগুলি সর্ত্তে 'যুগান্তরে'র ভার গ্রহণ করিলাম। কাগজের ভার গ্রহণ করিয়া ২৮ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের দরজা খুলিলাম ; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হ্যারিসন রোড পোষ্ট অফিসে 'যুগান্তরে'র নামে বহু সহস্র টাকা আসিয়া পড়িয়া আছে। উক্ত টাকা যাহাতে কাহাকেও না দেওয়া হয় পুলিশ সতর্ক ও গোপনে পোষ্ট অফিসের কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ ভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাইলাম। তখন ঐ বিভাগের পোষ্টাল ইনস্পেক্টার ছিলেন নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি 'যুগান্তরে'র কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে আমায় টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন, আমি দস্তখত করিয়া টাকা গ্রহণ করিলাম এবং ৭৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'যুগান্তর' অফিস তুলিয়া আনিলাম এবং পানিহাটির ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ভায়াকে তখন প্রিণ্টার ও পাবলিশার করিয়া 'যুগান্তর' প্রকাশ করিলাম। মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তখন সুমতি প্রেস—ঐ প্রেস 'যুগান্তরে'রই ছিল। নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রেস ম্যানেজার ও পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন।

"যুগান্তরে'র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে লেখক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষীরোদ চন্দ্র গাঙ্গুলী, নারায়ণ চন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ছিলেন। আমারই লেখা প্রবন্ধের জন্য বৈকুণ্ঠ আচার্য্য, ফণীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দীর্ঘ

দিনের জন্য কারাগারে গমন করেন। 'যুগান্তর' যেমন একটা বিশাল ভাব-ধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিল, তেমনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে আমার পলায়নের পর হইতেই 'যুগান্তর' চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর দুই-চারি দিন বেনামী 'যুগান্তর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না।"

'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরে'র সমসাময়িক সময়েই 'বন্দে মাতরমে'র জন্ম হয় ৭ই আগষ্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। তখনও অরবিন্দ বরোদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বাংলা দেশে আসেন নাই। 'বন্দে মাতরম্' প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায়। কালী-ঘাটের হরিদাস হালদার এই প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রণী। তাঁহার দেওয়া ৫০০৲ টাকা লইয়া বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে এই দৈনিকের জন্ম। পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার পর সুবোধ চন্দ্র মল্লিক মহাশয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন এবং বরোদার চাকুরী পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে অরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধী লেখার জন্য পত্রিকার পরিচালকদের সহিত মতভেদের ফলে ১৮ই অক্টোবর বিপিন চন্দ্রের নাম সম্পাদক হিসাবে বাতিল করা হয়। পরে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত পুনরায় প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল পরিচালনা করেন। তখন বিপ্লবমুখী বাংলার প্রাণকেন্দ্রে ভাবী নেতারূপ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। দৈনিক 'বন্দে মাতরমে'র স্বল্পকাল পরমায়ু দুই মাস ও তিন সপ্তাহ। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী।

বন্দেমাতরম্

এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ দেশের তরুণদের জাতিসেবায় আহ্বান করিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে নূতন রাজনৈতিক দল গড়িয়া মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক কর্ত্তৃক গঠিত দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। এই দলই পরে

চরম পন্থী দল নামে পরিচিত হয়। "বন্দেমাতরমকেই" দলের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয় শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শে। এই উদ্দেশ্যে যে কোম্পানী গঠিত হইল, তিনিই তাহার ভার গ্রহণ করিলেন, কারণ বিপিনচন্দ্র তখন প্রচার উদ্দেশ্যে বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরিতেছিলেন।

অচিরে 'বন্দেমাতরম' ভারতে সংবাদপত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিল। 'বন্দেমাতরমের' লেখা পড়িয়া শুধু যে দেশের লোক তারিফ করিল তাহা নয়। জাতির ধমনীতে নবরক্ত প্রবাহিত করিল।

'বন্দেমাতরম' যেমন একদিকে ওজঃস্বিনী ভাষায় লেখা হইত অপরদিকে তেমনি ইহা আইনের নাগপাশ অতি সুকৌশলে এড়াইয়া চলিত। এই কারণে এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির গাত্রদাহের অন্ত ছিল না।

৩০শে আগষ্ট 'বন্দেমাতরম্' 'Loyalty and Disloyalty in East Bengal'—শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন, "আমাদের সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত প্রেম ও শ্রদ্ধা এখন ভারতবাসীর অন্তরে আর নাই, বিশেষতঃ বিদেশী রাজার প্রতি। কপট বা ঝুটা রাজভক্তি শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে কিন্তু সুবিধাজনক। দান, দয়া, দাক্ষিণ্যের মত ইহা বহু পাপ গোপন করিবার কাজে লাগে। কপট ছাড়া অকৃত্তিম রাজভক্তি আজ আর কোন কালো আদমীর অন্তরে নাই। থাকে কি করিয়া? এদেশে একজন নিগ্রো বা জুলু নির্ব্বিবাদে অস্ত্র রাখিতে পারে। পারে না শুধু এদেশের মানুষ। ভারতবাসীর অন্তরে রাজভক্তি ও রাজদ্বেষ এই দুইটি সক্রিয় গুণের একটিও আর নাই। আছে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য, নিছক তামস আলস্য ও মন্দ অদৃষ্টের দোহাই। তাহাদের বিদেশী প্রভুর প্রতি ও সকল কাজে ভারতবাসীর আছে দেখা যায় নিষ্ক্রিয় উদাস সম্মতি। মোটের উপর ইহাই বিদেশী রাজার প্রতি ভারতবাসীর মনোভাব।"

এই সময় জামালপুরের হাঙ্গামা সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম' লেখেন যে, "ইংরাজের মনস্তুষ্টির জন্য কংগ্রেস তোষণনীতির ধ্বজা তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে উড়াইতেছেন। তাঁহাদের এই কাঙ্গাল বৃত্তি ত্যাগ করিয়া এতদিনে বোঝা

উচিত যে দেশ এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পিছু হটিতে পারে না বা থামিতে পারে না, এখন অগ্রগতি ছাড়া আর কোন উপায় নাই।"

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্ত্তিত 'বন্দেমাতরম্' এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। 'যুগান্তরের' মত সশস্ত্র বিপ্লব নগ্নভাবে প্রচার না করিলেও নরম দলের দাসসুলভ ইংরাজ তোষণ ও ভিক্ষোপজীবী রাজনীতি পন্থাকে খণ্ডন ও তিরস্কার করিয়া 'বন্দেমাতরম্' বাংলাদেশে বিদেশী রাজশক্তির প্রতি ঘৃণা ও জাতীয়তাবোধকে উগ্র করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই একটি লেখার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে সম্পাদকরূপে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি যে সম্পাদক তাহা প্রমাণিত হইল না, কারণ বিপিনচন্দ্র সহকর্ম্মীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন; ফলে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুরও ছয় মাস জেল হয়। তখনকার দিনে সম্পাদকের নাম কাগজে প্রকাশ করা হইত না। এই মামলার ফলে যেমন শ্রীঅরবিন্দের নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, তেমনি 'বন্দেমাতরম্' পড়িবার আগ্রহও লোকেদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইল।

ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া যেদিন বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেদিন কলিকাতাবাসী তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানায়। জনাকীর্ণ হাওড়া ব্রীজে সেদিন বৈপ্লবিক ইস্তাহার "Now or Never" প্রকাশ্যে বিতরিত হয়। এই ক্ষুদ্র ইস্তাহারটি গোপনে সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হয়। ইহার মুদ্রণ ও বিতরণে নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের সহায়তা করিয়াছিলেন প্রভাসচন্দ্র দেব এবং তিনিই ইহার বিতরণের ভার গ্রহণ করেন।

বিপিনচন্দ্রের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের যে আদর্শগত বিরোধ ছিল তাহার কারণ এই যে, বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন নূতন (জাতীয়) দলের আদর্শ হইতেছে ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বমুক্ত পূর্ণস্বায়ত্বশাসন। মধ্যপন্থীদলের (তখনকার কংগ্রেসের) আদর্শ ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন।

বিপ্লবীদল বলিলেন যে, বিপিনচন্দ্রের নীতি কূট ব্যাখ্যাদ্বারা মধ্যপন্থী নীতির অন্তর্ভুক্ত বলা চলে, কারণ তখনকার দিনেও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি

বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বমুক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী দলের, তথা বিপ্লবী দলের যুক্তি ছিল এই যে, জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত না করিলে সত্য জাতীয় জাগরণ ঘটিবে না।

দাদভাই নওরোজি 'স্বরাজ'কে জাতীয় আদর্শ বলেন, কিন্তু কংগ্রেস 'স্বরাজ' অর্থে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করাও বাতুলতা মনে করিতেন। অপর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ 'স্বরাজ' অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা—এই আদর্শই 'বন্দেমাতরমের' মারফৎ দেশবাসীর নিকট প্রচার করেন। দেশ যে শুধু ইহার অভিনবত্বে আকৃষ্ট হইল তাহা নয়, ইহা ঐশী মন্ত্রের মত কার্য্য করিল—জাতি যেন নবজন্ম গ্রহণ করিল।

## সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা

১৯০৭-৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু বিচিত্র ব্যাপার দেখা দেয়। কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতিকূলতা এবং উদ্যত-খড়্গ বৈদেশিক রক্তচক্ষু এড়াইয়া অগ্নি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন তাহাদের সংগঠন দক্ষতার পরিচায়ক, অন্য দিকে তেমনই উহা আমাদের অন্তরে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিপ্লবীদের কর্ম্ম প্রচেষ্টা নির্য্যাতনের দ্বারা ব্যাহত করিবার জন্য সরকার এই সময় অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বৎসরের প্রথমে জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ভাবে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অফিস। সেবাকার্য্যে যোগদানেচ্ছু যুবকের দল দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখাইতে আসিত। এই নাম-গ্রহণ-কার্য্যের ভার প্রভাসচন্দ্র দেব, অমরেন্দ্রনাথ বসু ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে যাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা ও শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাওয়া যাইত, তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি জাগাইবার প্রয়াস পাইতেন—প্রভাসচন্দ্র দেব, কার্ত্তিক চন্দ্র ধর ও পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। ইঁহারা যে সমস্ত তরুণকে বিপ্লবী দলে ভিড়াইতে

সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা

সমর্থ হন তাঁহাদের মধ্যে যেমন কয়েকটি তরুণ পরবর্তী কালে বিপ্লবী দলের রত্ন হইয়াছিল, তেমনই দলবৃদ্ধির আগ্রহে বিশেষ সুপরীক্ষিত যুবক না গ্রহণ করার ফলে কয়েকটি আগাছাও আসিয়া জোটে। ইহার ফল পরে অত্যন্ত খারাপ হয়। এই সকল সংগৃহীত তরুণদের মধ্যে দুই জন পরে রাজসাক্ষী হয়।

প্রকৃত পক্ষে মানিকতলার বাগানের সমিতির উদ্বোধন হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। বাগানবাড়ী বারীন্দ্রের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সম্পত্তি ছিল। উপযুক্ত দলীল সম্পাদন করিয়া বারীন্দ্র এই স্থানটিই সমিতির জন্য নির্দ্ধারিত করেন। স্থির হয় এখানে শরীরচর্চ্চা ধর্ম্মচর্চ্চা এবং রাজনৈতিক শিক্ষাদান করা হইবে। বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য যাঁহারা এই সমিতিতে যোগদান করিতেন তাঁহাদিগকে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হইত। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী তাঁহারা একটি বিভাগে এবং যাঁহারা ধর্ম্ম বিশেষ পছন্দ করিতেন না, অথচ বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে একটি দলে রাখা হইত। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা এই বাগানে থাকিতেন এবং উপেন্দ্রনাথের নিকট রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। ইঁহারাই প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

মাণিকতলার বাগান

উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাগানের মধ্যেই বিপ্লবীরা থাকিতেন। উক্ত বাগানের বর্ণনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বলেন, "মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল, তখন সেখানে চার-পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা-বাপদের কাছ হইতেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ত চাই। দু'-এক জন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, আর স্থির হইল যে, বাগানে শাকসব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকি খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁঠালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলো জমা দিয়াও কোন্ না দু'-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—

ভাতের উপর ডাল, আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই-চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীন তখন ঘোর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটি পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং বাগানের খরচ কতকটা কমিয়া গেল।"

সেই সময় উদ্যোগ পর্ব্বের অঙ্গ হিসাবে প্রকাশ্যে বিপ্লব মন্ত্র প্রচার বিপ্লবীদের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত হয়। "মুক্তি কোন্ পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" পুস্তক দুইটি যুবকদের মধ্যে সেই সময় বিপ্লব প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে।

'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয় যাহা পুস্তকাকারে সংকলিত করিয়া "মুক্তি কোন্ পথে" নামে বাহির হয়, উহা দেশকে সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেয় কোন্ পথে বিপ্লবায়োজনের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, কি করিয়া শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে ভাবি গোরিলা দলগুলিকে, কি করিয়া বিদেশী অর্থে পুষ্ট দেশীয় সিপাহীদের মনে উপ্ত করিয়া দিতে হইবে ফিরিঙ্গী বিদ্বেষ ও জ্বলন্ত দেশানুরাগ, কি প্রকারে করিতে হইবে আবশ্যকীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ ও নির্ম্মাণ। বিপ্লবায়োজনে আদিপর্ব্বে চাঁদা ও দানের টাকায় হয়তো কাজ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করিবে তখন দেশেরই কল্যাণে দেশহিত পরাঙ্মুখ অলস ধনীদের অর্থ বলপ্রয়োগে গ্রহণ করিয়া এবং ক্রমশঃ অরাজকতা বৃদ্ধির অবসরে বিদেশী শাসকের রাজস্ব ও কোষাগার লুণ্ঠন দ্বারা বিপ্লবীর ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

এই পুস্তক প্রকাশ্যভাবে প্রচার করে যে, শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্য পেশী-বহুল সবল দেহ আবশ্যক করে না; এই সব কাজের অস্ত্র সুকৌশলে নানা উপায়ে এমন কি বিদেশ হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গুপ্ত স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে বিদেশে গিয়া বিস্ফোরক ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়া আসিতে হইবে। ইংরাজের-বেতন ভোগী সৈনিকরাও মানুষ—তাহাদেরও হৃদয়ে ভাব আছে, মনে বোধশক্তি আছে। তাহারাও রক্ত

মাংসের মানুষ। দেশের দুর্গতি ও বন্ধন জনিত দৈন্ত-দারিদ্র তাহদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের অন্তরেও দেশানুরাগের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে।

এই পুস্তক ছাড়াও 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি ছোট ছোট পুস্তিকাকারে "মুক্তি কোন্ পথে" গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইত।

বারীন্দ্রকুমার "Cassel's Russo Japanese War" নামক পুস্তক হইতে যুদ্ধনীতি সংগ্রহ করিয়া "বর্ত্তমান রণনীতি", 'যুগান্তর' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে লিখিতেন। উহাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বিপ্লব মন্ত্রের এই প্রকাশ্য প্রচারে তরুণের দল 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে আসিয়া খোঁজ লইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ চলিতে লাগিল। বারীন্দ্রকুমার যখন এইভাবে দশ-পনেরটি যুবক সংগ্রহ করিয়াছেন তখন উল্লাসকর দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে। উল্লাস একাকী নিজ গৃহে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া বোমা প্রস্তুত ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উল্লাসের এই নিজস্ব প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে চাপেকার সংঘ নিরপেক্ষ ভাবেই তিনি বৈপ্লবিক সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। উল্লাসকরের সন্ধানের পূর্ব্বে বারীন্দ্রের দল বোম্বাই অঞ্চলের যোশী ও কুলকর্ণী নামে দুই জন যুবকের সহায়তায় বোম্বাই হইতে বোমা আনিবার জন্ত চেষ্টা করেন। যোশী কিছু টাকা লইয়া নিরুদ্দেশ হয়। কুলকর্ণী নিজেকে তিলকের ভাগিনেয় এই মিথ্যা পরিচয়ে আসর জমাইয়াছে টের পাওয়াতে কুলকর্ণীর প্রতি যুগান্তর দল বিশ্বাস হারায়।

উল্লাসকর ছিলেন শিবপুর কলেজের অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র। বরাবরই তাঁহার বেপরোয়া ভাব। ১৯০৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে গিয়া দেখিতে পান পুলিশ ভিড় সরাইবার জন্ত বেপরোয়া লাঠি চালাইতেছে। পুলিশের এই আচরণ অসহ্য হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করেন। ফলে উল্লাস-করের পিঠে ছড়ি ও ঘুষি বর্ষিত হইল এবং পুলিশ তাঁহাকে থানায় লইয়া

উল্লাসকর দত্ত

যায়। সেখানে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস জামিন দিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং ঔষধ দিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান করেন এবং তথায় পুলিশের যে নির্ম্মম অত্যাচার চলে তাহাতে তাঁহার তরুণ মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রবলের এই অত্যাচারের ফলে উল্লাসকরের জীবনের ঘটনার স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। এই ঘটনার পর বোমা ও রিভলবারের প্রতি তাঁহার আগ্রহ বাড়িয়া যায়; ফ্রান্স হইতে হেমচন্দ্র দাস ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই উল্লাসকর নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইলেন। যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সহপাঠী রাসবিহারী বসুও তখন ঐ কলেজে পড়িতেন, সেই হেতু প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগার হইতে অনেক সাহায্য পাইলেন। এইরূপে কিছুদিন পরীক্ষা করার পর তিনি বোমা আবিষ্কার করেন।

ভারতে প্রথম "বোমা" তৈয়ারী করা সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, "একটি বি, এস সি পাশ যুবকই বাঙ্গলায় আমাদের অনুরোধে প্রথমে 'বোমা' তৈয়ারী করেন। ইঁহার নাম বিভূতি চক্রবর্ত্তী, নদীয়া জেলায় বাস।" ইনি আত্মোন্নতি সমিতির নিবারণ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিস্ফোরণ রসায়ন শিক্ষা করিতেন।" 'যুগান্তর' অফিসে তাঁহাকে বারীন্দ্র ও আমি এক দিন বলি "—বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা মজুদ আছে কিন্তু বোমা প্রস্তুতকারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছে না।" এই কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন কেমিষ্ট। পরদিন তিনি বারীন্দ্রকে আসিয়া বলেন, "আমি বোমা প্রস্তুত করিতে রাজী আছি, কিন্তু ভূপেন প্রভৃতি কেহই যেন ইহা না জানিতে পারে।" খরচার জন্য প্রথমে ভবানীপুরের যোগেশচন্দ্র ঘোষ ১০০৲ টাকা দান করেন। বারীন্দ্র যখন তাঁহাকে একদিন বলেন, "টাকার অভাবে বোমা নির্ম্মাণের কার্য্য হইতেছে না, তখন তিনি বলেন, আমার হাতে এক শত টাকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া নেবেন কি?" এ কথা এখানে উল্লেখ করা হইল,

ভারতের প্রথম বোমা

কারণ কর্ম্মীদের মনে তৎকালে কর্ম্মে কি প্রকারের আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, তাহা এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

"বোমাটি দক্ষিণ কলিকাতায় যোগেশ বাবুর ভ্রাতার ডাক্তারখানায় প্রস্তুত হয় এবং আবরণটি যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের শিষ্য—একজন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঝামাপুকুরের কলাইয়ের কারখানায় তৈয়ারী হয়। অনেকগুলি আবরণ (shell) প্রস্তুত হইয়াছিল।...এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র, পরে হেমচন্দ্র দাস লাট ফুলারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। বোমা নির্ম্মাণের বাকী আবরণগুলি 'যুগান্তর' অফিসে কিছু দিন থাকে। অবশেষে আমি স্বগৃহে আনি। আমার জেল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়াবাসী এক সভ্য দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, এক পুকুরে এইগুলি ডুবাইয়া রাখিবেন।

"এক্ষণে, আসল বোমাটি কোথায় গেল? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হেমচন্দ্র দাস ও প্রফুল্ল চাকী আমার বাড়ী আসিয়া বলিয়া গেলেন, 'দাদা পালিয়েছে' (অর্থাৎ ফুলারের নাগাল পাওয়া গেল না)। বোমাটি তাঁহারা সঙ্গে করিয়াই কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আমার ধারণা ছিল, উক্ত দ্রব্যটিও নদীয়া জেলায় আমি পাঠাইয়া দিই; কিন্তু হেমচন্দ্র বলিতেছেন উক্ত বোমা মেদিনীপুরে নীত হয় এবং পরে তথাকার একটি পুকুরে নিমজ্জিত করা হয়। ইহাই হইতেছে বাংলার বোমা আবির্ভাবের আসল সত্য তথ্য।"

উল্লাসকর বিপ্লব সমিতিতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলে মাণিকতলা বাগানবাড়ীতে একটি ছোটখাট বোমা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় এবং উল্লাসকরের সহকারী হিসাবে বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সরকার ও প্রফুল্ল চাকী যোগদান করেন।

বোমার প্রথম পরীক্ষা

উল্লাসকরের বোমা পরীক্ষার জন্য বারীন্দ্রকুমার, বিভূতি সরকার, উল্লাসকর ও রংপুর বিপ্লব কেন্দ্রের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে লইয়া দেওঘরে রোহিণী পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে প্রফুল্ল বোমাটি নিক্ষেপ করার ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নিকটে রহিলেন

উল্লাসকর। বোমাটি দড়ির সাহায্যে পাহাড়ের নীচের দিকে অনেকদূরে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু ফাটিয়া সেখানকার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল, ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উল্লাসকরও বিশেষভাবে আহত হন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কাজেই ইহারা প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর শবদেহ সেখানে রাখিয়া উল্লাসকরের শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন। উল্লাসকর অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহার উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইল। এখন তিনি অধিক পরিমাণে বোমা প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বোমার উপাদান দেশবিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই উপাদান সংগ্রহ করা যুবকদের প্রধান কার্য্যে পরিণত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর পিতা ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনায় তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানাইলে তিনি পুত্রশোকে বিচলিত না হইয়া "তাঁহার একমাত্র পুত্র মণিকেও (সুরেশচন্দ্রের ডাক নাম) মায়ের কাজের জন্য দিলেন।" এই সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "রংপুরে আমাদের সমিতির একটি ঘাঁটি ছিল। সেখানকার পেস্কার ঈশান চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'আমি একে একে দেশের জন্য আমার সবগুলি ছেলে দেব, মাতৃপূজায় তোমরা বলি দিও।' প্রফুল্লর মৃত্যু সংবাদ ঈশানচন্দ্রকে জানান হইলে তিনি লিখিলেন—'বেশ, এবার আমার আর একটি ছেলেকে পাঠালাম, মাতৃপূজায় উৎসর্গ করো।' এল সুরেশ চক্রবর্ত্তী—মণি। সুরেশ চক্রবর্ত্তী পরে পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করেন।"

সমিতির অন্যতম স্তম্ভ হেমচন্দ্র দাস কানুনগো স্বেচ্ছায় নিজের বিষয় বিক্রয় করিয়া প্যারীতে গিয়া বিস্ফোরক বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। এই বিষয়ে বর্ম্মা নামক একজন পাঞ্জাববাসী ও ব্যারিষ্টার রাণা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন।

তথায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার সাহায্যে হেমচন্দ্র বোমা প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতে থাকেন। এই কার্য্যে মির্জ্জা আব্বাস [ হায়দরাবাদ ] ও টি. এম. বাপাত [ বোম্বাই ] তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে কৃষ্ণবর্ম্মা দ্বারা নিযুক্ত হন। এই তিন জনের গোপন স্থানে থাকা, ল্যাবরেটারী চালান ইত্যাদির খরচার জন্য ক্রমে কৃষ্ণবর্ম্মা তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দেন। ইলেকটিক ড্রাই সেল যোগে কি প্রকারে ট্রেন ধ্বংস করা যাইতে পারে হেমচন্দ্র তাহাও শিক্ষা করেন।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

হেমচন্দ্র ফ্রান্স হইতে ফিরিলে মানিকতলা বাগান ভিন্ন ১৫নং গোপী মোহন দত্ত লেন, ৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, দেওঘরের শীলস্ লজ ও বানিয়াচঙ্গের সুশীল সেনেদের বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত হইত।

মহারাষ্ট্রীয় যুবক বাপাত ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই দলের সহিত যুক্ত হন। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রভাস চন্দ্র দেব ও ইন্দ্রনাথ নন্দীও বোমা প্রস্তুত শিখিয়াছিলেন। বোমার মামলায় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর বোমা প্রস্তুত-প্রণালীর বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি সাইক্লোষ্টাইল পুস্তক ও বিস্ফোরণের নানা রকম ফরমুলা আবিষ্কৃত হয় এবং চন্দ্রকান্ত ফেরার হন। পরে তিনি ইউরোপে ও মার্কিণ মুল্লুকে বিপ্লবীরূপে নানা কীর্ত্তি করার পর আবার দলের লোকের নিন্দা-ভাজন হন। বিপ্লব ইতিহাসের সে এক অন্য অধ্যায়।

সহসা বোমা বিস্ফোরণে ইন্দ্রনাথের একটি হাতের কব্জি উড়িয়া যায় এবং প্রভাস চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও হাত ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয়। এই দুর্ঘটনায় প্রভাস চন্দ্র পড়েন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, কেন না, বানিয়াচঙ্গে সুশীলের বাড়ীতে প্রভাস চন্দ্রকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীতে লিখিত একটি পোষ্ট-কার্ড আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে প্রভাসের মুখের ক্ষত শুকাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা ছিল এবং ১লা ফেব্রুয়ারী সুশীলকে কলিকাতার ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়া হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, প্রভাসের অঙ্গ দগ্ধ হইল কিরূপে?

ইঁহারা ব্যতীত সুশীল ও বারীন্দ্রও বোমা প্রস্তুতে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের মাতুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের

অধ্যাপক মহেন্দ্রদেবের নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। মহেন্দ্রবাবু পরে অরুণাচল আশ্রমে পুলিশ প্রবেশে বাধা দিবার সময় পুলিশের গুলীতে নিহত হন।

বোমা প্রস্তুত পূর্ণোদ্যমেই চলিতে লাগিল। ইহা ছাড়া অস্ত্র সংগ্রহে বারীন্দ্র মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুসারে এগারটি রিভলবার চারিটি রাইফেল এবং একটি বন্দুক তাঁহারা সংগ্রহ করেন। কলিকাতার চীনা নাবিকদের নিকট হইতেও রিভলবার কেনা চলে এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করিয়া দেন।

অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা

ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে সেই সময় কোন প্রকার অস্ত্র আইন ছিল না, সেই জন্য বারীন্দ্র ও অবিনাশ চন্দননগরনিবাসী বনবিহারী মণ্ডলের সহায়তায় কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক উকিলের এক মুহুরির মারফৎ ফ্রান্স হইতে রিভলবার আমদানীর ব্যবস্থা করেন। রাউলাট কমিটির এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "১৯০৭ সালে ফরাসী সরকারী অস্ত্রের কারখানা হইতে ৩৪টি রেজিষ্টার্ড পার্শ্বেল চন্দননগরে পাঠান হয়। ইহার মধ্যে ২২টি পার্শ্বেল কিশোরীমোহনের নামে আসে। এই ২২টি পার্শ্বেলের মধ্যে তিনি মাত্র ১৬টি খালাস করেন এবং ৬টি প্যাকেট কেহ খালাস করে নাই। পরবর্ত্তী মেলে ইহা প্রেরকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চন্দননগরে অস্ত্র আইন প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনাই উক্ত পার্শ্বেল ফেরত পাঠাইবার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। কিশোরীমোহনের নিকট পরেও এইপ্রকার পার্শ্বেল আসে। এই সম্পর্কে নিয়োজিত বিশেষ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অনুসন্ধান কালে দেখা যায়, উক্ত ৩৪টি পার্শ্বেলের ১৯টির মধ্যে রিভলবার ছিল। চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা কিশোরীমোহনকে ডাকাইয়া এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, প্রথমে তিনি অস্ত্রের বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া পরে বলেন, 'ঐ সকল প্যাকেট অস্ত্রপূর্ণ ছিল এবং সেগুলি বন্ধুবান্ধবকে দিয়াছেন। কিন্তু প্রাপকের নাম দিতে অস্বীকার করেন।' কিন্তু পরে জানা যায়, ঐসকল অস্ত্রের মধ্যে চারিটি রিভলবার বারীন ঘোষ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিক্রয় করা হয়। ইঁহাদের সেই সময় চন্দননগরে প্রায়ই যাতায়াত ছিল।"

ছাত্র ভাণ্ডার

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ ও জেলায় জেলায় 'ছাত্র ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের অন্তরালে বিপ্লবীদের ঘাঁটি স্থাপন করার প্রয়াস আরম্ভ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকা'য় সর্ব্বপ্রথম জেলায় জেলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইবার জন্ম সংঘবদ্ধভাবে প্রয়াস আরম্ভ করিতে তরুণ দলকে প্রকাশ্যভাবে আহ্বান করা হইল। সৃষ্টির মধ্যেই যে সংগ্রামের বীজ নিহিত আছে, জীবনের ধর্ম্মই যে যুদ্ধ—এরূপ তত্ত্ব সকল, সংখ্যার পর সংখ্যায় জোর করিয়া প্রচার চলিতে থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে বিপ্লবের সাহায্যের জন্ম অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিতে গিয়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাকাতি করাও যুক্তিসিদ্ধ এই তত্ত্ব 'যুগান্তর' প্রচার করেন। এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে যে সমস্ত ধনী যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট গুপ্ত সমিতির সংবাদ প্রদান করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলে। ময়মনসিংহের আচার্য্য পরিবার, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর, রাজা সুবোধ মল্লিক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেক ধনী ইহাদের গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

মানিকতলার দল ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। মেদিনীপুর ভিন্ন চন্দননগর, কৃষ্ণনগর, দেওঘর, শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ, রংপুর, বগুড়া, কটক প্রভৃতি অঞ্চলেও শাখা স্থাপিত হয়।

১৯০২ সালে মেদিনীপুরে যে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কর্ম্ম-চাঞ্চল্য এত দিনে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপ্লবের পীঠস্থান মেদিনীপুরে ১৯০২ সালের পূর্ব্বেও ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু ও তৎপরবর্ত্তী কোন কোন স্বদেশহিতৈষীর

মেদিনীপুর বিপ্লব কেন্দ্র

উদ্যোগে কয়েক বার গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার পরি-কল্পনা হয় কিন্তু তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সে সময় স্বাদেশিকতার ভাব বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্ম-পরিবার—বিশেষ করিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই স্বদেশী ব্রত তাঁহার পিতৃব্য হইতে

উত্তরাধিকার-সূত্রে বিশেষ ভাবেই লাভ করেন। ১৯০২ সালে বিপ্লবী সমিতির কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুরে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে কয় জনকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তন্মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম।

দীক্ষা গ্রহণান্তে মেদিনীপুর মিঞাবাজারের এক বাড়ী লইয়া কুস্তির একটা আখড়া খোলা হয়। সেখানে বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, অসিশিক্ষা, সাইকেল-অভ্যাস, অশ্বারোহণ, বক্সিং ও বন্দুক-চালনার শিক্ষা হইতে থাকে। অশ্বারোহণ শিক্ষার জন্য একটি অশ্বও ক্রয় করা হয়। সমিতির পক্ষ হইতে রহিম নামে এক লাঠিয়ালকে লাঠি, তরবারি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে, শহরের অনতিদূরে চারিদিক ঘেরা একটি নীচু জায়গা ছিল। রাস্তার জন্য কাঁকর তুলিয়া লওয়ায় ঐ স্থানটি গোপনে চাঁদমারি শিক্ষা করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হইয়া উঠে।

এই সমিতির উদ্বোধনের দিন ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত থাকেন এবং যুবক সভ্যদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে তিনি যোগদান করেন। এই শাখার মজঃফপুর হত্যাকাণ্ডের আসামী বলিয়া দণ্ডিত ক্ষুদিরাম বসু প্রথম বিপ্লবী হিসাবে ধরা পড়েন। সত্যেন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র সেন মেদিনীপুরের দলের লোক হইয়াও কলিকাতার মাণিকতলা বাগান তল্লাসীর সময় তথায় উপস্থিত থাকাতে ধরা পড়েন। রংপুর শাখার কর্ত্তা ছিলেন ঈশান চক্রবর্ত্তী ; বগুড়া শাখার নেতা হন যতীন্দ্রনাথ রায়। ইনিই প্রফুল্ল চাকীকে আবিষ্কার করেন। কটক শাখার নেতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বেদান্তবাগীশ) ও সহকারী ছিলেন বিশ্বনাথ কর্। উড়িষ্যার প্রধান নেতা ছিলেন ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক।

যুগান্তর ভিন্ন অন্য দলগুলি যে বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল এবং অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় মুসলিম বিরোধিতা উগ্র হইয়া যখন ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে দাঙ্গা বাধে, তখন আত্মোন্নতি

সমিতির বিপিন গাঙ্গুলী চাঁদপুরে গুলি চালনার দায়ে এবং উক্ত দলের ইন্দ্রনাথ নন্দী জামালপুরে রিভলভার সমেত ধরা পড়েন।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যার্থ শ্রীঅরবিন্দ ২০০৲ টাকা দিয়া ইন্দ্রনাথ নন্দীকে জামালপুরে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রনাথের সহিত সুধীর সরকার, নরেন বসু, শিশির ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দে, হরিশ সিকদার প্রভৃতি আরও ছয়জন উক্ত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন। প্রভাস ও হরিশ ময়মনসিংহ সহরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ ও অপর কয়েকজন সঙ্গীসহ গুলী চালনার দায়ে রিভলবার সমেত গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ ১৮বার গুলীবর্ষণ করেন। জামালপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাক্তার বিপ্লবীদলের লোক ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় উক্ত মামলা খারিজ হইয়া যায়, পুলিশ সেই সময় ২৭ জন লোককে দাঁড় করাইয়াও সনাক্ত করিতে পারিল না। তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করেন।

১৯০৭-৮ সালে বিপ্লবীগণ গুপ্তহত্যার চেষ্টায় বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠেন। নির্য্যাতনকারী রাজপুরুষদের দণ্ড বিধান করাই ছিল এই সকল প্রচেষ্টার মূল। ১৯০৮ সালের ৩০শে আগষ্ট এ-সম্পর্কে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এক পত্রে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত ও নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়।"

বাংলার লেঃ গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টায় ১৯০৭ সালে বাংলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম বোমার আবির্ভাব হয়। তাহার পূর্ব্বে ১৯০৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাধিক বার বিপ্লবীরা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী গভর্ণর ফুলারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

১৯০৭ সালে যুগান্তর দলের নেতারা স্থির করেন বাংলার ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে বধ করিতে হইবে কারণ তিনি লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রয়াসের পিছনে অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। বিজয়া দশমীর পরদিন শ্রীঅরবিন্দের আদেশে যুগান্তর দলের অন্যতম কর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ বসু প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটকে বধ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং সহরে গমন করেন। প্রফুল্ল তখন মুরারীপুকুরের বাগানে থাকিতেন। দার্জ্জিলিং গিয়া যতীন্দ্রনাথ অবসর প্রাপ্ত আই, সি, এস চারুচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে উঠেন। প্রফুল্ল রহিল অন্য স্থলে। কয়েক দিন চেষ্টা করার পর তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, সেখানে ছোটলাটকে হত্যা করা সম্ভব নয়। বেশ সুরক্ষিতভাবে ছোটলাট চলা ফেরা করেন। তাঁহার যাতায়াতের সময় নিকটে সশস্ত্র প্রহরী ব্যতীত অন্য লোকের যাওয়ার কোনও সুযোগ-সুবিধা নাই। তাঁহারা উভয়েই বিফল-মনোরথ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

এণ্ড্রু ফ্রেজার হত্যা প্রচেষ্টা

বোমার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া ছোটলাটকে হত্যা করার সক্রিয় চেষ্টা হয় প্রথম ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে। এই প্রথম অভিযাত্রী দলের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর ও বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামী। কিন্তু চন্দনদগরে পৌঁছাইয়া ঠিক হয় যে, উল্লাস একাকী লাইনের উপর বোমা পাতিবে। ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজার তখন রাঁচি যাইতে-ছিলেন। স্পেশ্যাল ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া উল্লাস পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত স্থানে যখন বোমা স্থাপন করিবেন, তখন সহসা সেই স্থানে কতকগুলি লোক আসিয়া পড়াতে উল্লাস আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এমন সময় ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বোমা স্থাপন না করিতে পারিয়া সেই লাইনের উপর কয়েকটি কার্ত্তুজ রাখিয়া তিনি সরিয়া আসেন। সশব্দে সামান্য একটু বিস্ফোরণ হয় কিন্তু ট্রেণের কোনই ক্ষতি হয় না।

তাহার অল্প কয়েক দিন পরে আবার ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংস করিবার মতলবে উল্লাস, বারীন্দ্র, বিভূতি সরকার ও প্রফুল্ল চাকী চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর

মধ্যবর্ত্তী একস্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বোমা স্থাপন করেন। তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, সেই দিন ছোটলাট ঐ পথে আসিবেন কিন্তু লাটসাহেব ঐ পথে না আসায় এ যাত্রাও তাঁহারা বিফল হন।

৬ই ডিসেম্বর ছোটলাটকে তৃতীয় বার হত্যা-প্রচেষ্টার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বারীন্দ্র কুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "তৃতীয় বার ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টায় আমরা খড়গপুর যাই। চন্দননগরে দ্বিতীয় বারের যাত্রার সঙ্গী তিনজনও গমন করিয়াছিলেন। আমরা বেলা দশটার সময়ে ট্রেণ হইতে খড়গপুরে অবতরণ করি। বৈকালে আর একটি ট্রেণে চড়িয়া আমরা নারায়ণগড় অভিমুখে যাত্রা করি। সেখানে রেললাইন বরাবর যে সড়ক গিয়াছে, সেই সড়কের ধারে আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি, রাত্রি হইলে অন্ধকারের সুযোগ লইয়া আমরা লাইনে আসিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

নারায়ণগড়ের অভিযান

নারায়ণগড় হইতে খড়গপুর অভিমুখে এই স্থান এক মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সঙ্গে একটি ঢাকনি-দেওয়া লৌহ-পাত্রে ছয় পাউণ্ড ডিনামাইট ভর্ত্তি করা একটি মাইন ছিল। পিক্রিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দিয়া তৈয়ারী ফিউজ উহাতে আঁটা ছিল। উহা একটি কাগজের চোঙে রক্ষিত ছিল এবং তাহার সহিত একটি সীসার নল সংযুক্ত ছিল। নলটি বেশী বড় হওয়াতে, উহার একটি টুকরা আমরা কাটিয়া ফেলিয়া দিই। আমাদের সহিত মোমবাতির একটি লণ্ঠন ছিল। অন্য কতকগুলি দ্রব্য একটি কাগজের মোড়কে ছিল এবং আমাদের সঙ্গে কতকগুলি 'ইংলিশম্যান' 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাও ছিল। ফিউজটি এই কাগজগুলির মধ্যে আনা হইয়াছিল বলিয়া কাগজগুলিতে পিক্রিক অ্যাসিডের দাগ লাগিয়াছিল। একটি কার্ডবোর্ড-নির্ম্মিত জুতার বাক্সও আমরা সেইখানে রাখিয়া আসি। ফিউজের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা ওই বাক্সে আনিয়াছিলাম। লাইনের নীচে একটি ঝোপের মধ্যে বসিয়া আমরা কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করি। রাত্রি এগারোটা হইতে বারোটার মধ্যে আমরা মাইনটি পাতি, তাহারপর আমি নারায়ণগড় হইয়া একাকী রাত্রের শেষ যাত্রিবাহী ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। আমি সঙ্গীদের দুইজনকে

সেখানে ট্রেণ আসিবার কিছু পূর্ব্বে ফিউজ লাগাইবার জন্ম রাখিয়া আসি। তাহারা পরে বলে যে, মাইন পাতিবার পর সেই স্থান হইতে দেড় মাইল পথ অতিক্রান্ত হইবার পর, তাহারা ভীষণ আওয়াজ শুনিতে পায়।" এই বিস্ফোরণের ফলে গাড়ীর কিছু ক্ষতি হইলেও লাটসাহেব অক্ষত থাকেন।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল। মেদিনীপুর যাইতে হইলে রেলওয়েক্রসিং পার হইতে হয়। সেখানে একজন পয়েন্টস্‌ম্যান ছিল বলিয়া তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্ম মাইন পাতিবার পর প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার আঁকা-বাঁকা পথে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া মেদিনীপুরে তাহার পরের দিন পৌঁছিলেন। সেই দিন মেদিনীপুর জেলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের দিন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময় খড়্গপুরে এক জন মারাঠী রেলকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার সহিত বিপ্লবী দলের যোগ ছিল। তাঁহার নিকট হইতে ছোট-লাটের আসা-যাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যাপারে পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজাইয়া কয়েকজন রেলওয়ে মজুরকে কারাগারে প্রেরণ করে।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে ৭ই নভেম্বর ১৯০৮ সালে এণ্ড্রু ফ্রেজারকে কলিকাতায় ওভারটুন হলে এক জনসভায় রিভলভারের গুলিতে বধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আক্রমণকারী যুবক জিতেন্দ্রনাথ রায় এক জন কলেজের ছাত্র। পর পর তিনবার রিভলবারের ঘোড়া (Trigger) টানা সত্ত্বেও গুলি বাহির হইল না, কারণ অস্ত্রটি খারাপ ছিল। যুবক যখন এই ভাবে রিভলবারের ঘোড়া টানিয়া গুলি ছুঁড়িতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন ছোটলাটের পার্শ্বোপবিষ্ট বর্দ্ধমানের মহারাজা পরলোকগত স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। বিচারে যুবকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল।

নারায়ণগড়ে ছোটলাটকে হত্যা করার চেষ্টার ১৬।১৭ দিন পরে ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বি. সি. এলেনকে বিপ্লবী দলের নিকট শিশিরকুমার গুহ নামে পরিচিত এক ব্যক্তি গুলি করে। দিবালোকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনের মত একটা জনবহুল স্থান হইতে একজন

ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি করিয়া কেহ অনায়াসে পলাইয়া যাইতে পারে, এরূপ লোক বাংলায় আছে দেখিয়া বাঙ্গালী বিস্মিত হইল।

বি. সি. এলেন

এলেন সাহেব সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াও বাঁচিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন পর শিশিরকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে ১৯১৪ সালে গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে অন্তরীণ থাকাকালীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোয়ালন্দ ষ্টেশনের ঘটনার পরে কুষ্টিয়াতে পাদ্রি হিকেন বোথাম সাহেবকে বলদেব রায় গুলি করেন। বলদেব রায় স্থানীয়

কুষ্টিয়া সেবক সমিতি

কুষ্টিয়া সেবক সমিতির সভ্য ছিলেন। যে সময় বাংলা দেশের সর্ব্বত্র শিবাজী উৎসব প্রতিপালিত হয় সেই সময় কুষ্টিয়া সেবক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। আবালবৃদ্ধ অনেকেই এই সমিতির সভ্য ছিলেন। জনসেবা ও শরীর চর্চ্চার ভিতর দিয়াই সমিতির সভ্যগণ জনসাধারণের মধ্যে কার্য্য করিতেন। লাঠিয়াল ব্রজ সর্দার সভ্যদের লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন। এই সমিতির সভ্যদের মধ্য হইতে গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয় এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই সমিতি কলিকাতার বিপ্লবীদলের সহিত যুক্ত হয়। সমিতির সভ্যদের মধ্যে কুঞ্জলাল সাহা, ভবভূষণ মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল, বিনয় রায়, শচীন রায় প্রভৃতি প্রধান সভ্য ছিলেন। কুঞ্জলাল সাহা পরে মানিকতলা বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন। শচীন রায় বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় থাকেন। ভবভূষণ মিত্রের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কিত মামলায় ছয় বৎসর জেল হয়।

কুষ্টিয়া বিপ্লব কেন্দ্রের গোড়া পত্তনের সময় কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচী বা সুস্পষ্ট কর্ম্মতালিকা ছিল না। তবে ইহার সভ্যগণ ইংরাজ বিদ্বেষ প্রচার করা ও ইংরাজদের হত্যা করা প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এই কর্ম্মসূচীর প্রথম কার্য্য হিসাবে হিকেন বোথাম সাহেবকে

হিকেন বোথাম হত্যা প্রচেষ্টা

আক্রমণ করা হয়। বোথাম সাহেব মিশনারীর কার্য্যব্যপদেশে কুষ্টিয়ায় আসেন। বলদেব রায় বোথাম সাহেবের নিকট প্রায়ই

যাইতেন। ঘটনার দিন রাত্রি নয়টার সময় বলদেব রায়কে বোথাম সাহেব গল্প করিতে করিতে কিছুদূর রাস্তা পৌঁছাইয়া দিতে আসেন। পৌঁছাইয়া দিয়া বোথাম সাহেব যখন ফিরিয়া যাইতেছেন সেই সময় বলদেব রায় তাহাকে গুলি করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে বলদেব রায়, সুরজা মজুমদার, গনেশ দাস এবং আরও ২।১ জনকে গ্রেপ্তার হন। বোথাম সাহেব তাঁহার জবানবন্দীতে বলদেব রায়কে নির্দ্দোষ বলেন। কৃষ্ণনগর আদালতে এই মামলা হয় এবং সকল আসামীই নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

বলদেব রায় পরে স্বামী অনন্তানন্দ নামে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চন্দননগর একটি স্বদেশী-সভার আয়োজন চলিতেছিল, ফরাসী সরকার সেই সভা বন্ধ করিয়া দেন। চন্দননগর ফরাসী-শাসিত অঞ্চল বলিয়া তথায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিপ্লবীরা সহজে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিন্তু চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তাদ্দিভ্যাল এক নূতন আদেশ জারী করিয়া সেই পথ বন্ধ করিয়া দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল হেমচন্দ্র দাসের তৈয়ারী বোমা লইয়া বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায় ও নরেন্দ্র গোস্বামী মেয়রকে হত্যার উদ্দেশ্যে চন্দননগর গমন করেন। মেয়র তাঁহার পত্নীর সহিত রাত্রে যখন আহারে রত ছিলেন, তখন জানালা দিয়া ইন্দুভূষণ বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার কাজ ঠিক মত হয় নাই। সম্ভবতঃ পিক্রিক অ্যাসিড ভাল ছিল না।

চন্দননগর মেয়র হত্যার প্রচেষ্টা

নবজাগ্রত জাতির অগ্রগতির প্রতিরোধ করার জন্য বৈদেশিক স্বৈরাচারী শাসকবর্গের অনুসৃত নিগ্রহ-নীতির প্রয়োগ বাংলার সর্ব্বত্র পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তৎকালে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী কিংসফোর্ড। সেই সময় বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর,' 'সন্ধ্যা', নবশক্তি' ও ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' বাংলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুক্তির বাণী প্রচার করিতেছিল। এই সকল সংবাদ-

পত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই সমুদয় মামলার বিচার হয়।

কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে যে সকল রাজনৈতিক মামলার বিচার হইয়াছিল তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ষোড়শবর্ষীয় বালক সুশীলকুমার সেনের মামলা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একদিন রাজনৈতিক মামলার আদালত-গৃহে কলিকাতার ছাত্র ও যুবকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তখন পুলিশ ও উপস্থিত জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বালক সুশীলকুমার এক জন অশ্বারোহী সশস্ত্র ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীর অশ্বের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে ঘুষি মারিয়াছিল। ইংরাজ বিচারক কিংসফোর্ড পরাধীন ভারতের একটা বালকের এই বীরোচিত সাহস ও পৌরুষকে অমার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে করিলেন। ২২শে আগষ্ট বিচারে সুশীলের প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল। কিংসফোর্ড বেত্রদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আন্দোলনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁহার আদালতের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে ত্রিকোণাকার একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। হাত-পা বাঁধিয়া সুশীলকে বেত্রাঘাত করায় সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

সুশীলকুমার সেন

এই বর্ব্বরোচিত দণ্ডাজ্ঞার পর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা কিংসফোর্ডকে 'কসাই কাজী কিংফর্দ্দ' বলিয়া উল্লেখ করিত। সুশীলের সাহসের প্রশংসা করিয়া 'সন্ধ্যা' লিখিয়াছিল—'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গী বলে বাপ বাপ'। সুশীল ও তাঁহার অগ্রজ বীরেন সেন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাজনৈতিক মামলাগুলির বিচার শেষ হইয়া যাওয়ার পর কিংসফোর্ডকে বাংলার বাহিরে নিরাপদ স্থানে বদলী করা হয়। বিহারে মজঃফরপুর সহরে তিনি জেলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইলেন। 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের নায়কমণ্ডলী—শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে এই অত্যাচারী জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রথম ভার পড়ে পরেশ মৌলিকের উপর।

পরেশ মৌলিক আরদালীর বেশে একটা মোটা আইন বইএর ভিতর বোমা ভরিয়া বিশেষ চতুরতার সহিত কিংসফোর্ডের গার্ডেনরীচের বাংলোতে চাপরাশীর নিকট দিয়া আসেন। পরেশ চাপরাশীর সহিত পান বিড়ি সহযোগে নানা গল্প করিয়া তাহার হাতে বইটা দিয়া কিংসফোর্ডের টেবিলের উপর রাখার ব্যবস্থা করেন। বইটার প্যাকিংএর উপর যথারীতি কিংসফোর্ডের নাম লেখা ছিল। পুস্তকের কভার না কাটিয়া ভিতরে পাতা গোল করিয়া কাটিয়া তাহাতে বোমা স্থাপন করিয়া ভালভাবে প্যাক করা হয়। বোমার সঙ্গে একটি স্প্রিং দিয়া কভারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কভারের বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটিবে। পুস্তকটি লইয়া যাইবার সময় আরদালী বলে, "বহুত ভারী হ্যায়"। পরেশ মৌলিক হাসিতে হাসিতে বলেন, "এসব বাবা বড় বড় লোকের বই, আমরা ও-সবের কি বুঝি?"

কিংসফোর্ড হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা

কিংসফোর্ড মনে করেন যে, পুস্তকটি পূর্ব্বে কেহ হয়তো লইয়া গিয়াছিল তাই ফেরত দিয়া গিয়াছে। তিনি অন্যান্য পুস্তকের সহিত বই-বোমাটিকে সযত্নে বাক্সবন্দী করিয়া মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন।

আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির পর, পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব বিপ্লবিগণের কার্য্যাবলী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান, এবং মজঃফর-পুরে কিংসফোর্ড সাহেবকে 'তার' করিয়া উক্ত প্যাকিং-বাক্সে হাত দিতে নিষেধ করেন। বোমাটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ মিঃ এলারসন সাহেবকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন এবং তিনি বাক্সটিকে বহুক্ষণ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া বোমার সক্রিয়তা নষ্ট করিয়া দেন।

কিংসফোর্ডের মৃত্যু না ঘটাতে কর্ত্তব্য স্থির করার জন্য এক বৈঠক বসে এবং তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ ও চারু দত্তের নির্দ্দেশে ঠিক হয় যে, মজঃফরপুরে বিপ্লবী প্রেরণ করিয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে হইবে। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্রের সুপারিশে ক্ষুদিরাম বসুকে বারীন্দ্রের প্রিয় অনুচর প্রফুল্ল চাকীর সহিত এই কার্য্যের জন্য মজঃফরপুরে প্রেরণ করা স্থির হয়। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কেহ

কাহাকেও চিনিত না। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হইতে আনিয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলা হয়, ইঁহার নাম দীনেশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার একজন কর্ম্মী, এবং ক্ষুদিরামকে, হরেন সরকার নামে প্রফুল্লের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্যই এইরূপ করা হয়। যদি কেহ কোন কার্য্যে ধরা পড়ে এবং পুলিশের অত্যাচারে স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সে প্রকৃত কথা বলিতে পারিবে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও হইত।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী

কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে কিংসফোর্ড যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহার শাস্তি দিবার জন্য প্রফুল্ল চাকী চঞ্চল হইয়া উঠে এবং মজঃফরপুরে গমন করিয়া বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের জীবনান্ত চাহে। তাঁহার মৃত্যু দেশের লোকেরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। উহাই দেশের দাবী। হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর এই বোমা ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে প্রস্তুত করে। একটি কাঠের হাতলযুক্ত টিনের আধারে এই ডিনামাইট বোমাটি ছিল। আমি ও উপেন্দ্র স্থির করি যে, এই কাজের ভার দেওয়া হইবে প্রফুল্ল চাকীকে; হেমচন্দ্রের সুপারিশে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরামকে তাহার সঙ্গী হইতে দেওয়া হয়। আমি দুই জনকে দুইটি রিভলভার দিয়াছিলাম, কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে তাহারা ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ক্ষুদিরাম আমাদের দলের লোক ছিল না এবং সে মাণিকতলা বাগান কিম্বা গোপীমোহন দত্ত লেনের ব্যাপার জানিত না। সে হেমচন্দ্রের নিকট তাঁহার বাসস্থানে থাকিত। আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া মুরারিপুকুর হইতে গোপীমোহন দত্ত লেনে যাই এবং সেখানে প্রফুল্ল একটি ক্যানভাস-নির্ম্মিত ব্যাগে বোমা ও রিভলবার ভরিয়া লয়।"

মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে পৌছান এবং মহাত্মা ওয়ার্ড এষ্টেটের ধর্ম্মশালায় দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গাদাস সেনের নাম লইয়া উঠেন। উহারা মজঃফরপুরে আসিয়া কিংসফোর্ডের আবাসস্থল পর্য্যবেক্ষণ করার

পর দীনেশ ( প্রফুল্ল চাকী ) 'মুকুন্দদা' নামে বারীন্দ্রকে অভিহিত করিয়া মাণিক-তলায় এক পত্র লিখেন। "আমরা নিরাপদে এখানে পৌছিয়াছি। কিন্তু পথে দুর্গাদাসের পকেটে যে টাকা ছিল তাহা খোয়া গিয়াছে। কিছু টাকা পাঠাবেন। আমরা বরকে এখনও দেখি নাই কিন্তু তাহার বাড়ী ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছি। বরের বাড়ী মন্দ নহে। আমি পরে আপনাকে সবিশেষ জানাইব। নিম্ন ঠিকানায় টাকা পাঠাবেন। টাকা পাঠাইবার সময় আমাদের ওখানকার ঠিকানা দিবেন না, ভুল ঠিকানা দিবেন।"

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কয়েক দিন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সহরের পথ ঘাট চিনিয়া লইলেন। কিংসফোর্ডের গতিবিধিও তাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার বাংলোর নিকটেই ইউরোপীয়ান ক্লাব অবস্থিত। কিংসফোর্ড সাহেব প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে যাইতেন এবং অধিক রাত্রিতে বাংলোতে ফিরিতেন। ক্লাব বাংলোর নিকটবর্ত্তী হইলেও তিনি তাঁহার ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ক্লাবে যাতায়াত করিতেন। মজঃফরপুরের উকীল মিঃ কেনেডিরও একই রকম ঘোড়ার গাড়ী ছিল। তিনিও ক্লাবের মেম্বার ছিলেন এবং নিজের গাড়ীতে করিয়া স্ত্রী ও কন্যা সহ ক্লাবে যাতায়াত করিতেন।

বোমা নিক্ষেপের ঘটনার ৮।১০ দিন পূর্ব্বে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়াছিল যে, কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইবে। কলিকাতা হইতে গোয়েন্দা পুলিশ কিংসফোর্ডকে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে সতর্ক করিয়া পাঠাইলেন।

কিংসফোর্ড হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অবিস্মরণীয় দিন। অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রবেশদ্বারে দুই জন বাঙ্গালী যুবক বোমা রিভলবার লইয়া সংগোপনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় মিঃ কেনেডির পত্নী ও কন্যা ফিটন গাড়ীতে করিয়া ক্লাব হইতে বাড়ীতে

ফিরিতেছিলেন। উহাই কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ী মনে করিয়া ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিলেন। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হইল। গাড়ীর একাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আরোহিণী মিসেস্ কেনেডী ও তাঁহার কন্যা মারাত্মক ভাবে আহত হইলেন; সহিসও আহত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আঘাত গুরুতর হয় নাই মহিলা দুই জন আঘাতের ফলে মারা গেলেন।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইতে দ্রুত গতিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রেলের রাস্তা ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলেন সমস্তিপুরের দিকে। মজঃফরপুর হইতে চার মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনী নামক ষ্টেশনের (বর্ত্তমান পুশা রোড ষ্টেশন) নিকটে পৌছিলে রাত্রি প্রভাত হইল। ১লা মে শুক্রবার এই স্থানে শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং নামক দুই জন কনেষ্টবল কর্ত্তৃক ক্ষুদিরাম ধৃত হইলেন।

ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর নিকটস্থ আমবাগানের আশ্রয় হইতে প্রফুল্ল সমস্তিপুরের দিকে রওনা হইলেন। বোমা নিক্ষেপের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নানা দিকে সাদা পোষাকে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলকে অপরাধী ধরিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অনেক ষ্টেশনে জরুরী তার করিয়া নির্দ্দেশ প্রেরিত হইয়াছিল।

মজঃফরপুর হইতে সমস্তিপুরের দূরত্ব ৩২ মাইল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় প্রফুল্ল সমস্তিপুরে আসিয়া পৌছিলেন।

রেল-কর্ম্মচারীদের বাসভবনের সংলগ্ন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার কালে এক জন বাঙ্গালী রেল-কর্ম্মচারীর দৃষ্টি পড়িল পথচারী বাঙ্গালী যুবকের উপর। পূর্ব্ব-দিন মজঃফরপুরের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্তিপুরে সেই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। যুবকের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, যুবকটি পলাতক বিপ্লবী। তিনি তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া সারাদিন লুকাইয়া রাখেন এবং স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নূতন জামা-কাপড় ও জুতা কিনিয়া তাঁহার পোষাক পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলেন এবং রাত্রির গাড়ীতে (১লা

যে ) কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে ইণ্টার ক্লাশের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

সেই কামরাতেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন পুলিশ সাব-ইন-স্পেক্টার কলিকাতায় যাইতেছিলেন। নন্দলাল, পূর্ব্বদিন বোমা নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে মজঃফরপুরে ছিল এবং ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়া আসিয়াছিল। প্রফুল্লর আচরণে ও কথা-বার্ত্তায় ও নূতন পোষাকে, দারোগা নন্দলালের সন্দেহ জন্মে। এবং নানা ছলে তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চেষ্টা করে। প্রফুল্ল সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য অন্য গাড়ীতে চলিয়া যান।

মোকামার পুলিশের কর্ত্তা আর্ম্মষ্ট্রং সাহেবের অনুমতি লইয়া নন্দলাল প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে বীর যুবক প্রফুল্ল কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিমেষের মধ্যে রিভলবার বাহির করিয়া নন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। নন্দলাল মাথা নীচু করিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

**প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা**

প্রফুল্ল পুলিশের হস্তে ধরা দিবার পূর্ব্বেই গুলীর আঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। এই ঘটনার এক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়া উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"তখন ওকে পুলিশ ঘিরিয়া ফেলিলে প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে আর একবার বুকে গুলি করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া গেল। বাংলার এই প্রথম বীর পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। পুলিশ মৃত প্রফুল্লর ফটো তুলিয়া লইল। শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড মজঃফরপুর লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে প্রফুল্লর সেই অবস্থার ফটো আমি দেখিয়াছি। কপালের ঊর্দ্ধদিকে একটি ও বাঁ দিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলী প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিত বীর্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুইবার গুলী লাগাইতে পারে। কি প্রশস্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর। আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত! বাঙ্গালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙ্গালী বীরের প্রকৃত মূর্ত্তি।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে শোণিতরেখায় মহাকালের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার মুক্তিযজ্ঞে আত্ম-বলিদান করিয়া প্রফুল্ল অমরত্বের মর্য্যাদা লাভ করেন।

নরহত্যার অপরাধে—বিচারে প্রফুল্লর সতীর্থ ক্ষুদিরামের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ক্ষুদিরাম নির্ভীক ভাবে অপরাধ স্বীকার করিল এবং প্রাথমিক তদন্তে অথবা সেসন আদালতে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না। জেলা জজ কার্ণডাফ ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড দিয়া হাইকোর্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। যদিও ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি ছাড়া হত্যা সম্পর্কে কোন প্রমাণ ছিল না, তথাপি হাইকোর্ট রায় বহাল রাখিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ড

১১ই আগষ্ট প্রাতে মজঃফরপুর কারাগারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। শান্ত ও নির্বিবকার চিত্তে সে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে। বিংশ শতকে বাঙলা দেশে ক্ষুদিরামই সর্ব্বপ্রথম ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া জাতিকে মৃত্যু-ভয়াতীত হইতে শিখাইয়াছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিবপুরের ডাকাতি, চন্দননগরে মেয়রের গৃহে বোমা নিক্ষেপ এবং তাহার পরে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই পুলিশ এই ধরণের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের গুপ্ত প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আঁচ পাইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ হইতে বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান-বাড়ী ও তাহাদের অন্যান্ত থাকিবার স্থান—১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, ৩২ নং স্কটস্ লেন, ৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে পুলিশ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মজঃফরপুরের ঘটনার পর দিবস 'বন্দেমাতরম' অফিসে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ ভাবী বিপদের সংকেত পান। তবে ঘটনাটা এমনই আকস্মিক ভাবে ঘটিল যে, তিনি নিজেই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র তাঁহার অবস্থা

বিপর্য্যয় ঘটিবে। এই সম্বন্ধে এক বিবরণে তিনি বলেন, "১৯০৮ সনের ১লা মে, শুক্রবার আমি "বন্দেমাতরম" অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে 'এম্পায়ার' কাগজ দিয়া বলেন, 'মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে দুইটি ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত।' সে দিন 'এম্পায়ার' কাগজে আরও পড়িলাম যে, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন, 'আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না যে তখন আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা—জানিতাম না যে, এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানব সমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতন থাকিতে হইবে।"

কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হওয়ার পরদিনই ১৯০৮ সালের ২রা মে বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবিগণের আশ্রম ও কর্ম্মকেন্দ্র মুরারিপুকুর রোডের বাগান-বাড়ী সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ পরিবেষ্টিত ও তল্লাসী হয়।

মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ী

পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া তিনটি রাইফেল, দুইটি বন্দুক, নয়টি রিভলবার, অনেক বোমা, পিকরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ, টিন, তামা, জিঙ্কের পাত, হাপর এবং খোল প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি সমেত একটি ছোটখাট কারখানা আবিষ্কার করে। মুরারিপুকুরের বাগান-বাড়ী ছাড়া যুগপৎ আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস চলে। মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ীতে নিম্নলিখিত ১৪ জন ধরা পড়েন :—

(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—কলিকাতা। (২) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর। (৩) উল্লাসকর দত্ত—ব্রাহ্মণবেড়িয়া। (৪) ইন্দুভূষণ রায়—যশোহর। (৫) বিভূতিভূষণ সরকার—শান্তিপুর। (৬) নলিনীকান্ত গুপ্ত—রংপুর। (৭) শচীন্দ্রকুমার সেন—সোনারং। (৮) বিজয়কুমার

রাগ—খুলনা। (৯) কুঞ্জলাল সাহা—কুষ্টিয়া। (১০) শিশিরকুমার ঘোষ—যশোহর। (১১) পরেশচন্দ্র মৌলিক—যশোহর। (১২) পূর্ণচন্দ্র সেন—ঘাটাল। (১৩) নরেন্দ্রনাথ বকসী—রাজসাহী। (১৪) হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ—যশোহর।

১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী হইতে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও শান্তিপুরের নিরাপদ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ স্কটস লেনের বাসা হইতে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি "নবশক্তি" নামে একখানি জাতীয়তাবাদী দৈনিক নূতন রূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নূতন বাসায় তাহার আফিস হইয়াছিল; সেখানে শ্রীঅরবিন্দের সহিত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন্দ্রনাথ বসু গ্রেপ্তার হন।

ঘটনার দিন পুলিশের দল রিভলবার হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া বীরদর্পে দোতালায় আসিল এবং শ্রীঅরবিন্দ যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ভীড় করিল। শ্রীঅরবিন্দ তখন ঘুমাইতেছিলেন, জাগিয়া দেখিলেন এই বিরাট ব্যাপার। গ্রেপ্তারের বিবরণ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র-স্বভাব বিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু (অন্যতম পুলিশ কর্ম্মচারী) তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি নাকি বি· এ· পাশ করিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতনই থাকি।' সাহেব অমনি সজোরে উত্তর দিলেন, 'তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?' দেশ হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ ও দারিদ্র ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূল-বুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।"

শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার

যখন খানাতল্লাসী চলিতেছিল সেই সময় এক পুলিশ সার্জ্জেন্ট শ্রীঅরবিন্দের

ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনীর বুকের নিকট রিভলবার ধরিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দকে হাতকড়া দিয়া লইয়া যাইবার সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পুলিশকে হাতকড়া খুলিয়া দিবার অনুরোধ করেন। পুলিশ অনুরোধ রক্ষা করে।

৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট হইতে হেমচন্দ্র দাস, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধরণীধর গুপ্ত, কালীগঞ্জের অশোকচন্দ্র নন্দী, বর্দ্ধমানের বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত ও নড়াইলের মতিলাল রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহা ছাড়া ৩০।২ নং হ্যারিসন রোড, ১১ নং হ্যারিসন রোড, ২৩ নং স্কটস্ লেন ও উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্তের শিবপুরের বাসাতেও পুলিশ হানা দেয়। প্রথম বাড়ীটি ছিল বিপ্লবীদের চিঠি-পত্র আসিবার গোপন ঠিকানা, এখানে সেই তারিখে কয়েকখানি চিঠি ধরা পড়ে।

বিপ্লবীদের নিকট হইতে যে সমস্ত চিঠি-পত্র ও কাগজ পাওয়া যায় তাহার দরুণ এবং পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ ধরা পড়েন শ্রীরামপুরের হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার সুধীরকুমার সরকার, যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শ্রীহট্টের তিন ভ্রাতা—হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও সুশীলচন্দ্র সেন এবং শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৩রা মে দীনদয়াল বসু শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপোতে গ্রেপ্তার হইলেন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র যোগজীবন ঘোষ, হারাধন মল্লিক জমিদারের বাটীর গৃহশিক্ষক শরৎচন্দ্র মিত্র।

বোমার মামলার তদন্তে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহার ফলে জুন মাসে পুলিশ দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ হরি কানে, প্রভাসচন্দ্র দেব, চারুচন্দ্র রায় ও হরিদাস দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়।

বন্দিগণের স্বীকারোক্তি

ধৃত হইবার পর বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, হৃষিকেশ, বিভূতি সরকার ও ইন্দুভূষণ রায় ৪ঠা মে আলিপুরের অস্থায়ী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির নিকট স্বীকারোক্তি করেন। মিঃ বার্লি সেই বিবৃতি ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইনের বিধানমতে লিপিবদ্ধ

করেন। ইঁহারা স্বীকারোক্তির কারণ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, নির্দোষ লোক যেন অপরাধী বলিয়া শাস্তিত না হয় এবং ভবিষ্যতে বিপ্লবপন্থীরা যেন সাবধান হইয়া কাজ করেন। তাঁহাদের অপর উদ্দেশ্য ছিল—এই প্রকার উক্তির দ্বারা দেশের মুক্তিকামী ছাত্র ও যুবকগণকে বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সেসন জজ মিঃ বীচক্রফ্‌ট তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, "They say it was to save the innocents, and if that were really their object, they deserve full credit for it···Barin at any rate had little hope of escape, confession. Certainly in his case the confession was not prompted by any feeling of remorse, he glorified in what he had done. And neither of them had disclosed the full extent of the conspiracy or the names of other associates, except those arrested with them. Not this concealment indicates depravity, rather the contrary."

বিচারকের এই সুস্পষ্ট অভিমত হইতেই এই স্বীকারোক্তির কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। বারীন্দ্র প্রভৃতির স্বীকারোক্তির ফলেই শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা জানিয়া-শুনিয়াই ইহাদের সম্পর্ক গোপন রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অবর্তমানে যাঁহারা দল পরিচালনা করিবেন তাঁহাদেরও সম্পর্কে সকল সংবাদ ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। তথাপি এই স্বীকারোক্তিগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে ; কারণ, ইহাদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এমন বহু অজানা ঘটনাবলীর সন্ধান মিলে এই স্বীকারোক্তিগুলিতে।

স্বীকারোক্তি করার পূর্বে প্রথম তদন্তকারী ইনস্পেকটার রামসদয় মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র দাসের প্রদত্ত একটা মিথ্যা বিবৃতি দেখাইয়া বিবৃতি বাহির করে। উপেন্দ্রনাথ এই বিবৃতি সম্পর্কে বলেন যে, "ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদর-যত্ন করিয়া তুলিলেন। এক দিন একখণ্ড হাতে-লেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মহা উৎসাহে বলিলেন—'এই দেখ বাবা, হেমচন্দ্রের statement.' তিনি আমাদের যাহা শুনাইলেন তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য অভিনয় মাত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই-একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রির জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম।"

বারীন্দ্রকুমার তাঁহার স্বীকারোক্তিতে বলেন, "...এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি ঢাকা সহরে আমার অগ্রজ মনোমোহন ঘোষের নিকট গমন করি এবং সেই সময়েই ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতে কলেজে প্রবেশ করি। তাহার পর লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আমি বরোদা রাজ্যে আমার ভ্রাতা গাইকোয়ার কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করি। সেখানে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করি। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচারের জন্য আমি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমি জেলার পর জেলা ঘুরিয়া প্রচার চালাই এবং দিকে-দিকে ব্যায়ামশালা স্থাপন করি। সেখানে যুবকের দলকে আনিয়া রাষ্ট্রনীতি ও শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দেওয়া হইত। এই ভাবে দুই বৎসর কাল আমি প্রচারকার্য্য চালাই এবং এইরূপে বাংলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। ক্লান্ত ও পরাজিত মনে আমি বরোদায় প্রত্যাগমন করিয়া আরও নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করিতে থাকি। এক বৎসর এরূপ ভাবে কাটাইয়া আমি নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসি। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে, শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে সফল হওয়া যাইবে না, ইহাতে যে বিপদ আছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইলে জাতিকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে হইবে ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে আত্মিক বলে বলীয়ানও হইতে হইবে। সেজন্য ধর্ম্মশিক্ষা-কেন্দ্রের

বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি

বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন প্রবল ভাবে বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করে। আমি জনগণকে আমার পন্থায় শিক্ষিত করিবার আশায় লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে সমস্ত লোক বর্ত্তমানে আমার সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের এই জন্যই সংগ্রহ করি। আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( বর্ত্তমানে আমার সহিত ধৃত ) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ( বর্ত্তমানে কারাগারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী ) সহযোগিতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করি। দেড় বৎসর কাল ঐ পত্রিকা চালাইবার পর বর্ত্তমান পরিচালকগণের উপর উহা চালাইবার ভার অর্পণ করিয়া আমি 'যুগান্তর' ছাড়িয়া বিপ্লবী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই।

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক হইতে ধরা পাড়বার পূর্ব্ব পর্যান্ত আমি চৌদ্দ-পনেরটি তরুণকে সংগ্রহ করিয়া দলভুক্ত করি এবং ইহাদের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। সুদূর এক ভবিষ্যতে বিপ্লব ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা ধীরে-ধীরে স্বল্প কিছু অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকি। এ ভাবে এ পর্য্যন্ত আমরা এগারটি রিভলবার, চারিটি রাইফেল ও একটি বন্দুক যোগাড় করিতে পারিয়াছি।

"যে সমস্ত যুবক আমার দলভুক্ত হইয়া বিপ্লবী-চক্রে যোগদান করেন, উল্লাসকর দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। ঠিক কোন্ তারিখে তাঁহার প্রথম আগমন তাহা স্মরণ না থাকিলেও এই বৎসরের ( অর্থাৎ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ) প্রথম দিকেই তিনি আসেন। তিনি ( উল্লাসকর ) বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্ফোরক প্রস্তুত-প্রাণালী আয়ত্ত কারয়াছেন এবং সেই বিদ্যা কার্য্যক্ষেত্রে লাগাইবার বাসনায় তিনি আমাদের দলে যোগদানে ইচ্ছুক। তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে গোপনে নিজ আবাসে তিনি একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া বিস্ফোরক প্রস্তুত বিষয়ে চেষ্টায় রত থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি সেই পরীক্ষাগার নিজে দেখি নাই, তিনি এই সকল বিষয় আমাকে বলিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমরা মুরারিপুকুরের বাগানে কারখানা স্থাপন কারয়া কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ইত্যবসরে হেমচন্দ্র দাস তাঁহার পৈতৃক বিষয়ের অংশবিশেষ বিক্রয় করিয়া —ফ্রন্সের প্যারী নগরীতে যান্ত্রিক বিদ্যা—সম্ভব হইলে বিস্ফোরক প্রস্তুত-প্রণালী —শিক্ষা করিতে গমন করেন। হেমের নিবাস মেদিনীপুর জেলার কান্দরুইতে।

প্রঃ—তিনি কবে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন?

উঃ—১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

প্রঃ—কবে তিনি ফিরিয়া আসেন?

উঃ—মাত্র তিন-চারি মাস পূর্ব্বে। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই উল্লাসকরের সহিত বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত ব্যাপারে যোগদান করেন।

প্রঃ—তিনি কোথায় এই সমস্ত প্রস্তুত করিতেন?

উঃ—৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ বাটিতে এবং বাগবাজার অঞ্চলে গোপীমোহন দত্ত লেনে তিনি এই কার্য্যের জন্য যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে। পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব্বে, যখন সংবাদপত্র দলন উদ্দেশ্যে বহু মামলা দায়ের হইয়া দণ্ডপ্রদান চলিতে থাকে, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা যেখানেই কিছু চাহিতে যাইতাম, সেখানেই আমাদিগকে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইত। উহা জাতির অন্তরের বাণী মনে করিয়া, আমরা উহাকে গ্রহণ করি এবং এ সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হই। আমাদের প্রথম অভিযান হয় ফরাসী-চন্দননগরে, তখন ঐ পথ দিয়া ছোটলাট বাহাদুর রাঁচী যাইতেছিলেন। উল্লাসকর দত্ত একটি ছোট ডিনামাইট মাইন এবং কতকগুলি 'ফিউজ' ও 'ডিটোনেটার' লইয়া চন্দননগরে গমন করেন ও লাটসাহেবের 'স্পেশাল ট্রেণ' আসিবার পূর্ব্বে, উহা রেল-লাইনে পাতিবার মনস্থ করিয়া যখন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন, ঠিক সেই সময় কয়েকজন লোক সেই স্থানে আসিয়া পড়ে। তিনি সরিয়া আসিয়া উহা দূরে অন্য স্থানে স্থাপন করিবার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতে ব্যস্ত, তখন সহসা ট্রেণটি আসিয়া পড়াতে তাড়াতাড়ি 'মাইন' স্থাপন সম্ভব হয় না। উল্লাসকর সেজন্য কয়েকটি কার্তুজ রেল-লাইনে রাখিয়াই

সরিয়া পড়েন। উহাতে সামান্ত একটু বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ট্রেণের কোনই ক্ষতি হয় না।

প্রঃ—তুমি উহা কিরূপে জানিলে? তোমার এই বিবৃতি দিবার অধিকারই বা কি?

উঃ—আমিই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার, উল্লাস ও উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়াই সকল কার্য্যক্রম স্থির করা হইত। আমি উল্লাসের মুখে এই বিবরণ শুনিয়াছি। ইহার পর ছোটলাট যখন কটক হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন আমি আরও দুইজনকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় এইরূপ কাজের জন্ত চন্দননগরে গমন করি;………।

প্রঃ—বিস্ফোরণের জন্ত তোমাদের সঙ্গে কি লইয়া গিয়াছিলে?

উঃ—একটি মাইন ও ফিউজ। আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি কিন্তু লাট-সাহেব ওই পথে আসেন নাই।

প্রঃ—তোমরা কি মাইন স্থাপন করিয়াছিলে? কোথায়?

উঃ—হাঁ, চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে। ট্রেণ আসিতে না দেখিয়া আমরা উহা তুলিয়া লই এবং চন্দননগরে আসিয়া খোঁজ লইয়া অবগত হই যে, লাটসাহেব এই পথে আসিতেছেন না। তৃতীয়বার এইরূপ কার্য্যের জন্ত আমরা খড়্গপুর যাই, চন্দননগরের দ্বিতীয়বার যাত্রার সঙ্গী তিনজনই গমন করিয়াছিলাম।……ইহার পর চন্দননগরে বোমা ফেলা হয়। হেমচন্দ্র দাস সেই বোমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন………। তাহার পর আর একটি ঘটনাই মাত্র উল্লেখযোগ্য; তাহা মজঃফরপুরের ঘটনা। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে কিংসফোর্ড সাহেব যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার শাস্তি দিবার জন্ত প্রফুল্ল চাকী চঞ্চল হইয়া উঠে এবং মজঃফরপুরে গমন করিয়া বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের জীবনান্ত চাহে।………আমি দু'জনকে দুইটি রিভলবার দিয়াছিলাম; কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে, তাহারা ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। ক্ষুদিরাম আমাদের দলের লোক ছিল না। এবং সে মাণিকতলা বাগান কিংবা গোপীমোহন দত্ত লেনের ব্যাপার জানিত না।

সে হেমচন্দ্রের নিকট থাকিত। আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া মুরারিপুকুর হইতে গোপীমোহন দত্ত লেনে যাই এবং সেখানে প্রফুল্ল একটি ক্যানভাস-নির্ম্মিত ব্যাগে বোমা ও রিভলবার ভরিয়া লয়।

প্রঃ—কোথা হইতে তুমি রিভলবার পাইলে?

উঃ—তাহা প্রকাশ করিতে আমি সম্মত নহি। আমি প্রফুল্লকে হেমের বাড়ীতে লইয়া যাই এবং সেখান হইতে সে ক্ষুদিরামকে সঙ্গে লইয়া যায়।......

প্রঃ—এই বৃহৎ আশ্রম-কেন্দ্র চলিত কেমন করিয়া?

উঃ—আমি নানা স্থান হইতে ইহাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতাম।

প্রঃ—তোমরা কি অন্য কাহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলে?

উঃ—আমরা ভাইসরয় ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে ধ্বংস করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয় নাই। আমরা বিশ্বাস করি না যে রাষ্ট্রনৈতিক হত্যার ফলে দেশ স্বাধীন হইবে।

প্রঃ—তবে এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইলে কেন?

উঃ—জনসাধারণ উহা চাহে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবার কারণ কি তাহাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া লউন। আমাদের দলের মধ্যে এই বিবৃতি দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, আমরা যেন অভিযোগ অস্বীকার করি, তাহাতে যে ফল হউক না কেন তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু আমি ইনস্পেক্টার রামসদয় মুখার্জীর কাছে মৌখিক ও লিখিত বিবরণ দিতে সম্মত করাইয়াছি। আমি মনে করি যে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার জন্য উহা করণীয়; বিশেষতঃ যখন আমরা সকলে ধরা পড়িয়াছি এবং দেশে এখনও সন্ত্রাসমূলক কাজ চলিবার সম্ভাবনাও প্রচুর।"

দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়স্ক কয়েদী উল্লাসকর দত্ত ঐ একই দিনে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এল· বার্লির নিকট ইংরেজী ভাষায় এক বিবৃতি প্রদান করেন।

"আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতিতে বৈদ্য ও গো-পালন আমার পেশা। আমার নিবাস ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া থানার অন্তর্গত মৌজা কালীকচ্ছে। হাল সাকিম গ্রাম শিবপুর, হাওড়া।

উল্লাসকরের বিবৃতি

প্রঃ—তুমি কি সূত্রে এই দলভুক্ত হইলে?

উঃ—'যুগান্তর' পত্রিকায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গঠনের আয়োজন হইতেছে। আমার এরূপ সমিতিভুক্ত হইবার মানসিক প্রবণতা থাকাতে আমি বারীন্দ্রের সন্ধান করিয়া দলভুক্ত হই।

প্রঃ—দলভুক্ত হইবার পূর্ব্বে তুমি কি করিতে?

উঃ—পূর্ব্ব হইতে আমি বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ম্মাণে রত ছিলাম।...... চন্দননগরে যে বোমা বিদারণ নিরর্থক হয়, আমি সেই ব্যাপারে উপস্থিত ছিলাম।...ইহার পর খড়্গপুরের ঘটনা হয়। আমি সেখানে যাই নাই, বারীন, বিভূতি ও প্রফুল্ল চাকী গিয়াছিল। তাহারা অবশ্য একটি মাইন লইয়া যায়।

প্রঃ—উহা কে প্রস্তুত করিয়াছিল?

উঃ—আমি করিয়াছিলাম।

প্রঃ—কোথায়?

উঃ—গোয়াবাগান অঞ্চলে একটি গৃহে, গলির নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই। এই বাড়ীটি আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম, খুব সম্ভব বারীনবাবুই ভাড়া লইয়াছিলেন।

প্রঃ—মাইনটি কিরূপ ছিল?

উঃ—উহা ঢালাই করা লৌহনির্ম্মিত আধারে ডিনামাইটপূর্ণ মাইন ছিল, উহার মধ্যে পাঁচ পাউণ্ড ডিনামাইট ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। ফিউজটি পিক্রিক অ্যাসিড ও ক্লোরেট অফ পটাশ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল।...আমি ইহা জানাইয়া দিতে চাহি যে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই স্বীকারোক্তি করিতেছি।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক বিবৃতিতে বলেন—

উপেন্দ্রনাথের বিবৃতি

"যতক্ষণ কলিকাতায় থাকি, আমি ছেলেদিগকে অর্থ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিই। আমি তাহা-দিগকে আমাদের দেশের অবস্থা ও স্বাধীনতা লাভের আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি।

প্রঃ—কি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, তাহা কি শিক্ষা দেও ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—স্বাধীনতা লাভের কি উপায় শিক্ষা দাও ?

উঃ—শিক্ষা দিই যে, আমাদের যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিক সময় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। · ···

আমি এই সব কথা এ জন্য বলিতেছি যে, নির্দ্দোষ লোক যেন শাস্তি না পায়। আর এই জন্য বলিলাম যে, যাহারা এই কাজ চালাইবে তাহারা যেন অধিকতর সতর্কতার সহিত কাজ করিতে পারে।"

এই স্বীকৃতি সম্পর্কে বোমার মামলার অন্যতম আসামী ইন্দ্রনাথ নন্দী বলেন, —"পুলিশ দ্বারা ধৃত হইবার পর, সকলেই কম বেশী confession রূপ statement দিয়াছিল। আমিও দিয়াছিলাম; আত্মরক্ষার ভাব সকলের মনেই জাগিত, ইহাতেই confession প্রদত্ত হইত। কেবল হেমদা বলিত যে, এই সব বিষয়ে একেবারে চুপ থাকাই বৈপ্লবিকের কর্ত্তব্য। পুলিশের সঙ্গে চালাকী চলে না। হেমদা কোন statement দিত না। হেমদা প্যারিস হইতে যে নতুন বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল তাহা নেতারা গ্রহণ করেন নাই। বারীনদাও আমল দেন নাই, নিজের মতই বারীনদা চালাইতেন।"

বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তির পূর্ব্বে নারায়ণগড়ে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা সম্পর্কে পুলিশ কয়েক জন রেলওয়ে মজুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ সৃষ্টি

করিয়া মামলা আনিয়াছিল। মেদিনীপুরের দায়রা জজের বিচারে ৫ জন মজুরের প্রতি ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই স্বীকারোক্তির পর হতভাগ্য মজুরেরা মুক্তি লাভ করে।

মাণিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী বিপ্লবী সন্দেহে পদচ্যুত হন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন পাবনার ভেরেঙ্গা গ্রামের অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অপর জন রংপুরের ঈশান চক্রবর্ত্তী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্‌কার। অবিনাশচন্দ্র অস্থায়ী মুনসেফ রূপে চাকুরী করিবার সময়ই বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৯১৪-১৫ খৃঃ বাংলার বৈপ্লবিক দলের সহিত তিনি 'অন্তরীণ' হন। পরে তিনি আর একজন বৈপ্লবিক নেতা প্রভাসচন্দ্র দেব সংযোগে "মহাজন এণ্ড ট্রেডিং ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়।

এই সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বাদ দিয়া বাংলার ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। যখন দেশের লোক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে ভয় পাইত, তখন এই ধনাঢ্য ও উচ্চবংশের এবং উচ্চ রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। একবার তিনি আমায় বলিয়াছিলেন—'আপনারা জানেন, আমার কত টাকা আছে? আপনারা কাজ করুন, আমি টাকা দেব।' এই কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল দেশমাতৃকার কর্ম্মে উৎসর্গীকৃত জীবন। বর্ষীয়ান কর্ম্মীদের নিকট শুনিয়াছি, তিনি অন্ততঃ ৭০,০০০ হইতে ৮০,০০০ টাকা বৈপ্লবিক কর্ম্মে দান করিয়াছেন। শেষে নিঃস্ব ও কপর্দ্দকশূন্য শোচনীয় জীবন যাপন করিয়া এই জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করেন।"

১৮ই মে (১৯০৮) আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির নিকট মাণিকতলা বোমার মামলার প্রাথমিক তদন্তের শুনানী আরম্ভ হয় এবং ১৯শে আগষ্ট তাহা সমাপ্ত হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর বার্লি সাহেব বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত,

মতিলাল বসু, হরিদাস দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া বেকসুর খালাস দেন। চারুচন্দ্র রায় ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী এবং সে জন্য ফরাসী প্রজা, বৃটিশ আদালতে তাঁহার বিচার করিবার এক্তেয়ার নাই বলিয়া খালাস পান।

ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে দায়রা আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১২১ (ক) ধারা, নরহত্যা ৩০২ ধারা, রাজদ্রোহ ১২৪ (ক) ধারা, বিনা অনুমতিতে (লাইসেন্স) অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি ধারায় আসামিগণ অভিযুক্ত হন। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফটের আদালতে দুইজন এসেসরের সাহায্যে তাঁহাদের বিচার হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর হইতে ১৯০৯ এর ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী চলে।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি, আর আসামিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, ব্যারিষ্টার রজত রায়, ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু ও সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি।

শ্রীঅরবিন্দের মেসোমহাশয় 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁহার পুত্র সুকুমার মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দের সহোদরা শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ অন্যান্য সহৃদয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় মামলা পরিচালনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। সমস্ত আসামীর পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করেন।

**নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী**

মাণিকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ধৃত হইবার পর পুলিশের নিকট ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে এক স্বীকারোক্তি করেন। নরেন্দ্র শ্রীরামপুরের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হইয়া তিনি আলিপুরের

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির তদন্তকালে পর-পর পাঁচদিন জবানবন্দী দেন। নরেন্দ্র নিজেকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপ্লবী দলের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহার স্বীকারোক্তিতে বহু লোককে তিনি জড়িত করেন।

নরেন্দ্রের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ ও লঘুচেতা লোকের ন্যায় হ'লেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, 'আমার বাবা মকদ্দমায় কাট, তাঁহার সঙ্গে পুলিশ পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না। প্রমাণিত হইবে পুলিশ আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি পুলিশের হাতে ছিলে, সাক্ষী কোথায়? গোঁসাই অম্লান বদনে বলিলেন, 'আমার বাবা কত শত মকদ্দমা করিয়াছেন, ওসব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।' এইরূপ লোকই অ্যাপ্রুভার হয়।"

তিনি তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলেন, "অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না; তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার পরে নরেন্দ্র গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।"

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পর তরুণের দল তাঁহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তাব আসিল। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস এক বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হ'য়েছিল, নরেনকে হত্যা করার ভার বাইরে যে কয় দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল তাদের ওপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার-পাঁচ দল পৃথক্ ভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল..."

"নরেনকে মেরে ফেলুক, অরবিন্দবাবু দেবব্রতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া

প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলা দেশে যে কয়টি বৈপ্লবিক গুপ্ত দল ছিল বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনের হত্যার ভার দেওয়া হয়। তিন-চারিটা দল প্রায় এক ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্ম্মটা ছিল—গোঁসাই হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কাজ রয়েছে। গোঁসাইর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। অর্থাৎ তারা দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গানাম জপ করছিল বাকী যে দু'একটি দল কোন উত্তর দেয়নি, তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা করে, কোথায় কিভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্লানও দেওয়া হ'য়েছিল।"

কিন্তু কোন প্লান মতেই কাজ হয় নাই বা হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে একটি ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হন। হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ পাঁচজন বিপ্লবী মিলিয়া বারীন্দ্রকুমারকে গোপনপূর্ব্বক একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করাই স্থির করিলেন।

এই সম্বন্ধে মতিলাল রায় লিখিয়াছেন যে, "প্রথম হইতেই মতের পরিবর্ত্তন করায় বারীন্দ্রকুমারের অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। এই ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে বাধা দিবেন, এ বিষয়ে ইঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। প্রথম স্বীকারোক্তিতে বিপ্লব নিবারণ চেষ্টা, তারপর আবার বিপ্লবীদল গঠনের যুক্তি, পরিশেষে নিজেরাই জেলের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠান সফল করার সঙ্কল্প, ইহার কোনটাই ইঁহাদের মনঃপূত হইতেছে না।"

জেল কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আলিপুরে আসিয়া অবধি অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হইতে ইচ্ছুক, এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে খবর পাঠান এবং বলেন যে, উভয়ে একত্রে পরামর্শ করিয়া এজাহার দিলেই ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ কেবল যে একজন সমর্থক পাইবে তাহাই নয়, অধিকন্তু অসংলগ্ন কিছু থাকিলে তাহাও শোধরাইয়া যাইবে

এবং তাহাদের সাক্ষ্যও খুব জোর হইবে। সত্যেনের কথায় বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ পুলিশের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত জেল হাসপাতালে সাক্ষাৎ করেন।

কানাইলাল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া এই কাজে তিনিও সত্যেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। নরেন ও সত্যেনের রাজসাক্ষীর উপযোগী এজাহারের আবৃত্তি হাসপাতালের ডাক্তার-খানায় চলিতে লাগিল। বারীন্দ্রকুমার কর্ত্তৃক আনীত রিভলভার জেলের মধ্যে হেমচন্দ্রের নিকট ছিল। রোগী ব্যতীত অন্যের হাসপাতালে যাওয়া নিষিদ্ধ থাকিলেও তিনি কাপড়ে জড়াইয়া রিভল-ভারটি সত্যেনকে দিয়া আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত রিভলভারটি মরচে-পড়া থাকায় তিনি ইহার দ্বারায় নরেন্দ্রকে হত্যা করিতে সাহসী হন নাই। তিনি অন্য আর একটি রিভলভারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র যখন প্রথম রিভলভারটি লুকাইয়া হাসপাতালে সত্যেনকে দিতে যান, তখন হাস-পাতালের ডাক্তার তাঁহাকে বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎ করিতে আসার জন্য সতর্ক করিয়া দেন। সেইজন্য রিভলভারটি স্বয়ং লইয়া যান নাই। কানাই-লালকে দিয়া ইহা সত্যেনকে পাঠান হয়।

কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে নরেন যখন এজাহার লিখিবার জন্য হাসপাতালে আসিবে, তখন এই কার্য্যটি সমাধা করা হইবে। পূর্ব্ব দিনের অসমাপ্ত এজাহার লিখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রাতে সাতটার সময় সত্যেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। হিগিনস্ নামক একজন ইউরোপীয় কয়েদী তাহার দেহরক্ষিরূপে আসিলেও, খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে বলিয়া সে অন্যত্র সরিয়া যায়। কানাইলাল রিভলবার হস্তে সেই সময় দাঁত মাজিবার ভাণ করিয়া একতলার বারান্দার ঘাঁটি আগলাইয়া রহিলেন, যাহাতে নরেন্দ্রনাথ পলাইয়া যাইতে না পারেন।

উপেন্দ্রনাথ, নরেন গোঁসাইকে কি প্রকারে হত্যা করা হয় তাহার এক বিবরণে বলেন, "কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া

তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে, তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটি গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবা মাত্র কানাইলাল হাসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে, নরেন কোথায় পলাইয়াছে, তাহা যদি সে না বলিয়া দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে, নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটি জেলার, এ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার সবাই সদলবলে হাসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাইএর রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে জেলারবাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ লাঠি-সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।"

নরেন গোঁসাই হত্যাকাণ্ড

নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞাহীন দেহ হাসপাতলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেইখানে অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বসুদ্ধ নয়টি গুলি করেন; তন্মধ্যে চারটি গুলি নরেন্দ্রের শরীরের বিভিন্ন

স্থানে বিদ্ধ হয়, একটি গুলি ডাক্তারখানার ভিতরের দেওয়ালে, দুইটি গুলি বাহিরে এবং শেষ গুলি নরেন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ হয়। কানাইলাল সমস্ত গুলি নিঃশেষ করিয়া রিভলভারটি মাটিতে ফেলিয়া দিলে, তবে তাহাকে সাহস করিয়া ধরা হয়।

জেলের ভিতরে রাজসাক্ষীকে এই ভাবে হত্যা করা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই প্রকার হত্যাকাণ্ড খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ অব্দে গ্রীসের এক ঘটনার সহিত উপমেয়। তথায় জেলের মধ্যে দেশদ্রোহীকে নিহত করিয়া হারমোডিয়াস ও এ্যারিস্‌টোজিটন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। অদ্যাপি সেই জন্য তাঁহারা গ্রীসে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বার এইরূপ কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হন।

গোঁসাইএর হত্যাকাণ্ডের পর আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ. এ. ম্যার উক্ত ঘটনার তদন্ত করিয়া যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, সেই সম্বন্ধে কানাইলালের কিছু বলিবার আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কানাইলাল বলেন যে, ইন্দ্রনাথ নন্দীর কথা সাক্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং তিনটি রিভলভার ছিল বলিয়া যাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সত্য নয়। ইন্দ্রনাথকে জড়াইবার জন্য তিনটি রিভলভারের অবতারণা করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তাহ'লে তুমি স্বীকার করচো যে, তোমরাই নরেনকে মেরেছো।"

কানাই—"হাঁ, আমি ও সত্যেন আমরা উভয়েই নরেনকে মেরেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কেন মেরেছো?"

কানাই—"কেন মেরেছি তার কোন কারণ বলতে পারবো না—(একটু চিন্তা করিয়া) না—কারণটাও বলা দরকার। নরেন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তাই তাহাকে খুন করেছি।"

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে জেলের বাহিরে যে সকল বিপ্লবী ছিলেন, তাঁহাদের

মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং গুপ্তচর ও গোয়েন্দাদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

হত্যার অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের বিচার আরম্ভ হইল। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করিয়া মিঃ ম্যার মকদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ. আর. রো সাহেবের আদালতে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার আরম্ভ হয়। সতীর্থ সত্যেনকে বাঁচাইবার জন্য কানাই নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া আদালতে বর্ণনা দিলেন। বিচারের পর জজ মিঃ রো কানাইলালকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথকে দুই জন শ্বেতাঙ্গ জুরী দোষী এবং তিন জন ভারতীয় জুরী নির্দ্দোষ ইহাও বলায়, জজ সত্যেনের মকদ্দমা পুনরায় বিচারের জন্য হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন।

কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র-নাথের ফাঁসি

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কক্স ও বিচারপতি সফিরুদ্দিনের এজলাসে সত্যেন্দ্রনাথের মকদ্দমার শুনানী হয়। কানাইলালের ফাঁসির হুকুমও হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া ইহাও সত্যেনের মকদ্দমার সহিত উত্থাপিত হয়। ২১শে অক্টোবর তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং এই সঙ্গে কানাইলালের দণ্ডও অনুমোদন করেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ দানের পর ১০ই নভেম্বর কানাইলাল এবং ২১শে নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দেন। ফাঁসির আদেশের পর কানাইলাল ওজনে ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়াছিলেন—উভয়েই প্রফুল্লমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে গিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ভীক, নির্ব্বিকার, আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া জেলার সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ সকলেই হতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। "মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছিল তারা সঙ্গীতের মত"—কবির এই মর্ম্মোত্থিত বাণী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল কানাই ও সত্যেন্দ্রের জীবনে। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেশবাসীর অতুল সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন।

মাণিকতলা বোমার মামলার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে, আলিপুর জেল হইতে বোমার মামলার আসামী শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির পলায়নের চেষ্টা। এই সম্পর্কে শ্রীসুকুমার মিত্র এক বিবরণে বলেন, "এক দিন বারীন্দ্র দাদা আমাকে পত্রে জানাইলেন

জেল হইতে পলায়নের ষড়যন্ত্র

যে, তাঁহারা জেল হইতে পলায়ন করিবেন ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি আমাকে জানান যে, আমি যেন একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া দেই, তাহাতে জেল হইতে চতুর্দিকে যাইবার রাস্তা সকল এবং কোথায় কোথায় পুলিশের থানা ও ফাঁড়ি আছে তাহা যেন চিহ্নিত করিয়া দেই। বিশেষ করিয়া গঙ্গার দিকে যাইবার রাস্তা, গলি, ক্ষুদ্র গলি, পায়ে হাঁটা পথ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ম্যাপে দেখাইয়া দেই। তদুপরি বাহিরে আসিলে শ্রীঅরবিন্দকে কোনরূপে যেন দ্রুত সরাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

"তখন কলিকাতায় খুব কমই মোটর গাড়ী ছিল। মোটর গাড়ীতেই অরবিন্দকে নিজেই সরাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করি। তদনুসারে আমার বন্ধু মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেঁচকাপুরের জমিদার স্বর্গীয় নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহকে বলি যে, তিনি যেন তাঁহার বন্ধু নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁকে বলেন যে, আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিখিতে চাই, সে জন্য রাজা যেন তাঁহার চালককে দিয়া আমায় গাড়ী চালাইতে শিক্ষা দেন। রাজা মহাশয় ইহাতে রাজী হন।

"বারীন্দ্র দাদার নির্দেশ পালন করিবার জন্য আমি নোয়াখালীর অন্তর্গত লামচরের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে কলিকাতার আলিপুরের অংশের ম্যাপ দেই এবং তাঁহাকে আদিগঙ্গার উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে যত রাস্তা ও গলি আছে সেই সকল রাস্তা দিয়া যাইতে ও পুলিশের ঘাঁটি সকল কোথায় আছে তাহা উক্ত ম্যাপে চিহ্নিত করিয়া দিতে বলি। এই জন্য তাঁহাকে আমার বাইসাইকেল ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি একটি নিখুঁত ম্যাপ প্রস্তুত করেন। সুরেন্দ্রকুমার ছিলেন এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম কর্মী, ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। সকল কর্মে তিনি আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ ছিলেন।..... অনুরূপ ভাবে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসকে

আলিপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের ম্যাপ তৈয়ারী করিতে বলি ও তাঁহাকে আমার অপর বাইসাইকেল দেই। তিনিও ঐরূপ ম্যাপ তৈয়ারী করিয়া দেন।

"ইতিমধ্যে আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করি। তাহার পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম, আলিপুর জেলে কড়া পাহারা বসিয়াছে এবং জেলের পশ্চিমে যে দিকের দেওয়াল টপকাইয়া আসামীদের পলায়নের কথা ছিল তথায় প্রহরী বসিয়াছে ও দেয়ালের উপর আলোক দেওয়া হইয়াছে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় ছিল ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা ও বেলভেডিয়ার ছিল। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পরে আমি অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা পলায়নের ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ করিলেন কেন? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের ভিতরের কোন একজন কর্ত্তৃপক্ষকে এই পলায়নের কথা জানাইয়াছিল। সে ব্যক্তি পরে খালাস পায় অরবিন্দ তাহার নামও আমাকে বলিয়াছিলেন।"

পলায়নের ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলেও বোমার মামলার বন্দিগণ মকদ্দমার ভবিষ্যতের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বন্দীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলে, "যে কয়েক দিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ, তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী, লেখা-সাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষন্নতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল।

এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ্‌, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবন-চরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশী গানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য-বিষয়ক অল্প-স্বল্প পুস্তক। সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতার মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যেদিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শাস্ত খেলা কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, দিনকতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিন কতক কানামাছিই চলিল ; এক এক দিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া এক দিকে জুজুৎসু শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ, আর এক দিকে draits বা দশ পঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকদেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যা বেলায় গানের মজলিস্ জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমচন্দ্র দাস, যাঁহারা গানে সিদ্ধ তাঁহাদের চারি দিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক এক দিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় কেবল উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, Ventriloquism, অনুকরণ বা গেঁজের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। মকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত।"

অপর এক বিবরণে উপেন্দ্রনাথ বলেন, "স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহা স্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে-গাহিতে চীৎকার করিতে-করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি বাংলায় জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেন্টুলোনটা কোথায় ছেঁড়া, আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট-ইন্সপেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে

কি আরশুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত ; আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম।

"কানাইলাল প্রভৃতি চার-পাঁচ জন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম, বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যেদিন সে সব কিছু মিলিত না, সেদিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, কানাই এক জনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরে মুখ লুকাইলেন ; নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চুরিও ধরা পড়িল না।"

য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের পরিচালিত 'তলোয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত হিন্দী সঙ্গীতটি বোমার মামলার আসামীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জেল হইতে আদালতে যাওয়ার সময় এবং আসার সময় তাঁহারা প্রায়ই সমস্বরে গাহিতেন :

"আও মর্দানা জঙ্গী জোয়ানা
জলদি লেও হাতিয়ার।
গোরে তুম পর জুলুম কর্তি হ্যায়
দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হ্যায়
সারে রূপিয়া তুমসে লেকর—আব বনে সাওকার।"

সেসনে বহু দিন ধরিয়া মামলা চলার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে সেসন জজ মিঃ সি. পি. বীচক্রফট মামলার রায় প্রদান করেন। তিনি বারীন্দ্র ও উল্লাসকরকে চরম দণ্ড প্রদান করেন। উপেন্দ্র, বিভূতি, হৃষিকেশ, বীরেন্দ্র

সেন, সুধীর, অবিনাশ, ইন্দ্র নন্দী ও শৈলেন বসুর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; পরেশ মৌলিক, শিশির ও নিরাপদর দশ বৎসর দ্বীপান্তর; অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানে ও সুশীল সেনের সাত বৎসর দ্বীপান্তর ও কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার অপরাধে পূর্ব্বেই কানাইলালের ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসির হুকুম হয়, সেজন্য বীচ্‌ক্রফট সাহেবের বিচারে তাঁহাদের সম্বন্ধে দণ্ডদানের প্রশ্ন ছিল না। বাকী অন্য সব আসামী মুক্তিলাভ করেন।

সরকার পক্ষ শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব ষড়্‌যন্ত্রের সহিত সংস্রব প্রমাণ করিবার জন্য যে সাক্ষ্য-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন করিতে চিত্তরঞ্জন দাশ যে আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধি ও আইন জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

নর্টন সাহেব কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাইয়া, পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বৃটিশ বিদ্বেষ প্রণোদিত হওয়াই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন এবং জাতীয় দল গঠন করিয়া দেশকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছিলেন। নর্টন সাহেব এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বহু চিঠি পত্র প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বারীন্দ্রকুমারের লেখা বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড। উহাতে লেখা ছিল, "এখনই মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়।" ঐ কার্ডখানি পুলিশ নাকি পথিমধ্যে আটক করিয়াছিল এবং নর্টন প্রমাণ করিতে চাহেন "মিষ্টান্নর" অর্থ বোমা! এই অদ্ভুত যুক্তি গ্রহণ করা দূরের কথা চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যায় এসেসরগণের সিদ্ধান্ত হইল ঐ চিঠি একেবারেই জাল। জজ ওরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ সাক্ষ্যের কোনই মূল্য নাই।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর বিবরণ ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিলনা। তবে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহাকে জড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গোঁসাই জেলে নিহত হওয়ায় তাঁহার উক্তি আইন অনুসারে গ্রাহ্য হয় নাই।

অপর পক্ষে সরকারী কৌঁসুলীর যুক্তি-ধূম্রজাল উড়াইয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করেন যে, এ পর্য্যন্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাহা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই বে-আইনী হইতে পারে না। দেশপ্রেম কোন আইন অনুসারেই দূষ্য হইতে পারে না।

বিচার শেষে জজ ও এসেসর দিগের নিকট শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন আদর্শ অপূর্ব্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

"Long after this Controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but accross distant seas and lands"

জজ বীচ্‌ক্রফট চিত্তরঞ্জনের যুক্তি মানিয়া শ্রীঅরবিন্দকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন।

দণ্ডিত আসামীদের আপীলের শুনানী হয় কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স. এইচ. জেনকিনস্ ও বিচারপতি কারনডফএর আদালতে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর আপীলের রায় প্রকাশিত হয়। বিচারে বারীন্দ্র ও উল্লাসের ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া উহা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইল। হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের পূর্ব্বের সাজাই বহাল রহিল। নিম্নলিখিত কয়েক জনের দণ্ড হ্রাস পাইল—বিভূতিভূষণ, ইন্দুভূষণ রায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল দশ বৎসর দ্বীপান্তর, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরেশ মৌলিক ও সুধীরকুমার সরকার সাত বৎসর দ্বীপান্তর, শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায় পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বালকৃষ্ণ হরি কানে পাইলেন মুক্তি। নিম্নলিখিত পাঁচ জনের সম্পর্কে বিচারপতিদ্বয়ের মতভেদ হওয়ায় আইনের বিধান

মতে তাঁহাদের আপীলে তৃতীয় জজ হ্যারিংটন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও শৈলেন্দ্রনাথ বসুর দণ্ড বহাল রাখিয়া সুশীল সেন, ইন্দ্রনাথ নন্দী ও কৃষ্ণজীবন সান্যালকে মুক্তি দিলেন।

মাণিকতলা বোমার বিচারকালে 'যুগান্তরে' নিম্নলিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতাই বিপ্লবী বাংলার মর্মবাণী।

"আমি মরণ আজিকে বরণ করিব
শরণ তবু না চাই,
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে
লাঞ্ছনা সুখে বহিব
তবু শরণ কভু না মাগিব।
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাহি না দৈব
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
তবু যন্ত্রণা তাহাতে নাই
আমি বজ্র ধরিতে চাই,
আজি বিশ্বে—কাহারে করি নাকো ভয়
ভয়েরে করেছি জয়
শাসন বাঁধন কিছুই মানি না
ঝঞ্ঝা প্রলয় লয়
শয়ান-শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে
মরণ নিঃসংশয়
তবুও করি নাকো ভয়।

## অরবিন্দের অন্তর্দ্ধান

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া ৬নং কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার ন'মাসীর (কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী) নিকট আসিয়া উঠেন। হঠাৎ তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হন। তখন হইতে তিনি চন্দননগরে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্যান্ত ১০ মাস কাল ঐ বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন।

জেলের বাহিরে আসিয়া তিনি দেশব্যাপী সরকারী উৎপীড়নে জনগণের মনে ভীতির ভাব লক্ষ্য করেন। সেই সময় অনেকেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলিতে ছিল। ইংরাজীতে যাহাকে 'সমাধিক্ষেত্রে নীরবতা' বলে জনসাধারণের মধ্যে অনেকটা সেই স্তব্ধতা আসিয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশের এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমি যখন জেলে গিয়াছিলাম তখন সারা দেশ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দ্বারা সজীব ছিল। জাতির ভবিষ্যৎ আশায় জীবিতছিল লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা অধঃপতিত অবস্থা হইতে সবে মাত্র উত্থিত হইয়াছে তাহাদের আশা লইয়া জাতি জীবিত ছিল। আমি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই ধ্বনি শুনিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নীরবতা দেখি। দেশে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল এবং জনসাধারণকে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

জেল হইতে মুক্তিলাভের পর সুরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে 'বেঙ্গলী পত্রিকা' পরিচালনা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নিজস্ব মত প্রকাশ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন। তিনি কর্ম্মহীন না থাকিয়া কিছুদিন পরেই সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরাজী ভাষায় লেখা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কর্ম্মযোগিন'। তাহার পর তিনি 'ধর্ম্ম' নামক পত্রিকা বাঙ্গলায় প্রকাশ করেন।

তাঁহার 'কর্ম্মযোগিন' পত্রিকার মলাটে রথে উপবিষ্ট অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ছবি ছিল এবং তাহার নীচে গীতা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করা থাকিত, যাহার অর্থ ছিল, "যোগ হইল কর্ম্মে কুশলতা।"

'কর্ম্মযোগিনে'র আদর্শ সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে পত্রিকার আদর্শ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, "কর্ম্মযোগিন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সংবাদ অপেক্ষা জাতির কার্য্য-কুশলতার আলোচনাই অধিক থাকিবে। জাতির আত্মার প্রগতি এবং জাতির জীবনকে যাহা সাহায্য করে, বা বাধা দেয় অথবা প্রভাবিত করে, কেবলমাত্র সেই সকল চলতি সংবাদ প্রকাশিত হইবে। ...... যদি সৃষ্টি না থাকে তবে নিশ্চয়ই ধ্বংস আছে, যদি অগ্রগতি ও জয় না থাকে তবে অবশ্যই পশ্চাদগমন ও পরাজয় আছে।"

কর্ম্মযোগিন

সেই সময় মিণ্টো-মর্লি শাসন সংস্কারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়া 'কর্ম্মযোগিনে' বলা হয় যে উহা ফাঁকা ও অব্যবহার্য্য। উহা দেশের লোকের মধ্যে নূতন বৈরিতা আনিবে এবং এক দিকে শাসনের কঠোরতা, অপর দিকে তুষ্টি প্রদান এক বিপজ্জনক দ্বিমুখী শাসন কৌশল। শ্রীঅরবিন্দ লেখেন যে, এই শাসন-সংস্কার ভূয়া ও একটা ফাঁদ মাত্র। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত তাহার সম্পর্কে 'কর্ম্মযোগিনে' "আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে তিনি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি দেশের প্রধান সমস্যা সকল সম্পর্কে সাহসিকতার সহিত পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করিয়া যে কর্ম্ম-ধারা প্রণয়ন করেন তাহাতে ছয়টি বিষয় ছিল। পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে সমগ্র দেশ তাঁহার এই কার্য্যধারা গ্রহণে অক্ষম।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে এক গোপন সংবাদ শুনা গেল যে, শ্রীঅরবিন্দকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার জন্য কলিকাতার পুলিশ জল্পনা কল্পনা করিতেছে। ইহা জানিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত 'খোলা চিঠি' লেখেন। উহাতে তিনি বলেন যে, "যদি আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়, যদি আমি আর না ফিরি, তাহা হইলে এই আমার শেষ রাজনৈতিক উইল ( Will ) বা ইচ্ছা দেশবাসীর নিকট জানাইলাম।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধে একদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁহার 'কর্ম্মযোগিন পত্রিকা' কার্য্যালয়ে কর্ম্মেনিরত ছিলেন, তখন তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী রামচন্দ্র মজুমদার আসিয়া শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন যে, 'কর্ম্মযোগিনে' লিখিত কোনও প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের মামলা হইবে বলিয়া তিনি সঠিক সংবাদ পাইয়াছেন এবং তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত যেন কি ভাবিলেন—তাহার পর বলিলেন আমি চন্দননগর যাইব। অন্যান্য দিনের ন্যায় আহারের পর 'কর্ম্মযোগিন' কার্য্যালয়ে গমন করেন। রাত্রে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

কলিকাতার আহিরীটোলা ঘাট হইতে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাত্রার এক বিবরণে শ্রীসুকুমার মিত্র বলেন, "সেই সন্ধ্যা রাত্রে যাত্রা করিয়া অরবিন্দ বীরেন্দ্র

অরবিন্দের চন্দননগর যাত্রা

ঘোষ ও সুরেশ চক্রবর্ত্তী সারা রাত্রি চন্দ্র-কিরণ উদ্ভাসিত নদী দিয়া নৌকা বাহিয়া প্রত্যুষের পূর্ব্বে চন্দননগরে পৌঁছেন। বীরেন্দ্রবাবুকে অরবিন্দ তথাকার চারুচন্দ্র রায়ের নিকট সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সম্ভবতঃ অরবিন্দ মনে করিয়াছিলেন যে, অগ্নিযুগের সহকর্ম্মী বলিয়া তাঁহাকে তিনি সাহায্য করিবেন। প্রেরিত লোককে চারুবাবু বলিলেন যে, তিনি অরবিন্দকে সাহায্য করিতে অসমর্থ এবং চন্দননগরে আশ্রয়লাভের চেষ্টা না করিয়া অরবিন্দের ফ্রান্সে যাওয়া উচিত। অরবিন্দ নৌকায় বসিয়া রহিলেন। লোকমুখে শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় শুনিতে পাইলেন যে অরবিন্দ নৌকায় আছেন। ইহা শুনিয়া দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া আগ্রহের সহিত অরবিন্দকে লইয়া তিনি সকলের অগোচরে তাঁহাকে স্থান দিলেন তাঁহার কাষ্ঠের গুদামে। অরবিন্দ যে চন্দন-নগরে আছেন তাহা তিনি কাহাকেও জানাইলেন না। এমন কি তাঁহার পত্নীকেও তাহা জানিতে দেন নাই। মতিবাবু নিজে বাহির হইতে অর-বিন্দের জন্য দুই বেলা আহার্য্য আনিয়া দিতেন। অরবিন্দের অন্তর্দ্ধানের পর কলিকাতার বহু সংবাদপত্রে তাঁহার অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে অনেক জল্পনা কল্পনা প্রকাশিত হইতেছিল। এই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'সার্ভেণ্ট'

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, অরবিন্দ যোগ সাধনের জন্য আত্মগোপন করিয়াছেন।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসুকুমার মিত্রকে লোক মারফৎ পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, তিনি পণ্ডিচেরী যাইতে চাহেন তজ্জন্য সকল ব্যবস্থা যেন ঠিক করিয়া রাখা হয়। টাকা পয়সার জন্য তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত কয়েকটি পত্র সুকুমারবাবুর নিকট প্রেরণ করেন এবং নির্দ্দেশ দেন যে টাকা যেন তিনি নিজেই আনাইয়া লন।

পণ্ডিচেরী যাইবার ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার মিত্র এক বিবরণে বলেন, "কি ভাবে অরবিন্দ চন্দননগর হইতে কলিকাতায় আসিবেন, যাত্রার দিন স্থির করা ইত্যাদি সকল ভারই লইতে হয়। প্রতি খুঁটিনাটিতে, প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা ও দূর দৃষ্টি লইয়া কার্য্য স্থির করি, তখন ছয় জন পুলিশের গুপ্তচর সর্ব্বক্ষণ আমাদের বাড়ীর সম্মুখে গোলদীঘিতে বসিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিত। আমি বাড়ীর বাহির হইলেই আমার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিত। ইহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া দিবাকালে নানা স্থানে কয়েকদিন যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনি। অতঃপর অরবিন্দ লিখিলেন যে তিনি পণ্ডিচেরী যাইবেন। তথায় পাঠাইবার ভার সমস্তই আমার উপর পড়িল। যেহেতু আমি বাড়ীর বাহির হইলেই গুপ্ত পুলিশ প্রকাশ্যভাবে আমার সঙ্গ লইত ও সর্ব্বদা পার্শ্বে থাকিত সেই হেতু আমি নিজে অরবিন্দকে পণ্ডিচেরী পাঠাইবার ব্যবস্থা না করিয়া আমার বিশ্বস্ত দুই জনকে নানারূপ নির্দ্দেশ দিয়া কাজ করাইয়াছি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির বিশ্বস্ত কর্ম্মী শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে তাহার কলেজ ষ্ট্রীটের মেস বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া অরবিন্দের দুইটি ষ্টিল ট্রাঙ্ক তাহার বাসায় লইয়া রাখিতে বলি। সে প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। পরে তাহা মেসে লইয়া গেল।"

পণ্ডিচেরী যাত্রার উদ্যোগপর্ব্ব

শ্রীঅরবিন্দকে রেলে না পাঠাইয়া ফরাসী জাহাজে পাঠান স্থির হয়।—কারণ রেলে ভ্রমণ করিলে দীর্ঘ পথের মধ্যে অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ

হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাহা ছাড়া গুপ্তচরের সতর্ক দৃষ্টি রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর থাকার সম্ভাবনায় রেলে যাওয়া বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়। সেই সময় কলিকাতায় Messegaries Maritimes নামক এক ফরাসী জাহাজ কোম্পানীর অফিস ছিল। ফরাসী জাহাজ ছাড়াও অন্যান্য কোম্পানীর জাহাজও কলম্বো যাইত কিন্তু অন্যান্য জাহাজ পণ্ডিচেরী থামিত না। ফরাসী জাহাজে কলম্বোর টিকিট কিনিয়া পথিমধ্যে পণ্ডিচেরী নামিয়া পড়ার সুবিধা ছাড়াও, ফরাসী জাহাজের যাত্রী হইলে একটি রাজনৈতিক সুবিধা ছিল এই যে, বাংলা দেশের তথা বৃটিশ ভারতের সমুদ্রতট হইতে তিন মাইল সমুদ্র অতিক্রম করিলেই ঐ জাহাজের যাত্রীগণ ফরাসী আইনের অধীন হইত।

জাহাজের টিকিট ক্রয় এবং শ্রীঅরবিন্দের যাত্রার প্রাথমিক ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার মিত্র বলেন, "অরবিন্দ যাইবেন পণ্ডিচেরী কিন্তু শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে টিকিট কিনিতে বলি কলম্বোর, কারণ পণ্ডিচেরীর টিকিট কিনিলে সরকারের যদি সন্দেহ হয় যে রেলে না যাইয়া এই দুই যাত্রী পণ্ডিচেরী যাইতেছে কেন? তদুপরি পুলিশের যদি সন্দেহ হয়, তবে কলম্বোতে বাঙালী যাত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিবে। জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট জাহাজ কোম্পানীর অফিসে ক্রয় না করিয়া Thomas Cook কোংর অফিসে ক্রয় করিবার জন্য শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে বলি। ইহার কারণ এই যে, পুলিশ যদি সন্দেহ করে তবে উক্ত ফরাসী কোম্পানী হইতে অল্প সময়েই সংবাদ পাইবে যে দুইজন বাঙালী যাত্রী যাইতেছে। কিন্তু Thomas Cook হইতে টিকিট কিনিলে যাত্রীদের বিবরণ ফরাসী কোম্পানীর নিকট পৌছাইতে কিছু সময় যাইবে। এই সকল কার্য্যে সময় প্রধান কথা। 'সঞ্জীবনী'র গ্রাহক তালিকা হইতে দুইজন গ্রাহকের নাম বাছিয়া লওয়া হইল। একজন রংপুরের ও একজন ডিব্রুগড় মহকুমার অধিবাসী। উঁহাদের প্রত্যেকেই এমন গ্রামে বাস করিতেন যাহা রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে। পুলিশ তাহার সন্ধান করিতে যাইলে যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সন্ধান না করিতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। শ্রীমান নগেন্দ্র যখন Thomas Cook কোম্পানীতে ইঁহাদের নামে ডুপ্লে ( Dupleix )

জাহাজের টিকিট ক্রয় করিতেছিলেন তখন একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রদত্ত যাত্রীর নাম শুনিয়া মন্তব্য করেন "Jaw breaking name"।

"অরবিন্দের সহিত স্বর্গীয় বিজয় নাগের যাইবার কথা ছিল। সেজন্য দুই জনের জন্য একটি দুইবার্থ বিশিষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিন ভাড়া করিতে উপদেশ দিয়া যাত্রীদের নাম ধাম লিখিয়া যে টাকার প্রয়োজন তাহা নগেন্দ্রকে দেই। দুই বার্থের ক্যাবিন ভাড়া করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিশিতে বা তাহাদের কাহারও ইঁহাদের সহিত কথা বলিবার সুবিধা হইবে না কিম্বা চিনিবারও কম সম্ভাবনা হইবে। ইঁহারা ক্যাবিন হইতে বাহির না হইলেও সন্দেহ হইবে না, যেহেতু জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অজুহাত দেখান হইয়াছিল যে একজন ম্যালেরিয়া-পীড়িত যাত্রী আছেন। নগেন্দ্র দুইখানি টিকিট আনিল এবং বলিল, দুইজন মাত্র যাত্রী যাইতে পারে এইরূপ ক্যাবিন ভাড়া করিয়াছে ও আমাকে টিকিট দেখাইলে আমি সেগুলি তাহার নিকট রাখিতে বলিলাম। পয়লা এপ্রিল নগেন্দ্রকে ডাকিয়া তাহাকে অরবিন্দের ষ্টিল ট্রাঙ্ক দুইটি 'ডুপ্লে' জাহাজে ভাড়া-করা ক্যাবিনে রাখিয়া আসিতে বলিলাম এবং টিকিট দুইখানি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দেখাইয়া ক্যাবিন বন্ধ করিয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিলাম।—নগেন্দ্র ট্রাঙ্ক জাহাজে রাখিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল।"

চন্দননগর হইতে 'ডুপ্লে' জাহাজ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দকে পৌছাইয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা স্থির হয়। শ্রীসুকুমার মিত্র তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন যে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে নৌকা ভাড়া করিয়া গঙ্গা নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাইতে হইবে। তৎপর নদীবক্ষে একটি বিশেষ রঙ্গের পতাকা-বিশিষ্ট নৌকা দেখিলে তাহার আরোহীদিগকে নিজ নৌকায় উঠাইয়া লইয়া কেল্লার ঘাটে অবস্থিত 'ডুপ্লে' জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। সুকুমারবাবু, সুরেন্দ্রকুমারের হস্তে গৃহে প্রস্তুত একটি পতাকা দিয়া তাহা নৌকার উচ্চ স্থানে লাগাইয়া দিতে বলেন। অনুরূপ পতাকা অপর নৌকাতেও থাকিবে, ইহাও সুকুমারবাবু জানাইয়া দিলেন।

চন্দননগর হইতে যে নৌকা কলিকাতার দিকে আসিতেছিল সেই নৌকা

হইতে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে প্রেরিত নৌকায় উঠিয়া নদীবক্ষে নৌকা বদল করিবেন ইহা স্থির ছিল। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে যে নৌকায় আসিবেন, যাহাতে তাহা চিনিতে পারা যায় তজ্জন্য আর একটি গৃহে তৈয়ারী পতাকা লোক মারফৎ পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে দূর হইতে দেখা যায় তজ্জন্য নৌকার উচ্চ স্থানে লাগাইতে বলিয়া দেওয়া হয় যে, অনুরূপ পতাকা বিশিষ্ট যে নৌকা কলিকাতা হইতে উজাইয়া উত্তর দিকে যাইবে তাঁহারা যেন চন্দননগরের ভাড়া করা নৌকা তাহার নিকট লইয়া গিয়া উঠেন। বহু নৌকার মধ্যে চিনিবার জন্য নিশানের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ শেষ রাত্রিতে চন্দ্রালোকে চন্দননগর হইতে নৌকায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মতিলাল রায় তাঁহার নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথের মধ্যে নৌকা পরিবর্ত্তন করার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিতেন। তিনি বিজয় নাগের সহিত ঐ নৌকার সহযাত্রী ছিলেন। কোন্ দিন কোন্ সময় শ্রীঅরবিন্দ যাত্রা করিবেন তাহা শ্রীসুকুমার মিত্র স্থির করেন। এই বিষয় শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মন্মথ বিশ্বাস, উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় ( মিছরী বাবু ) ও বিজয় নাগ জানিতেন। আর কাহাকেও এই কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই।

নৌকা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থার কারণ এই যে, যদি কোনও ক্রমে পুলিশ জানিতে পারে যে, একখানি নৌকা করিয়া দুই ব্যক্তি চন্দননগর হইতে, রেল ভ্রমণের সহজ উপায় থাকিতে সরাসরি কলিকাতায় যাইয়া ফরাসী জাহাজে উঠিয়াছে ও মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথার সত্যতার প্রমাণ পায়, তাহা হইলে পুলিশের সন্দেহ হইবে এবং হয়ত নদীপথে কলম্বোগামী জাহাজ আটক করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করিবে। কলিকাতা হইতে প্রেরিত যুবকদ্বয় অল্পবয়স্ক ছিল, সেজন্য নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে না পারায় নৌকার যোগাযোগের ব্যতিক্রম হয় এবং তাহার ফলে উক্ত ব্যবস্থামত কার্য্য হয় নাই।

কলিকাতা হইতে প্রেরিত নৌকা করিয়া সোজাসুজি কেল্লার ঘাটে যাইয়া

নদীর দিক হইতে 'ডুপ্লে' জাহাজে অরবিন্দের উঠিবার কথা ছিল, কিন্তু নির্দ্দেশমত কার্য্য না হওয়ায় সংযোগ সূত্র হারাইয়া যায়।

নদীর দিক হইতে যাহাতে শ্রীঅরবিন্দ জাহাজে উঠিতে পারেন জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—কারণ মনে হইয়াছিল যে, যদি বৃটিশের গুপ্তচর জাহাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে তাহা হইলে স্বভাবতঃ সে তীর হইতে জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির যে ব্যবস্থা তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিবে। তীরের বিপরীত দিক হইতে জাহাজের গাত্র বাহিয়া যে অল্প-পরিসর গুটান সিঁড়ি থাকে তাহা ব্যবহার করিলে গুপ্তচর জানিতে পারিবে না। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকিতেন তথায় ম্যালেরিয়া পীড়িত এক অসুস্থ ব্যক্তি বাস করিতেছেন, এই কথাই প্রতিবেশীদের মধ্যে রাষ্ট্র করা হইয়াছিল। অসুস্থ ব্যক্তি নৌকায় আসিয়া জাহাজে উঠিবেন এবং সমুদ্র-বায়ু সেবনের দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে যাইতেছেন ক্যাপ্টেনকে সেই অজুহাত দেখাইয়া বিপরীত দিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

অপরদিকে বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে প্রেরিত নৌকার সন্ধান করিতে না পারিয়া বৈকালে শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা লাগাইয়া মন্মথনাথ বিশ্বাসকে শ্রীসুকুমার মিত্রের নিকট পাঠাইয়া সমস্ত গোলযোগের বৃত্তান্ত জানাইলেন। এদিকে কলিকাতা হইতে প্রেরিত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুকুমার মিত্রকে তাঁহাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা বলিলেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার শেষ পর্য্যায়ের ঘটনা বিবৃত করিয়া শ্রীসুকুমার মিত্র বলেন, "সুরেন্দ্রকুমারের কথা শুনিয়াই অরবিন্দের আর যাওয়া হইল না মনে করিয়া আমি বিশেষ চিন্তিত হই ও নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে পুনরায় জাহাজে পাঠাইয়া ক্যাবিন হইতে অরবিন্দের জিনিষ পত্র নামাইয়া আনিতে বলিয়াছিলাম। কারণ, পরদিন প্রাতেই 'ডুপ্লে' জাহাজ ছাড়িবার কথা। ট্রাঙ্ক সহ ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্র বলিল যে, ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে

পণ্ডিচেরী যাত্রার শেষ পর্য্যায়

মন্মথবাবুর নিকট সকল কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়া দেই যে, তাঁহারা যেন নৌকা করিয়া সোজা কেল্লার ঘাটে যান। জিনিষ পত্রাদি পুনরায় পাঠাইতেছি বলিয়া দিলাম। নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া অরবিন্দ প্রভৃতি চারজন তাহার জন্য কেল্লার ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন, জানাইলাম। জাহাজের ডাক্তারের বাড়ী যাইয়া তাঁহার নিকট স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট সহ জাহাজে উঠিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।"

"জাহাজ হইতে ফিরাইয়া আনা জিনিষ পত্রাদি যেগুলি তাঁহার বাসায় ছিল তাহা পুনরায় জাহাজে রাখিয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিলাম। তদনুসারে নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তখন আন্দাজ রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে। এদিকে সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'সঞ্জীবনী' অফিসের দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত। তিনি চুপি চুপি আমাদের বলিলেন অরবিন্দ নীচে গাড়ীর মধ্যে আছেন। ইহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাড়ীর অপরদিকে সর্ব্বক্ষণ যে ছয় জোড়া চক্ষু এবাড়ীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে তাহাতে অরবিন্দ আসিয়া নূতন বিপদে পড়িতে পারেন বলিয়া চঞ্চল হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া দেখিলাম, এক দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ ঠিকা গাড়ীতে অরবিন্দ স্থির ও নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছেন। গাড়ীর মধ্যভাগের দুইদিকের জানালা খোলা। ইহা আমাকে আরও ত্রস্ত করিল।"

"আমি তাঁহাকে বলিলাম করিয়াছ কি? ঐ দেখ গোলদীঘিতে ছয়জন গুপ্তচর বসিয়া আছে। অবিলম্বে জাহাজ ঘাটে (অর্থাৎ কেল্লা ঘাটে) চলিয়া যাও, আমি জিনিষ পত্রাদি ও লোক পাঠাইয়া দিয়াছি।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত ইহাই যে আমার শেষ সাক্ষাৎ, তাহা কে জানিত!"

"এদিকে নগেন্দ্রকুমার কেল্লার ঘাটে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতে দেখিয়া সেই গাড়ীর নিকট যাইয়া অমরেন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাইলেন। জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি ট্রাঙ্ক দুইটি অরবিন্দের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট ব্যতীত জাহাজে যাওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া শেষ চেষ্টা হিসাবে

জাহাজের একটি বাঙালী কুলীর সাহায্যে থিয়েটার রোডে ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সেই সময় নৈশ আহারের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন। বেয়ারাকে কিছু টাকা দিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইল। নগেন্দ্রকুমার তাঁহাদের দুইখানি টিকিট ও ডাক্তারের দর্শনী বাবদ ৩২৲ অরবিন্দের হাতে দিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার অরবিন্দ ও বিজয় নাগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কয়েক মিনিট আলাপের পরে অরবিন্দের ইংরাজী শুনিয়া ডাক্তার প্রশ্ন করেন, "আপনি কি ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন?" অরবিন্দ তাহা স্বীকার করিলেন। অতঃপর ডাক্তার উভয়কে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিলেন। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

যাত্রীদের লইয়া গাড়ী যখন কেল্লার ঘাটে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। জিনিষ পত্র লইয়া চারিজনে রিজার্ভ করা ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন। বিজয় নাগ অরবিন্দের জন্য বিছানা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ কতকগুলি নোট লইয়া অরবিন্দের হাত দিয়া বলিলেন যে, এগুলি 'মিছরীবাবু' দিয়াছেন।"

গভীর রাত্রে নগেন্দ্রকুমার 'সঞ্জীবনী' অফিসে গিয়া শ্রীসুকুমার মিত্রকে যাত্রার বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। সুকুমারবাবু পরদিন কলিকাতা হইতে একজনকে বাবা ভারতী ও চিদাম্বরম পিলের নিকট দুইখানা পত্র দিয়া ট্রেনযোগে পণ্ডিচেরী প্রেরণ করেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অরবিন্দ এই প্রথম পণ্ডিচেরী যাইতেছেন, সে জন্য তাঁহার অসুবিধা হইবে তাঁহারা যেন তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই দুই ভদ্রলোকই সুকুমারবাবুর অপরিচিত ছিলেন—কেবল মাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই দুই স্বদেশ প্রেমিকের নামের সঙ্গে দেশবাসী পরিচিত হইয়াছিলেন। চিদাম্বরম পিলে জাহাজ চালাইয়া ব্রিটিশ জাহাজের সহিত সফল প্রতিযোগিতা করেন। তাঁহারই জাহাজে অধিক সংখ্যক ভারতবাসী যাতায়াত করিত। ব্রিটিশ জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাতে ব্রিটিশের লোকসান হইতে থাকে, তাহার ফলে চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জনসভায় ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা করায় এবং স্বদেশ

অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আগমন

সেবার জন্য বাবা ভারতীর কারাদণ্ড হওয়ায় তাঁহার নাম সেই সময় ভারতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা দেশবিখ্যাত নেতা শ্রীঅরবিন্দকে এই দুর্বিপাকে সাহায্য করিবেন, এই আশাতেই সুকুমারবাবু পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার আশা বিফল হয় নাই। ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌছিলে চিদাম্বরম পিলে ও বাবা ভারতীর নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা শ্রীঅরবিন্দকে জাহাজঘাটায় সম্বর্দ্ধনা জানাইল। তখন পর্য্যন্ত কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে এ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার ৭।৮ দিন পরে এক রবিবার বৈকালে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আসিয়া বলেন যে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে বর্ত্তমানে ভারতের Director General of Criminal Investigation স্যার চার্লস ক্লেভল্যাণ্ড অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় পণ্ডিচেরী হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তিনি ঐ বিভাগের সাঙ্কেতিক ভাষা তর্জ্জমা করিয়া থাকেন এবং উক্ত টেলিগ্রামে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বলিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা নিশ্চয়ই চিন্তান্বিত আছেন, সেই জন্যই তিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের এই সংবাদ দিয়া গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ অন্তর্দ্ধান হইবার আট মাস পরে ইংরাজ সরকার 'কর্ম্মযোগীনে' প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের 'খোলা চিঠি' রাজদ্রোহকর মনে করিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করেন। তখন 'কর্ম্মযোগীন' বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মামলায় গভর্ণমেণ্ট বলেন যে গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে অরবিন্দ পলাইয়া গিয়াছেন। 'Madras Times' নামক পত্রিকা এই অভিযোগের এক উত্তর প্রকাশ করিয়া বলেন, অন্তরের প্রয়োজনে যোগ সাধনার জন্য তিনি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতেছেন। তথায় পৌছিবার পরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি ব্রিটিশ আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নন। নিম্ন আদালতে মুদ্রাকরের শাস্তি হয়। আপীলে জাষ্টিস উডরফ ও জাষ্টিস ফ্লেচার উক্ত প্রবন্ধ রাজদ্রোহকর নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন ও মুদ্রাকরকে মুক্তি দেন।

# রাজনৈতিক ডাকাইতি

ফাঁসি, দ্বীপান্তর, কারাগার কিছুতেই বিপ্লবীদের কর্ম্মশক্তিকে ম্লান করিতে পারিল না। বরং ইংরেজের এই রুদ্রনীতি বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ঘৃতাহুতি-স্বরূপই কাজ করিল। আলিপুরের মামলার পর অখণ্ড কেন্দ্রীভূত দল ভাঙ্গিয়া যায়। এক এক মণ্ডলী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। এই দলগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) উত্তরবঙ্গ দল, (২) পূর্ব্ববঙ্গের অনুশীলন দল, (৩) পশ্চিমবঙ্গ বা 'যুগান্তর' দল। কিন্তু প্রত্যেকটি দলই অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সহিত পরামর্শ করিত; তিনি বিভিন্ন দলের যোগ-সূত্র হিসাবে রহিলেন।

যে সমস্ত বিপ্লবী বাহিরে ছিলেন তাঁহারা ক্ষণিকের জন্য ছন্নছাড়া হইলেও অতি অল্প দিনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করা সুবিধা মনে করিয়া ছোট ছোট দল সৃষ্টি করেন। আত্মোন্নতি ও অনুশীলন ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইল। কার্ত্তিক-চন্দ্র দত্ত ও মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর একটি দল গঠিত হয় এবং নিখিলেশ্বর রায় প্রভৃতিও একটি দল গঠন করেন। প্রভাসচন্দ্র দেব, ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির কেদার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়শঙ্কর সেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'পন্থা'প্রকাশক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতা হইয়া অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ-সাধন ও গোপনে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশে রত হন। চোরবাগানে যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা এবং হ্যারিসন রোড ও মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের বণিক প্রেস হইতে গোপনে 'যুগান্তর' বাহির হইতে লাগিল। 'ছাত্রভাণ্ডারে'র দল শ্রমজীবি সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের সহিত একযোগে কাজ করিতে লাগিল। 'ছাত্রভাণ্ডারে'র দলস্থ অধ্যাপক বিমলচন্দ্র দেব, লাড্‌লিমোহন মিত্র (পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক), যতীন্দ্রলোচন মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর কলেজের

কতিপয় ছাত্রের সহযোগিতায় 'যুগান্তর পত্রিকা' মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় যুগান্তর দলের হরিশচন্দ্র শিকদার ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছন্নছাড়া দলগুলিকে একত্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন।

এই সময় ঢাকার অনুশীলন সমিতির দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলই অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্ব স্বীকার করে। পরে অবিনাশচন্দ্র উপযুক্ত লোক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় মনে করাতে, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সকলে মানিয়া লয়। দলগুলির সাধারণ সদস্যগণ অপর দলের সন্ধান না রাখিলেও, নেতাগণের মধ্যস্থতার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই।

এ সময়ে যে সকল দল গঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দল-গুলির সন্ধান ললিত চক্রবর্ত্তী হাওড়া ষড়্‌যন্ত্রের মামলায় ফাঁস করিয়া দেয়:— (১) শিবপুর দল, (২) কুর্চি দল, (৩) খিদিরপুর দল, (৪) চাঙ্গরিপোতার দল, (৫) মজিলপুর দল, (৬) হলুদবাড়ীর দল, (৭) কৃষ্ণনগর দল, (৮) নাটোর দল, (৯) ঝাউগাছা দল, (১০) যুগান্তর দল, (১১) ছাত্রভাণ্ডার দল ও (১২) রাজসাহী দল। এই দলগুলি ব্যতীত আরও বহু দল ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অনুশীলন দল, সাধনা সমিতির দল, বরিশালের প্রজ্ঞানন্দের দল, বগুড়ার যতীন্দ্র রায়ের দল প্রভৃতি প্রধান দলগুলি তখন যথেষ্ট সক্রিয় হইয়া উঠে।

আলিপুরে যে সময়ে বোমার মামলা চলিতেছিল, সেই সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী দলের উদ্যোগে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও ডাকাইতি সংঘটিত হয়। বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে চালু রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর। প্রথমে বাংলার কয়েকজন ধনী গুপ্ত সমিতিগুলিকে অর্থ-সাহায্য করিতেন, কিন্তু পরে তাঁহারা যখন হাত গুটাইলেন তখন অর্থ-সংগ্রহের জন্য ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লইবার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "রাজনৈতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার

পূর্ব্বেই এ মতটা পাকাপাকিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোক টাকা দেয় না। দুই-চার জন ব্রিফলেস ব্যারিষ্টার —যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহারাই কিছুকিছু সাহায্য করিতেন; কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনৈতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে ডাকাতি কেবল দেশের লোকের উপরই হইতে লাগিল। কারণ, বোধ হয় ইংরেজের বা গভর্ণমেণ্টের উপর ডাকাইতি করা তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।

রাজনৈতিক ডাকাইতি

"বঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক 'মেলোড্রামার' অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে। বাংলা আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছিল। ···ডাকাইতি বা গুপ্তহত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়, বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না. তাঁহারা সম্মুখ-যুদ্ধ করে। বাংলা ডাকাইতির দেশ; সেই জন্যই রাজনৈতিক ডাকাইতির ছড়াছড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

"ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। আমার বোধ হয়, কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয়, যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষকালে এই সব বিভিন্ন দল ভাল যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মাত্র সভ্যশ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ধর-পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্তকথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে সভ্য লওয়া হইয়াছিল।"

বাংলার বিপ্লববাদের সূত্রপাত হওয়ার কিছুদিন পর হইতেই ডাকাইতি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কথনও প্রবলভাবে কথনও বা মন্দগতিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বন্ধ হয় নাই। সাধারণতঃ জল পথে ও স্থল পথেই ডাকাইতি অনুষ্ঠিত হইত। তবে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার গার্ডেন রীচ ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে যে মোটর ডাকাইতি অনুষ্ঠিত হয় তাহা বিপ্লব ইতিহাসের নূতন অধ্যায়।

বিপ্লববাদীদের অনুষ্ঠিত অনেক ডাকাইতিতেই আশ্চর্য্য রকম সুশৃঙ্খলা ও কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অনুষ্ঠিত ডাকাইতি-গুলি বিশ্লেষণ করিলে বিপ্লবীদের কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা ও কোমল মনোবৃত্তি একই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ডাকাইতি করার পর বিপ্লববাদীরা সকলেরই গাত্র তল্লাসী করিত। বহুলোক একত্রিত হইয়া ডাকাইতি করিত। নূতন লোকও হয়ত সময় সময় থাকিত। সুতরাং নেতাগণ একেবারে বিশ্বাস করিয়া বা শৈথিল্য করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। কড়াক্রান্তি হিসাব না করিলে শৈথিল্য হইতে ক্রমে অর্থ আত্মসাৎও কেহ করিতে পারে। প্রত্যেককে পরীক্ষা করিবার অবসরও হয়ত পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। তাই ডাকাইতি করিতে গিয়া বিপ্লববাদীরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। ডাকাইতি যাহারা করিতে যাইতেন তাহারা সকলেই অর্থ সংগ্রহ করিতেন না। সেই জন্য নির্দিষ্ট লোক থাকিত, ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, অর্থ একত্র করা হইয়াছে, যিনি সেদিনকার নেতা তিনি প্রথমে একজনকে ডাকিয়া তাঁহার গাত্র তল্লাস করিতে বলিতেন। পরে প্রত্যেকের গাত্র তল্লাস করা হইত। নিয়ম বলিয়া সকলে ইহা মানিত। সাধারণ লোকের কু-প্রবৃত্তি সুযোগ পাইলে বৃদ্ধি পায়, এই কথা মনে রাখিয়া বিপ্লববাদীরা সাবধান হইত।

ডাকাইতির সময় বিপ্লববাদীরা স্ত্রীলোকদের গায়ে কথনও হাত দেন নাই।

একবার একস্থানে ডাকাইতি হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ চলিতেছে। যে বাড়ীতে ডাকাইতি হইতেছিল সেই বাড়ীর একজন স্ত্রীলোকের গলায় একছড়া হার ছিল। একজন উক্ত রমণীকে দেখিয়া হার-ছড়া লইতে যেই হাত বাড়াইয়াছে অমনই তাহার গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চড় পড়িতে বিপ্লববাদী ঘুরিয়া পড়িল। এই ঘটনায় জন্ম উক্ত বিপ্লবীর উপর শাসন ত চলিলই তাহা ছাড়া তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার আদেশ হইল। যিনি তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার নিকটেও কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল।

ডাকাইত দলের সদস্য তালিকাভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত :—

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম্ম জানিয়াও আমরা ডাকাইতি করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাইতিলব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত অর্থই নেতাকে দিব এবং তিনি পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা অর্পণ করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।

"যাঁহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, কপটাচারী, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী, জ্ঞাতি অথবা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদ-খোর, ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাইতি করিব।

"শপথ করিতেছি যে ডাকাইতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্ব্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কদাচ কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথ মিত্র মহাশয় কোন প্রকার ডাকাইতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের বিরুদ্ধে থাকিলেও সমিতির অধিকাংশ সভ্যই ডাকাইতির অনুকূলে মত পোষণ করিতেন। একবার এই উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে সমিতির কোন সভ্য রিভলবার চাহিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিষম রাগান্বিত হন এবং এই যাচঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যখন সার্কুলার রোডের আখড়া স্থাপিত হয়, তাহার কিছুদিন পরে সর্ব্বপ্রথম তারকেশ্বরে ডাকাইতির চেষ্টা হয়। ইহার কিছুদিন

পরে জনকয়েক কর্ম্মী কড়েয়ায় ডাকাইতি করেন। একজন ফিরিঙ্গিকে ধরিয়া তাহার টাকা কাড়িয়া লওয়া হয়।

ডাকাইতি সম্পর্কে বিপ্লবীদের প্রথম দিকে দৃঢ়তার অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রংপুরে মহীপুর গ্রামে যে ডাকাইতির প্রচেষ্টা হয়, তাহা গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে এই সংবাদেই পরিত্যক্ত হয়। মাণিকতলার বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই ডাকাইতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেম দাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী ও পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আর পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে। সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্ত্তী ও তাঁর ছেলে মনোরথ আমাদিগকে সাহায্য করে। মনোরথও একজন জমিদার।... কিন্তু মনোরথ রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয় গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন রকমে সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আমরা চলিয়া আসিলাম।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাঁকুড়ায় পুনরায় এক ডাকাইতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বীকারোক্তিতে আরও বলেন, "অতঃপর বাঁকুড়ায় যাই।...সেখান হইতে হাঁসডাঙ্গা যাই। স্থির হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ী লুঠ করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে।...বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। রাজার দারোয়ান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগকে খবর দিবে কথা ছিল। কিন্তু লোকটা এত মদ খাইয়াছিল যে আমাদের কাজ শেষ হয় নাই।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ডাকাইতি করিবার জন্ত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। শশী সরকার নামক একজন লক্ষ্যভেদী শিকারীর নিকট হইতে যুবক দল বন্দুক-চালনা শিক্ষা করিত ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাঝিদের নিকট হইতে নৌ-চালনা করিতে অভ্যাস করিত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন দল সর্বপ্রথম ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেখরনগর গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাইতি করে। এই ডাকাইতিতে বিশেষ সুবিধা হয় না; অপহৃত লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে সামান্য টাকা লইয়াই ডাকাত দলকে ফিরিতে হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জে একটি ডাকাইতি হয়। বিপ্লবীরা মাত্র ৮০৲ টাকা আনিতে সমর্থ হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে এক জন ছোরার আঘাতে আহত হয়। উক্ত বর্ষে আগষ্ট মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত আরগুলিয়া গ্রামের নিকট একটি পাটের অফিসে ডাকাইতির এক চেষ্টা হয়। উক্ত অফিসের লোকদের নিকট একটি দোনলা বন্দুক আছে জানিতে পারায় ঐ ডাকাতির প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মেদিনীপুরের হাটগেছ্যায় সরকারী ডাক লুণ্ঠিত হয়। পূজার ছুটিতে ক্ষুদিরামের ভগিনীপতি অমৃতবাবু তাঁহার হাটগেছ্যার বাড়ীতে সপরিবারে যান। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে ক্ষুদিরাম স্থানীয় ডাক-হরকরার নিকট হইতে সরকারী ডাক লুঠ করিবার মনস্থ করেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার নিমিত্ত ক্ষুদিরাম এক জন সহকর্মীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে তাঁহার ভগিনীপতির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ডাক লুঠ করার সম্পর্কে তাঁহার দিদি অপরূপা এক বিবরণে বলেন: "১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পূজার সময় আমরা হাটগেছ্যায় যাই। সেখানে লক্ষ্মীপূজার পর কালী-পূজার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যার সময় ডাক-হরকরার মেল-ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় জানতে পারি, ক্ষুদিরামই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এক জন দেখেছিল—কিন্তু পুলিশ তদন্তের সময় কেউ কোন কথা বলেনি। এর ফলে নিরপরাধ মঙ্গল ডুলের হ'ল আট মাস জেল। আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়াতে ক্ষুদিরাম সেই দিনই সকলের অগোচরে গভীর রাতে ধান-জমির জল কাদা ভেঙ্গে ৮ মাইল পথ হেঁটে গোপীগঞ্জের ষ্টীমার ধরে। তারপর কোলাঘাট হ'য়ে মেদিনীপুরে চলে যায়।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরের শ্রীহরিণ-

পাড়াতে এক ডাকাইতি হয়। ডাকাইত দলের নিকট ছোরা ও পিস্তল ছিল। গহনা ও নগদে প্রায় চারি শত টাকা লুন্ঠিত হয়।

মানিকতলার বোমার মামলা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইবার ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন অনুশীলন দল ঢাকার, নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাহ্রা গ্রামে একটি ডাকাইতি করিয়া ২৫৮৩০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাইতি সংঘটিত হয় এক অসৎ ধনী-পরিবারের গৃহে। রাইফেল, রিভলবার ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রায় ৫০ জন যুবক দুইটি নৌকায় চড়িয়া বাহ্রা গ্রামে প্রবেশ করিয়া এই লুণ্ঠন সম্পন্ন করে। গ্রামের লোক বাধা দেওয়াতে এক সংঘর্ষ বাধে এবং গুলীতে কেহ কেহ আহত হয়। এই ডাকাইত দলের নেতৃত্ব করিয়াছিল বিক্রমপুরের শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করেন—আশুতোষ দাশগুপ্ত ও অমৃতলাল হাজরা।

বাহ্রা ডাকাইতি

সংবাদ পাইয়া সাভার থানার দারোগা নৌকা করিয়া ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং পুলিশের গুলি গোপাল নামক একটি যুবকের ললাটে বিদ্ধ হওয়াতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাত্রিকালে দেহে ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। গোপালই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রথম শহীদ।

এই ডাকাইতির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রৈলোকনাথ চক্রবর্তী বলেন, "ডাকাইতেরা সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, তাহারা মধ্য-রাত্রিতে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন তাহাদের লুণ্ঠন-কার্য্য শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে। নৌকার দাঁড়ী-মাঝির কাজও তাহারাই চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাইতের দল নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। ডাকাইত দেখার জন্য খালের দুই পাড়ে শত শত লোক নৌকার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে। ডাকাইত ধরার জন্য বহু লোক বন্দুক, কোচ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ডাকাইতদের আক্রমণ করিয়াছে। ডাকাইতের দল মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়িয়া, লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে। ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌঁছিয়াছে।

দারোগা, পুলিশ কনষ্টেবলও বন্দুক সহ উপস্থিত হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এ ভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে। ডাকাইতের দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে সংবাদ পৌছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ বাহিনী সহ দারোগারাও বন্দুক লইয়া ডাকাইত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। লড়াই চলিতেছে। ধলেশ্বরী নদীতে শত শত নৌকা সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন এ ভাবেই চলিতেছে। ডাকাইতির সংবাদ ইতিমধ্যে ঢাকাতে পৌছিয়াছে। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ডাকাইত ধরার জন্য গুর্খা সহ 'লঞ্চ' যোগে রওনা হইয়াছেন। ডাকাইতেরা ছিল তরুণ যুবক। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। হতাহত হইতেছে। নৌকা গুলিবিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় জল উঠিতেছে। কয়েক জন জল সেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিকে অন্ধকার, ধলেশ্বরী নদী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর রুদ্র মূর্ত্তি, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বহু লোকের মনে ডাকাইত ধরা অপেক্ষা প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই প্রবল হইল। নিশার অন্ধকারে ডাকাইতের নৌকা যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।"

শচীন্দ্রনাথ ও শশী এই ডাকাতির পর ফেরার হয় এবং বহু দিন পর কাশীতে দলের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে। অমৃতলাল পরে রাজাবাজারের বোমার মামলায় ধরা পড়ে ও দণ্ডিত হয়। এই ঘটনায় পাঁচ জন নিহত ও কয়েক জন আহত হয়।

নড়িয়া ডাকাতি

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর আর একটি বড় রকমের ডাকাইতি হয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে। কিন্তু এই ডাকাইতিতে ডাকাইত দলের বিশেষ লভ্য হয় নাই। প্রায় ৩০।৪০ জন যুবক বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকা করিয়া উক্ত গ্রামে অবতরণ করে। তাহারা নৌকা হইতে

নামিয়াই ইতস্ততঃ গুলি বর্ষণ করায় নৌকার মাঝিরা এবং গ্রামবাসীরা পলায়ন করে। ইহার পর ডাকাইত দল ষ্টীমার-অফিস এবং তিনটি বাড়ী লুঠ করিয়া মাত্র ৬৭০৲ টাকা পায়। লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাজারে এবং কয়েকটি গৃহে অগ্নি সংযোগ করার ফলে প্রায় ৬৪০০৲ টাকার ক্ষতি হয়। সরকার পক্ষে অপরাধীর সংবাদ প্রদানকারীকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। এই বর্ষের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর গ্রামে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বিঘাটি গ্রামে ডাকাইতি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি যুবক পুলিশের বেশে এবং রিভলবার প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া খানাতল্লাসীর অজুহাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করে। ডাকাইত দল বাজিতপুরের ডাকাইতিতে ১৫০০৲ টাকা এবং বিঘাটির ডাকাইতিতে ৫৩৬৲ প্রাপ্ত হয়। বিঘাটি ডাকাইতির মামলায় এক জনের ছয় বৎসর, দুই জনের পাঁচ বৎসর এবং এক জনের সাড়ে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাজিতপুর ডাকাইতি মামলা সম্পর্কে এক জনের দেড় বৎসর এবং আর এক জনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাজিতপুর ডাকাইতির ঠিক পূর্ব্বদিন সাটিরপাড়া বিপ্লব-কেন্দ্রের ত্রৈলোক্য-নাথ চক্রবর্ত্তী নৌকা চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হন। উক্ত নৌকা চুরি সম্পর্কে এক বিবরণে তিনি বলেন, "সাটিরপাড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখা-সমিতি ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল দুই ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহারা খুব উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদের কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই। মাছিমপুর সমিতিটি আমার এক সহকারীর অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম সহরে খেলার প্রতিযোগিতা হইবে। আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্থ করিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় আমার সহকারীর নিকট প্রস্তাব করিল যে, তাহাদের এক প্রকার নৌকা আছে, বিনা ভাড়ায় তাহারা সেই নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। আমাদের নিজেদেরই নৌকা চলাইয়া যাইতে হইবে। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম। নৌকা

ছয় মাইল দূরে শীতলক্ষ্যার পারে ছিল—গুপ্তচর দুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা নদীর ধারে এক নির্জ্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে পাইলাম। গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় সহ আমরা মোট আঠার জন ঐ নোকায় ছিলাম। ঢাকা কত দূর—যাইতে কত দিন লাগিবে, এতগুলি লোক লইয়া যাইতেছি—তাহারা রাস্তায় কি খাইবে—ইত্যাদি চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই, নৌকাতে কোন আলো ছিল না; উপরন্তু আমরা সকলে নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। যাহা হউক, স্রোত আমাদের অনুকূল ছিল, নৌকা চলিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে ডাঙ্গা বাজারে আমাদের নৌকা পৌছিল।

"সারা রাত্রি পরিশ্রমে সকলেই ক্ষুধার্ত্ত ছিল—বাজার নিকটে দেখিয়া চিঁড়া-গুড় কিনিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলাম, 'টাকা তো আনি নাই।' যদু তখন আমাকে রক্ষা করিল। সে বলিল, টাকা আমার নিকট আছে। ...সেই টাকা হইতে চিড়া-গুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছেনা, বাড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেই দিনই ষ্টিমারে নারায়ণগঞ্জ পৌছিবে এবং সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে। আমি তখন কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই, তাই তাহাকে চলিয়া যাইতে দিলাম। সে চলিয়া গেলে আমরা নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচরটি ডাঙ্গা বাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সহ ষ্টিমারে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইল।

"আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছু ছিল না, কাজেই খাইবার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহে ও আনন্দে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে পৌছিল। রাস্তায় যদুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পূর্ব্ব-রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছু ছিল না। জ্বরের ঘোরে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। সঙ্গে গুপ্তচরটি, আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদানুসারে ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যদুর সেবার জন্য আমি ও বিনোদ নৌকায়

রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলাম, তাহারা ট্রেণে যাইয়া আমাদের সংবাদ দিবে। কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী কনেষ্টবলকে ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টা খানেক পর দেখিতে পাইলাম, অনেকগুলি পুলিশ আমাদেরদিকে দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।"

বিচারের প্রহসনের পর ত্রৈলোক্যনাথসহ তিন জনের চারমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে দুইটি এবং পূর্ব্ববঙ্গে বাখরগঞ্জে একটি বড় রকমের ডাকাইতি হয়। ২৯শে নভেম্বর নদীয়া জেলার অন্তর্গত রায়তা গ্রামে এক ডাকাইতির ফলে ১,৯১৫৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২রা ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার মরীহাল গ্রামে ডাকাইতগণ মাত্র ১৩০৲ টাকা পায়। কিন্তু বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দেহারগতি গ্রামে ডাকাইতির ফলে তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। মরীহাল ডাকাইতির সম্পর্কিত মামলায় এক জনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বিচিত্র ঘটনার প্রবাহে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে "১৯০৮" খৃষ্টাব্দ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মানিকতলার বোমার মামলা ছাড়াও এই বর্ষে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাইতি, গোয়েন্দা ও বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী সদস্যদের হত্যা করা হয়। কিন্তু এই বৎসরের অন্যতম ঘটনা মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের ঘোষণা।

মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার

বৎসরের শেষ ভাগে ২রা নভেম্বর ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্বন্ধে এক রাজকীয় ঘোষণা হয়। উক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, নূতন শাসন সংস্কারের বলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী পরিষদে এক জন ভারতবাসী নিযুক্ত হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক

সভায় সভ্যসংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১৬ জন, এখন হইল ৬০ জন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাই হয় বেশী। মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইবেন ৫২ জন আর ৮ জন নিযুক্ত হইবেন পদাধিকার বলে—৬ জন কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য, এক জন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, এক জন প্রদেশ বিশেষের শাসন কর্ত্তা।

কার্য্যকরী পরিষদের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কেবল বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য ছিল, এখন বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে একটি করিয়া কার্য্যকরী পরিষদ হইল। সভ্য নির্দ্ধারিত হয় চার জন, তন্মধ্যে এক জন হইবেন ভারতবাসী।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা ৫০, আর পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ৩০ জন। তাহার মধ্যে কতক হইল মনোনীত বে-সরকারী আর কতক হইল নির্ব্বাচিত।

নূতন শাসন-সংস্কারের বিধান অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি ( Seperate Electorate ) সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই নির্ব্বাচন পদ্ধতির ফলে সমগ্র জাতির কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করিল। এই সংস্কারের ফলে কেবল আলোচনা ও মতামত প্রকাশেরই সুবিধা হইল, কিন্তু কোন সুফল হইল না।

কংগ্রেস-নেতারা এই শাসন-সংস্কারকে নিজেদের চেষ্টার ফল মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ আরও অধিকার করায়ত্ত হইবে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ণো-দ্যমে কংগ্রেস অধিকার করিয়া রাখিলেন।

শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নভেম্বর মাসেই ঢাকা অনু-শীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভূপেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুযায়ী বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন। উক্ত আইনের বলে পূর্ব্বে ইংরাজ রাজপুরুষগণ ঠগীদের দমন করিতেন।

এই শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত ঘোষণার প্রায় এক মাস পরে ১১ই ডিসেম্বর "Criminal Law Amendment Act" নামে নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের সাহায্যে কোন বিশেষ অপরাধের জন্ম কোন প্রকার 'Assessor' অথবা 'জুরী' ব্যতীত তিন জন হাইকোর্ট-জজ কর্ত্তৃক বিচারকার্য্য চলিতে পারিবে।

উক্ত আইনের সাহায্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও সাধনা সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পুলিনবাবুর নির্ব্বাসনের পর দলের একটি শাখার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু; কিন্তু বৃহত্তর অংশের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন সোনারং জাতীয়-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাখনলাল সেন। উত্তরকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'ভারত' নামক দৈনিক সংবাদপত্রদ্বয় অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়া ইনি সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন। তিনি সোনারংয়ের কার্য্য-পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকা জেলার রাজনগর ডাকাইতিতে যে আটাশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর ডাকাতিতে যে ষোল হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়, তাহা সোনারং জাতীয়-বিদ্যালয়ের বিপ্লবীদেরই কীর্ত্তি বলিয়া রাউলাট রিপোর্টে কথিত হইয়াছে। পুলিনবাবু তাঁহার স্মৃতি-কথায়ও রাউলাট রিপোর্টে মাখনবাবুর নেতৃত্বের যে কথা আছে, তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

মাখনবাবু কলিকাতায় আসিয়া সোনারং বিদ্যালয়ের কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া কলেজ স্কোয়ারে আস্তানা স্থাপন করিয়া বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন এবং বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি গ্রেপ্তার হইয়া চট্টগ্রামের টেকনাফে অন্তরীণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ স্থান হইতেই দল পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্রসিদ্ধ নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন।

এই সময় পূর্ব্ব-বাংলার চতুর্দ্দিকেই ঢাকা সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করে। আশুতোষ দাশগুপ্তের সহায়তায় মুন্সিগঞ্জের গ্রামে গ্রামে শাখা স্থাপিত হইল। বজ্রযোগিনী, কলমা, ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামে শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

ঢাকায় সমিতির কার্য্যের বিশেষ প্রসার হওয়ায় বৈপ্লবিক কর্ম্মিগণের জন্য একটি বাসস্থানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় বারদির নাগ-পরিবারের সুরেন্দ্র নাগ ও উপেন্দ্র নাগ সমিতির সদস্য হন। সুরেন্দ্রবাবুদের বাড়ীর চালাঘরে সমিতির প্রথম নিবাস স্থাপিত হয়; তাহার পর 'ভূতের বাড়ী' নামক প্রসিদ্ধ একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া এই নিবাস আরও বড় করা হয়। জন কয়েক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এই বাড়ীটিতে দুষ্কর্ম্মের আস্তানা করিয়াছিল এবং সেই জন্য কোনও লোক আসিলে তাহারা গোপনে নানারূপ উৎপাত করিত বলিয়া এই বাড়ীর নাম 'ভূতের বাড়ী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই বাড়ীতে তল্লাসী করিয়া পুলিশ অনেক কাগজ-পত্র আবিষ্কার করে। তন্মধ্যে আন্ত্য, অন্ত্য, প্রথম বিশেষ ও দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞার কাগজ-পত্রও ছিল।

অনুশীলন সমিতি এই সময় বাখরগঞ্জ জেলায় একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করে। প্রথমে যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এই শাখার নেতা নির্ব্বাচিত হন। তাহার পর রমেশচন্দ্র আচার্য্য দলপতি হইয়া দলকে বিশেষ কর্ম্মতৎপর করিয়া তুলেন। তিনি দলপতির নির্দ্দেশে সোনারং জাতীয়-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যান। সেখানে মাখনলাল সেনের নিকট হইতে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। রমেশচন্দ্র সোনারং থাকা কালীন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতচর, গোদাদিয়া ও সুকাইর ডাকাইতি সোনারং দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সূত্রে রমেশচন্দ্র ডাকাইতির পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। সুকাইর ডাকাইতির পর সরকারী আদেশে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হয়।

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বসু বলেন, "১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতি

বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে সব শাখা পৃথক্ হইয়া যায়; ইহার পর এই সমিতির নাম পরিবর্তিত করিয়া আমরা Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society নামকরণ করি। মিত্র মহাশয় জজ সারদাচরণ মিত্রকে এই নূতন সমিতির সভাপতি করিয়া দেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতি পরে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। আলীপুর মামলার পর আত্মোন্নতি সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

"আমাদের নূতন সমিতির কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট খুশী হয় এবং বলে, C. I. D. মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে। Imperial Goverment তোমাদের সম্পর্কে এক জন Ruasian detective নিযুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি ডাকাইতি ছাড়া কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়। ২রা মে মানিকতলা মুরারিপুকুরের বাগান পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কারের পর কলিকাতায় যে-সমস্ত বিপ্লবী ছিল, তাহারা 'যুগান্তর', 'সোনার ভারত' প্রভৃতি গোপন পত্রিকা প্রকাশ ভিন্নও—বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা যে এখনও চলিতেছে তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে। ১৫ই মে তারিখে, গ্রে ষ্ট্রীটে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

তাহার পর ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে চলন্ত ট্রেণের উপর কলিকাতার উপকণ্ঠের কয়েকটি স্থান হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই পর্য্যায়ে প্রথম বোমা ফেলা হয়—কাঁকিনাড়ায় ২১শে জুন তারিখে। কলিকাতার সরকারী ফৌজদারী উকিল (পাব্লিক প্রসিকিউটর) হিউম সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু বোমা অপর একটি গাড়ীতে পড়ে ও এক জন ইউরোপীয় যাত্রীকে বেশ জখম করে। ১২ই আগষ্ট তারিখে শ্যামনগরে, ২৪শে নভেম্বর বেলঘরিয়া ও আগড়পাড়ার মধ্যে এবং ২১শে ডিসেম্বর খড়দহ ও সোদপুরের মধ্যে ট্রেণ লক্ষ্য করিয়া বোমা ফেলা হয়। এই বোমাগুলি সমস্তই নারিকেল খোলের মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ ও পেরেক, লোহার টুকরা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

এদিকে রাজসাক্ষী গোয়েন্দাদের হত্যা করিয়া, যাহাতে এই দুই কার্য্যে আর কেহ ভয়ে অগ্রসর না হয় তাহার জন্য বিপ্লবীদল চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ বিষয়ে প্রথম সাফল্যজনক অভিযান হইতেছে বাঁকুড়ার রজনীকে হত্যা করা। রজনী বোমার দলে ছিল, কিন্তু সে পূর্ব্বেই পুলিশের গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে এবং তাহার নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া পুলিশ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এই রজনীকে জানিতেন। জেল হইতে রজনীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ জ্যোতিষবাবুকে জানাইলে, জ্যোতিষচন্দ্র জেলে খবর পাঠান যে, রজনীকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে আর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পাইবে না। এই বিষয়টি এতদিন পর্য্যন্ত কোন সরকারী বিবরণে পাওয়া যায় নাই। অবিনাশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বোমার যুগের এক অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয় সর্ব্ব-প্রথমে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যার পর ৯ই নভেম্বর শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী সারপেনটাইন লেনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টার জন্য দায়ী গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুণেন দাশগুপ্ত গুলি করিয়া হত্যা করেন।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতিও এই সময় কয়েকটি গুপ্তহত্যায় লিপ্ত হয়। সমিতির নিয়ম অনুসারে বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা সাধনই একমাত্র শাস্তি ছিল। এই কারণে সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রমনার কালী দেখিবার ছল করিয়া লইয়া যাইয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। কর্ত্তিত হস্তের এক স্থানে 'সুকুমার' শব্দটি লেখা থাকায় লাস সনাক্ত হয়। সুকুমার একটি ছেলেকে ভুলাইয়া অনুশীলন দলে লইয়া যাওয়ার দায়ে ধরা পড়িয়া এক স্বীকারোক্তি করে এবং জামিনে খালাস হয়। একই অপরাধে ঢাকার অন্নদা ঘোষ ও হাওড়ার কেশব দেকে হত্যা করা হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মোট ১০টি ডাকাইতি, একটি অস্ত্র চুরি, দুইটি রাজনৈতিক হত্যা হয়। এই বর্ষের প্রথমভাগে ১০ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর আদালত প্রাঙ্গণে

নরেন গোঁসাই হত্যা মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলির আঘাতে হত্যা করা হয়। তাঁহার হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসুর দক্ষিণ হস্তটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল। হাতে রিভলবার বাঁধিয়া দুই হাতের সাহায্যে গুলি চালাইয়া সে হত্যা করে। চারুচন্দ্র যশোহরের উকিল কেশবচন্দ্র বসুর পুত্র। এই অপরাধের বিচারে চারুচন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হয়।

এই বৎসরে ৩রা জুন ফরিদপুর জেলায় অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ একটি হত্যায় লিপ্ত হয়। গবেশ চট্টোপাধ্যায় নামে দলত্যাগী এক ব্যক্তি পুলিশের নিকট দলের সন্ধান দেয়। গবেশকে হত্যা করার সঙ্কল্প লইয়া কয়েক জন সশস্ত্র যুবক ফরিদপুর জেলাস্থ তাহার ফতেজঙ্গপুর গ্রামের বাড়ীতে হানা দেয়। দুই ভ্রাতার আকারের সাদৃশ্য থাকায় গবেশের ভ্রাতা প্রিয়নাথকে গবেশ ভ্রমে তাহার মাতার সম্মুখেই বিপ্লবীগণ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পুলিশ আজও সন্ধান করিতে পারে নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কুমিল্লায় ঢাকার নবাবের তিনটি রাইফেল চুরি যায়। এই সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বৎসরে ১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই এপ্রিল বেলঘরিয়া এবং আগড়পাড়া অঞ্চলে দুই জন নারিকেল-বোমার আঘাতে আহত হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী হরিপাল থানার অন্তর্গত মাসুপুর গ্রামে ১০।১২ জন যুবক এক ডাকাইতি করিয়া ৫০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। ২৩শে এপ্রিল ডায়মণ্ড হারবার থানার অন্তর্গত নেত্রা গ্রামে রামতারণ মিত্রের বাড়ীতে কয়েকটি মুখোসপরা যুবক রিভলবারের সাহায্যে ডাকাইতি করিয়া অলঙ্কার ও অর্থে ২,৪০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। যুবকগণ গৃহস্বামীকে বলে যে, তাহারা ইংরাজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করার জন্য কর্জ্জ হিসাবে ইহা গ্রহণ করিতেছে।

পিস্তল, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ৮।৯ জন মুখোস পরিহিত যুবক ১৬ই আগষ্ট খুলনা জেলার অন্তর্গত নাংলা গ্রামে মথুর পোদ্দারের বাড়ীতে এক ডাকাইতি করে। ডাকাইতগণ গহনা ও নগদে ১,০৭০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। এই সম্পর্কে কয়েক স্থানে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ কিছু রাজদ্রোহমূলক

পুস্তিকা হস্তগত করে। এই ডাকাইতি সম্পর্কে অবনীভূষণ চক্রবর্তীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ইহার পর পুলিশ কয়েকটি ডাকাইতি যুক্ত করিয়া বাংলা ষড়্‌যন্ত্র মামলা খাড়া করে। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ৩০শে আগষ্ট ছয় জন আসামী সাত বৎসরের জন্য, তিন জনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার অন্তর্গত হোগুলবুনিয়া গ্রামে এক ডাকাইতির ফলে মাত্র ৫০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাইতগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। উক্ত ঘটনায় একজন আহত হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর একটি দুঃসাহসিক ডাকাইতি হয়। একটি যাত্রী-গাড়ীতে সাতটি থলিতে ২০,০০০৲ হাজার টাকা পাঠান হইতেছিল। ৭।৮ জন যুবক ঢাকা ষ্টেশন হইতে উক্ত ট্রেণে চড়ে। ট্রেণটি রাজেন্দ্রনগর ছাড়িবার পরেই যুবকগণ উক্ত অর্থের রক্ষী তিন জনের মধ্যে দুই জনকে গুলি করে এবং একজনকে ছুরিকাঘাত করে। গুলিতে আহত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। যুবকগণ তখন ট্রেণের জানালা হইতে টাকার থলিয়াগুলি বাহিরে ফেলিয়া দেয় এবং নিজেরাও লম্ফপ্রদান করে। পুলিশ এই অর্থের প্রায় অর্দ্ধেক উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে সুরেশ সেন নামক এক যুবক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই বৎসর ১০ই অক্টোবর রিভলবার, মশাল ও মুখোসে সজ্জিত হইয়া কয়েকটি যুবক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দরিয়াপুর গ্রামে এক ডাকাইতি করে। এই ডাকাইতির ফলে ২,৬০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

এই মাসের ২৮শে অক্টোবর নদীয়া জেলার অন্তর্গত হলুদ বাড়ীতে এক ডাকাইতির ফলে ১,৪০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাইতি সম্পর্কে পাঁচ জনের আট বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়; এক জনের হয় সাত বৎসর এবং আর এক জনের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই বৎসরের শেষ ভাগে ১০ই নভেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে ২৫।৩০ জন সশস্ত্র যুবক হানা দিয়া ২৮,০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে।

এই ঘটনার পর দিবস অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর, ২৫।৩০ জন যুবক বোমা ও বন্দুকে সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে হানা দেয় এবং চারিটি দোকান লুণ্ঠন করিয়া নগদে এবং অলঙ্কারে ১৬,০০০, টাকা হস্তগত করে উক্ত ঘটনায় একজন আহত হয়।

এই মাসের শেষ ভাগে ২৪শে নভেম্বর পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণর আগরতলা ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা পরিদর্শন কালে দুই জন যুবককে সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। পরে অন্য মামলায় উহাদের কারাদণ্ড হয়।

এই বৎসরের শেষ ডাকাতি হয় ২৭শে ডিসেম্বর যশোহরের অন্তর্গত বিকারা গ্রামে। ৮।৯ জন যুবক রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহস্বামীকে আক্রমণ করে। এই ঘটনায় মাত্র ৮১৪৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

মানিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার পর বিচ্ছিন্ন বিপ্লবীদলগুলির সংগঠনের ভার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর আসিয়া পড়িলেও বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় অনেক পূর্ব্বেই। বরোদা রাজ্য হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময়ে বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতির কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসেন সেই সময় তাঁহার সহিত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ও পরিচয় ঘটে। তখন হইতেই যতীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্পর্শে ছিলেন। তবে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসর বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের অনেকগুলিতে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ছিল। ইহার পর হইতেই যতীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, আদর্শ নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিয়া বাংলার বিপ্লবী কর্ম্মিগণ ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে।

বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথের বাল্যকাল তাঁহার মাতুল কৃষ্ণনগরের উকিল বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই অতিবাহিত হয়। তথায় তিনি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সান্নিধ্যে আসেন। সেই সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাহিত্য, বিপ্লবীগণের মনের রসদ যোগাইত। যতীন্দ্রনাথ, গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনির জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন, আধুনিক কালের সোভিয়েট বিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবই স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি বা জাতির প্রাণে শক্তি জোগাইত; যতীন্দ্রনাথের মনেও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শই ছিল। তিনি জাতির স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়াছিলেন এই ফরাসী বিপ্লব হইতেই। ধ্বংসের পিছনে সৃষ্টি করিবার এক বিরাট মন লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মন অলক্ষ্যে

বাল্যজীবন

মহৎ প্রাণের নিকট আবেদন করিত। সেইজন্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাবিষ্ট হইয়াছিল বাংলার মৃত্যুপাগল আত্মভোলা সন্ন্যাসী গোষ্ঠী।

বাল্যকাল হইতেই যতীন্দ্রনাথ অসমসাহসী ছিলেন। তিনি অশ্বচালনায় এবং সন্তরণ বিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন। বাল্যের ও কৈশোরের বহু ঘটনার ভিতর দিয়াই তাঁহার মহত্ত্বের ও কর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ পায়। ভগবানে ছিল তাঁহার অগাধ বিশ্বাস এবং তিনি ছিলেন কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। উত্তরকালে তিনি স্বামী ভোলানন্দ গিরির শিষ্য হইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্ম্মী সুরেশচন্দ্র মজুমদার যতীন্দ্রনাথের জীবনের দু'একটি ঘটনা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, "যতীন্দ্রনাথ তখন মাত্র কলিকাতায় তৎকালীন বিখ্যাত Atkinson সাহেবের সর্টহ্যাণ্ড স্কুল হইতে বাহির হইয়া কোনও সওদাগরী আফিসে চাকুরী লইয়াছেন। একদিন বিকালে আফিস হইতে ঐ স্কুলের সম্মুখ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, এক চানাচুরওয়ালা একটি বাঙ্গালী যুবকের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে ও তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে। স্বজাতীয় একটি যুবককে এরূপভাবে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ নিকটে যাইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চানাচুরওয়ালার কতক চানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। যে পরিমাণ চানা পড়িয়াছে তাহার মূল্য দু'পয়সার বেশী হইবে না। কিন্তু চানাচুরওয়ালা উহার জন্য ছেলেটির নিকট ২৲ টাকা দাবী করিতেছে। যতীন্দ্রনাথ বুঝিলেন ছেলেটির নিকট মোটেই পয়সা নাই। সেইজন্য নিজের পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া চানাচুরওয়ালাকে দিতে চাহিলেন। চানাচুরওয়ালা ২৲ টাকার কম লইতে অস্বীকার করিয়া যতীন্দ্রনাথকেও গালাগালি দিতে লাগিল, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চানাচুরওয়ালাকে ধাক্কা দিয়া যুবকটিকে মুক্ত করিয়া তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন।

যতীন্দ্রনাথের জীবনের দু'একটি ঘটনা

"এই সময় Atkinson স্কুলের উপরতলা হইতে একটি সাহেব এইসব ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সবে বিলাত হইতে আসিয়াছেন;

তিনি মনে করিলেন যে, একব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক একজন আসামীকে ছাড়াইয়া দিলেন। অপরাধীকে পুলিশে দেওয়া উচিৎ ছিল। ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া সাহেবটি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং চানাচুরওয়ালার পক্ষ হইয়া যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, যেহেতু তুমি মনে করিতেছ তুমি চানাচুরওয়ালা অপেক্ষা বলবান, সেই জন্য এইরূপ অন্যায় করিয়া অপরাধীকে ছিনাইয়া লইতে সাহসী হইলে। যতীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন আমি তোমার অপেক্ষাও নিজেকে অধিক বলশালী মনে করি।

"ইহাতে সাহেব চটিয়া যতীন্দ্রনাথকে এক ঘুষি লাগাইলেন। যতীন্দ্রনাথও তাহাকে গলা ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া বলিলেন 'For your life please apologise' সাহেবের অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইয়া আসিতেছিল। তিনি enough enough বলিয়া মাপ চাহিলেন। যতীন্দ্রনাথ তখন তাহাকে উঠাইয়া ফুটপাতে বসিয়া স্বহস্তে কর্দ্দম ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া করমর্দ্দন করিয়া Good night বলিয়া বিদায় লইলেন।

"Finance Department এ চাকুরী করা অবস্থায় একবার গ্রীষ্মকালে যখন আফিস দার্জ্জিলিং এ স্থানান্তরিত হইতেছিল তখন যতীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং-এ যাইতেছিলেন। তিনি যে গাড়ীতে যাইতেছিলেন, সেই গাড়ীতে তাঁহার একটি উকিল বন্ধুও সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। শিলিগুড়ি ষ্টেশন হইতে যখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, এই সময় উকিল বন্ধুটির একটি শিশুপুত্র জলের জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দেয়। গাড়ী ছাড়িয়া দিবে এই ভয়ে উকিল বন্ধুটি নামিয়া জল আনিতে সাহস পাইলেন না, ইহা যতীন্দ্রনাথ শুনিবামাত্র একটি ঘটি হস্তে লাফাইয়া পড়িয়া জল আনিতে দৌড়াইলেন। জল লইয়া ফিরিতেছেন এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্লাটফর্ম্মে তিনটি বড় মিলিটারী অফিসার একসঙ্গে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। গাড়ী ধরিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ বেগে অগ্রসর হওয়ার সময় অনবধানতা বশতঃ যতীন্দ্র-

নাথের সঙ্গে উহাদের একজনের ধাক্কা লাগে। গোরা অফিসারটি ইহাতে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া যতীন্দ্রনাথের মুখের উপর একটি ঘুষি মারে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুটি সাহেবও ঘুষি মারিতে আরম্ভ করে। যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জলের ঘটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রথম সাহেবটিকে প্রহার করিতে করিতে একেবারে রেলের লাইনের উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। তৎপর একাকী আর দুইজনের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দুইজনও ভূপতিত হইল। ইতি-মধ্যে পুলিশ ও ষ্টেশনের অন্যান্য লোকজন আসিয়া মারামারি থামাইয়া দিল।

"লাইনে সকলেই যতীন্দ্রনাথকে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া জানিতেন, সে কারণে ষ্টেশনের সমস্ত লোক ও পুলিশ দার্জ্জিলিংএ গিয়া এই ব্যাপারের মীমাংসা হইবে বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দার্জ্জিলিং পৌছিয়া গোরা কর্ম্মচারিগণ Deputy Commissioner-এর নিকট নালিশ করেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট, গোরা সাহেবেরা প্রথমেই মারপিট করিয়াছিল এবং একদিকে একজন বাঙ্গালী ও অন্যদিকে তিনজন গোরা সাহেবকে বাদী ও প্রতিবাদী দেখিয়া মামলাটি সাহেবদিগের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া মামলা গ্রহণ করেন নাই। গোরা সাহেব তিনটি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট এই বিষয় লিখিয়া পাঠান, শোনা যায়, ঐ উপরস্থ কর্ম্মচারী মহাশয়ও এই তিনজন অফিসারের নির্ল্লজ্জতার জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া উত্তর দেন। শিলিগুড়ির ঘটনা খবরের কাগজে পড়িয়া তাঁহার একটি মামাত ভাই চিন্তিত হইয়া সঠিক খবরের জন্য তাঁহাকে একখানি তার করেন। উত্তরে যতীন্দ্রনাথ লেখেন "Three military aggressors substantially taught."

বাংলার বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রগুলির ভার গ্রহণ করার পর যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষাগুরু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( নিরালম্ব স্বামী ) সহিত সাক্ষাৎকরার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু তিনি তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী নাটোরের সতীশ সরকার বাঁকিপুরের শাশ্বতী দেবীর নিকট হইতে

নিরালম্ব স্বামীর আবাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। নিরালম্ব স্বামী তখন বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেছিলেন। তথায় নাছু মহারাজের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনে গিয়া নিরালম্ব স্বামীর নিকট কয়েকদিন কাটাইয়া বাংলার বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ প্রাপ্ত হন।

ঠিক এই সময় অর্থাৎ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সরকারী উকিল আশু বিশ্বাস নিহত হইলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যতীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ নজর রাখিতে আরম্ভ করে। তাহা ছাড়া মুরারীপুকুরের সংস্রবে আলিপুর বোমার মামলায় পুলিশ যে সমস্ত বিপ্লবীদের সন্ধান পায় তাহাদের সকলকে একসঙ্গে জড়িত করিয়া একটি বিরাট মামলা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছিল। ইহার ফলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী হয়।

এই সকল খানাতল্লাসীর পর সন্দেহজনক বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। আলিপুর বোমার মামলার তদ্বিরকারক পুলিশের ডেপুটি-সুপার মৌলভী সামসুল আলম। উক্ত সামসুল আলম হলুদবাড়ী, ন্যাতড়া, নেত্রা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ডাকাতি সংঘটিত হয় সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছিল। পুলিশ এই সময় নেত্রা ডাকাতি সম্পর্কে ললিতমোহন চক্রবর্ত্তীকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর দার্জ্জিলিংএ গ্রেপ্তার করে। ললিতমোহন নেত্রায় ডাকাতির পর নাটোর গিয়া সতীশচন্দ্র সরকারের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকে তারপর সতীশচন্দ্র, ললিতকে দার্জ্জিলিংএ পাঠাইয়া দেন।

দার্জ্জিলিংএ গ্রেপ্তার হওয়ার পর ললিতমোহন ডায়মণ্ড হারবারে নীত হন। তথায় মহাকুমা হাকিম চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি এক স্বীকারোক্তি করেন। ললিতমোহন এই স্বীকারোক্তিতে বত্রিশ জনকে জড়িত করেন। তন্মধ্যে ননীগোপাল সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূষণ মিত্র, কেশব দে, শরৎ মিত্র, সুরেশ মিত্র, চারু ঘোষ, তারানাথ

রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম করেন। ইহা ছাড়া ললিতমোহন, যতীন্দ্রনাথের মাতুল ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সুহৃদ্ নিবারণ মজুমদার, নরেন বসু, হরিদাস চক্রবর্ত্তী, হেমচন্দ্র সেন, পবিত্র দত্ত, সতীশ সরকার, শ্রীশ সরকার, বিজয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকের নাম করেন।

এইরূপে সামসুল আলম যখন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন সেই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সতীশ সরকারের উপর সামসুলকে হত্যার ব্যবস্থার জন্য নির্দ্দেশ দান করেন। সতীশ সরকার প্রথমে প্রায় একমাস যাবৎ সামসুলের গতিবিধি লক্ষ্য করেন এবং প্রথমে যতীশ মজুমদার ওরফে চণ্ডী পাগলাকে এই হত্যা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ক্ষিপ্রকারিতার অভাবের জন্য চণ্ডীর পরিবর্ত্তে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের উপর এই ভার ন্যস্ত করা হয়।

এই সময় আনন্দ বাজার পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকীল কিশোরীলাল সরকারের শ্যামবাজারের বাড়ীতে বাস করিতেন।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

নিবারণ মজুমদার ও সুরেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর আর্য্য ফ্যাক্টরীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কিশোরীলালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঢেনকানলের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারকানাথ সরকারের শ্যালক পূর্ণচন্দ্র মৌলিক এই সময় কয়েকদিনের জন্য কিশোরীলালের বাসায় আসিয়া থাকেন। মৌলিক মহাশয় তখন জাজপুরের সাবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার হাতব্যাগে যে রিভলভার ছিল তাহা সুরেশচন্দ্র অপসারিত করিয়া সতীশ সরকারের হাতে পৌঁছাইয়া দেন। সতীশচন্দ্র উক্ত রিভলবারটি সামসুলকে হত্যার জন্য বীরেন্দ্রকে দেন।

২৪শে জানুয়ারী (১৯১০) সতীশচন্দ্র, বীরেন্দ্রকে লইয়া হাইকোর্টের সিঁড়ির নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই দিন বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালতে আলিপুর বোমার মামলার বিচার হইতেছিল, কারণ পূর্ব্বে বিচারপতি কার্নডাফের ঘরে যে বিচার হয় তাহাতে পাঁচজন আসামী সম্পর্কে মতভেদ হওয়ার জন্য হ্যারিংটনের কাছে উল্লেখ করা ( refer ) হয়। এই বিষয়ে শেষোক্ত

বিচারের সময়ে মৌলভী সাহেব রোজই হাইকোর্টে আসিতেন। অপরাহ্নের দিকে যখন সামসুল আলম হ্যারিংটনের আদালত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় বীরেন্দ্র ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া তাহার বুকে গুলি করেন।

সামসুল আলম হত্যা

বীরেন্দ্র উত্তেজিত অবস্থায় রিভলবার হাতে রাস্তায় নামিয়া পড়ে। হাইকোর্টের চাপরাশি রাম অধীন সিং ও রামজানি সিং আসিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। সতীশচন্দ্র দাক্ষণ দিকের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বহুবাজারের ট্রামে ঘটনাস্থল হইতে পলায়ন করেন। তিনি কালী বসু লেনে বিপ্লবীদের যে আড্ডা ছিল তাহা সেই দিনই ভাঙ্গিয়া দেন।

পরদিন পুলিশ পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহোদর ধীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের ৬১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাসা খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজপত্র লইয়া যায়। সামসুল হত্যার তিনদিন পরে অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারী পুলিশ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার মাতুল ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ২১৫ নং অপার চীৎপুর রোডের বাসা হইতে গ্রেপ্তার করে। ইহা ছাড়া হেমন্তকুমারের অন্যতম ভ্রাতা অনাথ চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণনগরের বাসা এবং কিশোরীলালের বাসা খানাতল্লাস করা হয়। তল্লাসীর পর যতীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ললিত চট্টোপাধ্যায় এবং নিবারণ মজুমদারকে হাওড়া গ্যাং কেস সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩১শে জানুয়ারী অনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এক হাজার টাকার জামিন দিয়া বাকী সকলকে স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (পুলিশ কমিশনার) মিঃ ডালি (D. I. G. C. I. D.) সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া চালান দেন। যতীন্দ্রনাথের ঘর খানাতল্লাসী করার সময় তাঁহার ঘর হইতে একখানা কাগজ পাওয়া যায়। উহাতে পুলিশকে সতর্ক করিবার কথা আছে ("A document with the scheme of the formation of Vigilance Committee.")

যতীন্দ্রনাথ যে রাত্রে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন তাহার পরদিন তিনি Royd Street-এ অবস্থিত গোয়েন্দা আফিসে নীত হন। সেখানে দু'একজন সাহেব ও

বাঙ্গালী কর্ম্মচারী তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে ও সামসুল আলমের হত্যা-জনিত অপরাধ স্বীকার করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। এই সময় একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "Perhaps he won't confess unless he gets young beauties and whiskies."

ইহা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ সংযম হারাইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠেন ও নিকটস্থ টেবিলের উপর সজোরে একটি ঘুষি মারেন। সেই চীৎকার ও শব্দ তখন Royd Street এ ধৃত যত বাঙ্গালী যুবক ছিলেন তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। পরে শুনা যায় যে, ঘুষির জোরে টেবিলখানি ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছিল। সেইদিন হইতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সাবধান হইয়া কথা বলিতেন।

দুই একদিনের মধ্যে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো সাহেবের ঘরে বীরেন্দ্রের মকদ্দমা উঠে। কিন্তু তিনি মামলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। সুইনহো সাহেব মামলাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। ইহার একদিন পরে স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সএর ঘরে বীরেন্দ্রের মকদ্দমার শুনানী একদিনেই শেষ হইয়া যায়। বীরেন্দ্রের পক্ষে সতীশচন্দ্র, নিশিথ সেনকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আসামী তাহার কৌসুলীকে কোন কথাই বলিতে রাজী হইল না। প্রধান বিচারপতি বীরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বীরেন্দ্র অবিচলিত ভাবে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসির দিন নির্দ্ধারিত হয়।

বীরেন্দ্রনাথের প্রাণদণ্ড

বীরেন্দ্রের ফাঁসির আদেশের পর গোয়েন্দা পুলিশ বীরেন্দ্রের নিকট হইতে বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে এক ষড়যন্ত্র করে। একজন ইন্‌স্পেক্টার একখানি যুগান্তর পত্রিকা আনিয়া আসামীর সম্মুখে উপস্থিত করে। পত্রিকাখানি কৃত্রিম এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা বিভাগ হইতে বিকৃত ভাবে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল।

যুগান্তর কাগজের মামুলি জিনিস দেওয়ার পরে ঐ কাগজখানিতে লেখা ছিল "বীরেন কাপুরুষ, নেতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও সুষ্টুভাবে কাজ করিতে পারে

নাই। বিনা কারণে গুলি ছুঁড়িয়া ধরা দিয়াছে, দলকে ফাঁসাইবার জন্যই ধরা দিয়াছে।"

তাঁহার নিয়োজিত কাজ খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হওয়া এবং আদালতের ব্যবহার বিশেষ বীরত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নকল যুগান্তরের অপবাদ অসহ্য হইল। বীরেন্দ্র এই সময় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং পুলিশের নিকট এক স্বীকৃতিতে বলেন যে যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশেই সামসুলকে হত্যা করিয়াছেন। বীরেন্দ্র মার্জ্জনা চাহিয়া ছোটলাট এডওয়ার্ড বেকার ও বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করে। এই আবেদনের উত্তরের অপেক্ষায় ফাঁসির তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী করা হয়। বীরেন্দ্রের আবেদন না-মঞ্জুর হয়।

ইতিপূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো সাহেব যতীন্দ্রনাথকে খুনের সহায়তা করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া ফাঁসির পূর্ব্বদিন (২০শে ফেব্রুয়ারী) যতীন্দ্র-নাথের সাক্ষাতে প্রেসিডেন্সী জেলে বীরেন্দ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। বীরেন্দ্র যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করিয়া সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত করেন কিন্তু তাঁহার ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এত অল্প সময়ের মধ্যে বীরেন্দ্রকে জেরা করিতে অস্বীকার করেন এবং ফাঁসির দিন মুলতুবি করিতে স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে অনুরোধ করেন। স্যার এডওয়ার্ড সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। বীরেন্দ্রনাথের বর্ণনা পত্র হাইকোর্টে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে গৃহীত হয় নাই।

বীরেন্দ্রনাথ হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন।

বীরেন্দ্রনাথের বর্ণনাপত্র যদি হাইকোর্টে গৃহীত হইত তাহা হইলে যতীন্দ্র-নাথের হত্যা অপরাধের জন্য ফাঁসি হইতে পারিত। একথা জানিয়াও বীরেন্দ্রের উপর যতীন্দ্রনাথের মুহূর্ত্তের জন্য মন তিক্ত হইয়া উঠে নাই। বরং যখনই বীরেন্দ্রের কথা উঠিত তখনই তিনি তাঁহার জন্য বালকের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া উঠিতেন।

ইহার কিছুদিন পর ২০শে জুলাই (১৯১০) হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ

ভুপাল, হাওড়া গ্যাং কেসের ৪৬জন আসামীকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে সোপর্দ্দ করেন। অভিযোগ ছিল রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ( ১২১ ক ধারা দণ্ড বিধি )। সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া হয়। সুতরাং বিচার হয় ৩৯ জনের এবং বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এবং বিচারপতি ব্রেট। অভিযুক্তদের মধ্যে ননীলাল সেনগুপ্ত ( হাওড়া ) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, তারানাথ রায় চৌধুরী, শরৎ মিত্র, কেশব দে প্রভৃতি ছিলেন। তারানাথ রায় চৌধুরীর ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রশস্ত্র রাখার অপরাধে তিন বৎসর জেল হইয়াছিল।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা

এই মকদ্দমায় ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী এবং যতীন্দ্র হাজরা রাজসাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও হলুদবাড়ী দলের ছয়জন ব্যতীত সকলেই মুক্তিলাভ করেন। "The court acquitted most of the accused mainly on the ground that their connection with this particular conspiracy was not proved."

এই মকদ্দমায় সরকার পক্ষে ছিলেন পি. এল. রায়। আসামীদের পক্ষে ছিলেন জে. এন. রায়. বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, ই. পি. ঘোষ, নিশীথচন্দ্র সেন, শৈলেনকুমার সেন প্রভৃতি।

এই মামলার পর কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনে শিথিলতা দেখা যায়। যতীন্দ্রনাথ এই সময় যশোহর ঝিনাইদহ লাইনের কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার প্রায় সমসাময়িক সময়ে জাংলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট জাংলাতে ( খুলনা জেলা ) মথুর পোদ্দারের বাড়ীতে ডাকাইতি সম্পর্কে কয়েকটি স্থানে খানাতল্লাসী হয়। তন্মধ্যে ১৬৫ নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীট এবং ১৫ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীটের গৃহ তল্লাসী করিয়া বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বসু, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এবং কালিদাস ঘোষকে পুলিশ

জাংলা ষড়যন্ত্র মামলা

গ্রেপ্তার করে। তল্লাসী করিয়া এই সকল গৃহ হইতে বিপ্লবাত্মক প্রচারপত্র ও পুস্তিকা পায়—তন্মধ্যে 'মুক্তি কোন পথে' গ্রন্থমালার পুস্তকগুলিও তাহারা হস্তগত করে। রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়া পুলিশ খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিয়া অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ চন্দ, মোহিনী মোহন মিত্র, প্রিয়নাথ শুঁই, সুধীরকুমার দে, কানাইলাল চক্রবর্ত্তী, মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি মোট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তিনজনকে মুক্তি দেন এবং অবশিষ্ট ১৩ জনের মামলা তিনজন জজ লইয়া গঠিত হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন প্রেরণ করেন। ঐ বৎসর ১০ই আগষ্ট মামলার রায় বাহির হয়। বিচারে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অপরাধে ১১ জনের শাস্তি হয় এবং দুইজন মুক্তিলাভ করে। শাস্তি-প্রাপ্ত বন্দিগণের মধ্যে অবনী চক্রবর্ত্তী, শচীন মিত্র, অশ্বিনী বসু, বিধুভূষণ দে, নগেন্দ্র চন্দ ও কালীদাস ঘোষের প্রতি সাত বৎসর করিয়া দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অবশিষ্ট কয়জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়।

বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় খুলনা ও যশোহরেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। সাতক্ষীরা সমিতির সম্পাদক শচীন মিত্রের উপর সাতক্ষীরা ও খুলনা সদর মহাকুমা সংগঠনের ভার ছিল। বিধুভূষণ দে পাইকপাড়ার, অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী ধুলগ্রামের এবং সুধীরকুমার দে আলকা সমিতির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ছিলেন।

খুলনা ও যশোহর জেলায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে নিম্নলিখিত চারিটি ডাকাইতি হয়:—(১) ৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনা জেলার সোনাগাঁতি—২০০ টাকা (২) ১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহর জেলার ধুলগ্রাম—৬,১৭৫ টাকা (৩) ৩০শে মার্চ্চ খুলনা জেলার নন্দনপুর—৫,৫০০ টাকা (৪) ৫ই জুলাই যশোহর জেলার মহিষা—২,২০৪ টাকা। এই সব ডাকাতি লইয়া Khulna Gang Case নামে একটি মকদ্দমা খাড়া করা হয়। ১৭ জনকে আসামী করিয়া হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে তাহারা সকলে অপরাধ স্বীকার করিয়া শান্তিরক্ষার মুচলেকা দিয়া খালাস পায়।

খুলনা গ্যাং কেস

এই বৎসরের শেষার্দ্ধে আরও কয়েকটি ডাকাইতি ও অস্ত্র চুরির ঘটনা ঘটে। ২১শে জুলাই ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুর গ্রামে অস্ত্র চুরি যায়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা মুন্সীগঞ্জে পুলিশ বোমা আবিষ্কার করে। এই সম্পর্কে এক-জনের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। ইহা ছাড়া হলদিয়া, কলারগাঁও ও ফরিদপুরে আরও তিনটি ডাকাইতি হয়।

আংলা ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইবার অল্প কিছুদিন পরেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। পুলিনবিহারী দাস ১৯১০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কারা প্রাচীরের বাহিরে অধিকদিন তাঁহার পক্ষে থাকা সম্ভব হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই পুলিনবাবু ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫৪ জন লোককে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া চালান দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাথমিক বিচারের পর ৪৪ জনকে সেসনে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুটসের আদালতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী বিচার আরম্ভ হয়। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্যারী মোহন ঘোষ, শশাঙ্ক বসু, বিভুচরণ গুহঠাকুরতা, নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তাফী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন মজুমদার, মন্মথ বসু, তরনী পাইন প্রভৃতি অনেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহায়তা করেন। সরকার পক্ষে ছিলেন প্রসিদ্ধ কৌসুলি অপটন, গার্থ ও নলিনী গুপ্ত। এই মামলার একটি বিশেষত্ব যে, সরকার কাহাকেও রাজসাক্ষী করিতে পারেন নাই।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা

পুলিনবাবুর বিচারকালে মামলার অন্যতম সাক্ষী মনোমোহন দে-কে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল রাউতভাগে অনুশীলন দলের সদস্যগণ হত্যা করেন। ১৯শে জুন তারিখে ময়মনসিংহে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার রাজকুমার ও ১১ই ডিসেম্বর বরিশাল সহরে ইন্সপেক্টর মনোমোহন ঘোষকে অনুশীলন দল হইতে হত্যা করা হয়। মনোমোহন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার একজন প্রধান তদ্বিরকারক ছিল ও বিপ্লবী দলন কার্য্যে সে খুব তৎপর ছিল। ঢাকা

ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম তদ্বিরকারক হেড্ কনেষ্টবল রতিলাল রায়কে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকার বাকল্যাণ্ড বাঁধে বিপ্লবীগণ হত্যা করে।

উক্ত ষড়যন্ত্র মামলা বৎসরাধিক চলিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ৩৬ জনকে সেসন জজ দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড প্রদান করেন।

হাইকোর্টে বিচারপতি হ্যারিংটন, স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী ও স্যার কার্সপার্ণ এর নিকট এই মামলার আপিলের শুনানী হয়। বিচারপতিগণ এই মামলার রায় প্রদান করিয়া বলেন, "The members of the organisation (the Dacca Anusilan Samiti) had committed dacoities obviously for the purpose of collecting funds and had got possession of arms and committed murders to ensure their secrets being kept inviolate. These overt acts clearly showed that the conspiracy to wage war had long passed the passive stage and had become an active conspiracy in respect of which it was essentially the duty of Government to take action." বিচারে পুলিনবাবুর সাত বৎসর এবং জ্যোতির্ম্ময় রায় ও আশুতোষ দাশগুপ্তের ছয় বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর হয়। দীনেশ গুহ প্রমুখ ২১ জন মুক্তিলাভ করে। প্রফুল্ল সেন, রাধিকা রায়, ক্ষীরোদ গুহ, শান্তি মুখার্জ্জী, ভূপতি সেনগুপ্ত, নিশিথ মিত্র প্রভৃতির অল্প বিস্তর সাজা হয়।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্ব-বঙ্গে কয়েকটি ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়—যাহার ফলে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয়।

অনুশীলন সমিতি বাখরগঞ্জ জেলায় একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করে। প্রথমে যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এই শাখার নেতা নির্ব্বাচিত হন।

রমেশচন্দ্র আচার্য্য

তাহার পর রমেশচন্দ্র আচার্য্য দলপতি হইয়া এই দলকে বিশেষভাবে কর্ম্মতৎপর করিয়া তুলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করিয়া দলপতির

আদেশে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যান। সেখানে মাখনলাল সেনের নিকট হইতে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। রমেশচন্দ্র সোনারংএ থাকার সময় কয়েকটি ডাকাইতি অনুষ্ঠিত হয়, সেই সূত্রে তিনি ডাকাইতির পদ্ধতি সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। অনুশীলন সমিতি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বে-আইনী হওয়ার পর এই জাতীয় বিদ্যালয়ে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, নরেন সেন, রবীন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আসিয়া জড় হন।

এই জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর অল্পদিনের মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে এবং গ্রামের অনেককে গোয়েন্দা শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী একটি মেল ব্যাগ পিওনের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার অপরাধে ১৪ জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চার মাসের জেল হয়, একজনের এক মাস ও চার জনের ২৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। ঐ বৎসর ১১ই জুলাই রসুল দেওয়ান, তাহার ভ্রাতা এবং আর একজন গোয়েন্দা নিহত হয়। সুকাইর ডাকাইতির পর সরকারী আদেশে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইবার পর রমেশচন্দ্র ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বরিশালে উপস্থিত হইলে তাঁহার পরিচালনায় কয়েকটি ডাকাইতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিলে ইঁহাদের দ্বারা কুশঙ্গলে একটি ডাকাইতি হয়। তাহার দুইদিন পরেই কাকুরিয়াতে এবং একমাস বাদে বিরঙ্গলে ডাকাইতি হয়। এই সমস্ত ডাকাইতি সূত্রে ধৃত রজনী দাস নামক এক ব্যক্তি রাজসাক্ষী হয় এবং বহু তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়।

কুশঙ্গল ডাকাতি

তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পুলিশ একটি ষড়যন্ত্র মামলা সৃষ্টির চেষ্টায় থাকে। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার পর ২৮শে নভেম্বর গিরীন্দ্রমোহন দাস নামক অনুশীলন সমিতির এক তরুণ সদস্যের গৃহ তল্লাসী করিয়া বহু কাগজ পত্র হস্তগত করে।

এই তল্লাসীতে বহু কর্ত্তুজ, বুলেট, এবং লাঙ্গলবাঁধ ডাকাইতির ফলে প্রাপ্ত

রৌপ্য নির্ম্মিত গহনা পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রের পিতা বাংলা সরকারের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তল্লাসীর সময় তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় গিরীন্দ্রও রাজসাক্ষী হইতে সম্মত হন ও রজনীর ন্যায় গিরীন্দ্রও অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের দল, দলত্যাগী সারদা চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করিয়াছে ও ঢাকায় বাকল্যাণ্ড বাঁধে হেড কনেষ্টবল রতিলাল রায়কেও গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। গিরীন্দ্র তাঁহার স্বীকারোক্তিতে বলেন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামীবাগ কালী মন্দিরে প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। ইঁহাদের নিকট প্রাপ্ত সন্ধানের ফলে, পুলিশ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে, ৪৪ জন যুবকের বিরুদ্ধে ১২১ক ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রার্থনা করে।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা

এই সম্পর্কে রমেশ আচার্য্য, শৈলেন মুখার্জ্জী, নরেন সেন, ফেগু রায় প্রভৃতি ৩৭ জন গ্রেপ্তার হয় এবং মদনমোহন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, খগেন চৌধুরী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও রমেশ দত্ত চৌধুরী ফেরার হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে ইহারা গ্রেপ্তার হইলে বরিশাল ষড়যন্ত্রের পরিপূরক মামলা হিসাবে আর একটি মামলায় ইহাদের বিচার আরম্ভ হয়। প্রথম মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সাত জন এবং সেসন আদালত কর্ত্তৃক দুইজন ছাড়া পায়। অবশিষ্ট আসামীদের মধ্যে বারজন অপরাধ স্বীকার করে এবং ১৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হইতে মামলা তুলিয়া লওয়া হয়। নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি হয়ঃ—

(১) হলদিয়াহাট ডাকাইতি, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০,—১৫০০৲ টাকা; একজন নিহত, কয়েকজন আহত।

(২) কলারগাঁও ডাকাইতি, ৭ই নভেম্বর, ১৯১০,—১২,৬৬০৲ টাকা;

(৩) দাদপুর ডাকাইতি, ৩০শে নভেম্বর, ১৯১০,—৪৯,৩৬৮৲ টাকা; পাঁচজন আহত।

* (৪) পণ্ডিতসার ডাকাইতি, ৩০শে ফেব্রুয়ারী,—৫,৫০০৲ টাকা ;

† (৫) গাউদিয়া ডাকাতি, ২৯শে, ফেব্রুয়ারী,—৭,৪৫৭৲ টাকা ;

(৬) সুকাইর ডাকাইতি, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯১১,—১,২০০৲ টাকা ; একজন আহত ;

(৭) মাদারীগঞ্জে ডাকাইতির প্রচেষ্টা—৬ই জুন, ১৯১১

(৮) গোলকপুর বন্দুক চুরি, ২০শে জুলাই, ১৯১১

(৯) কুশঙ্গল ডাকাইতি, ( বাখরগঞ্জ ) ১৭ই এপ্রিল, ১৯১২

(১০) কাউকুড়ি ডাকাইতি, ২৯শে এপ্রিল, ১৯১২,—৬০৲ টাকা ,

(১১) বিড়ঙ্গল ডাকাইতি ( বরিশাল ) ২৩শে মে, ১৯১২—৮,০৮০৲ টাকা ;

(১২) পানাম ডাকাইতি (ঢাকা জিলা) ১০ই জুলাই, ১৯১২—২০,০০০৲ টাকা ; একজন আহত।

(১৩) সারদা চক্রবর্ত্তীর খুন—জুন, ১৯১২

(১৪) কুমিল্লা সহরে ডাকাইতির চেষ্টায় একত্র হওয়া, ১লা নভেম্বর, ১৯১২ ; মুখস, হাতুড়ী প্রভৃতি খানাতল্লাসীর ফলে পাওয়া যায়। রমেশ ব্যানার্জ্জী ( বিদগাঁও ) প্রমুখ ১০জনের ৭ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়। আদিত্যচরণ দে, ঠাকুরদাস পাল খালাস পায়।

(১৫) লাঙ্গলবন্ধ ডাকাইতি, ১৪ই নভেম্বর, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্যারী শাঁখারীর বাড়ী ১৬,০০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। গিরীন্দ্র দাসের ৫ বৎসর জেল হয়।

প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ হয় ১৫ই জানুয়ারী—১৯১৪, এবং ১২ জনের নিম্নলিখিত ভাবে শাস্তি হয় :—

রমেশ আচার্য্য, যতীন রায়—১২ বৎসর দ্বীপান্তর ;

রোহিনী গুহ, নিবারণ কর, যতীন ঘোষ—১০ বৎসর দ্বীপান্তর ;

---

* Sedition Committee রিপোর্টে পণ্ডিতসার ও গাউদিয়া ডাকাইতির সম্পর্কে দুইটি তারিখে উল্লেখ আছে।

† ইহার মধ্যে একটি তারিখ উপরে দেওয়া হইয়াছে অপর তারিখ যথাক্রমে ৫ই ফেব্রুয়ারী ও ২০শে ফেব্রুয়ারী।

প্রিয়নাথ আচার্য্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র বণিক, গোপাল মিত্র—সাত বৎসর কারাদণ্ড ;

নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু, দেবেন্দ্র ঘোষ—পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ;

বরিশাল ষড়যন্ত্রের পরিপূরক মামলা আরম্ভ হয় ২৯শে মে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এবং এক বৎসর কাল মামলা চলার পর রায় বাহির হয়। বিচারে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী এবং খগেন চৌধুরীর দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। হাইকোর্টের বিচারে প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরীকে মুক্তিদান দিয়া অবশিষ্ট তিনজনের দশ বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। চিত্তরঞ্জন দাস, বিজয় চট্টোপাধ্যায় সহ হাইকোর্টে আসামী পক্ষে সওয়াল জবাব করেন।

এই মামলার বিবরণে প্রকাশ পায় যে বিপ্লবী দল তাহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করে, যথা—(১) অস্ত্র বিভাগ, (২) কল্প বিভাগ, (৩) হিংসাত্মক কার্য্য বিভাগ, (৪) সংগঠন বিভাগ, (৫) সাধারণ বিভাগ।

মামলার বিবরণে আরও প্রকাশ পায় যে উক্ত সমিতির পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় বেলোনিয়া এবং আদায়পুরে দুইটি কৃষিক্ষেত্র ছিল। সমিতির সভাগণ এই নির্জ্জন প্রান্তরে গুলিচালনা শিক্ষা করিতেন।

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বের শেষ পর্য্যায়ে রাজাবাজার বোমার মামলা বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিপ্লবীদল যে সমস্ত বোমা ব্যবহার করেন, সেগুলি হয় চন্দননগরে—না হয় কলিকাতায় রাজাবাজারে অমৃতলাল হাজরার কারখানায় প্রস্তুত।

রাজাবাজার বোমার মামলা

অমৃত ওরফে শশাঙ্ক হাজরা ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাহ্রা ডাকাইতি অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম এবং তাহার পরেও দলের বহু কার্য্যে স্বীয় কৃতিত্বের জন্য দলের সদস্যগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ঢাকা ও বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার ফলে অনুশীলনের প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই ধরা পড়িয়া যাওয়াতে অমৃত আসিয়া কলিকাতায় আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টায় কাশীর অনুশীলন দলের

শচীন্দ্র সান্ন্যালের সহিত চন্দননগর দলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চন্দননগর দলে তখন মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ, মণি নায়েক, মণি শীল প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম রাজসাক্ষী বিভূতির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, বারাণসীস্থ অনুশীলন সমিতির স্থাপয়িতা শচীন্দ্র সান্যাল ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন এবং অমৃতলাল হাজরার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনা ছাড়া নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি ডাকাইতি হয়। ঘটনাগুলি অধিকাংশই পূর্ব্ব-বঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুইটি ঘটনা কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে ঘটে।

(১) লক্ষণকাঠি ( বাখরগঞ্জ ) ২২শে এপ্রিল, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ১০,২০০ টাকা ডাকাইতি।

(২) ছারসসা, ( ময়মনসিংহ ) ৩০শে এপ্রিল, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ২,১৫০৲ টাকা ডাকাইতি।

(৩) বরফান্তা ( ত্রিপুরা ) ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ২৬০৲ টাকা ডাকাইতি।

(৪) সাঁড়াচর ( ময়মনসিংহ ) ২৭শে জুলাই, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ডাকাইতি।

(৫) সিংটহর ( ঢাকা ) ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ৮,১৭০৲ টাকা ডাকাইতি।

(৬) কালিয়াচর ( ময়মনসিংহ ) ৩রা অক্টোবর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ৩,১২৫৲ টাকা ডাকাইতি, একজন আহত।

(৭) বলিগ্রাম ( রংপুর ) ৬ই নভেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ১,২১৮৲ টাকা ডাকাইতি।

(৮) চাউল পল্লী ( নোয়াখালি ) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, ১,৯৭৭৲ টাকা ডাকাইতি।

(৯) বৈগুনতেওয়ারী ( ঢাকা ) ২৩শে জানুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, ৩,৪৭০৲ টাকা ডাকাইতি।

(১০) আয়নাপুর ( ঢাকা ) ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, ৭,৫৯৩৲ টাকা ডাকাইতি।

(১১) প্রতাপপুর ( বাখরগঞ্জ ) ১৬ই জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, ৭,৫৯৫৲ টাকা ডাকাইতি।

(১২) কোলা ( ঢাকা ) ১৮ই নভেম্বর, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, ৯৫৲ টাকা ডাকাতি।

(১৩) ঢাকা ( ওয়ারি ) অস্ত্র মামলা ২৮শে নভেম্বর ১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

উপরোক্ত ডাকাইতি ছাড়া কলিকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গুপ্তচর বিভাগের শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হয়। এই ঘটনার পক্ষকালের মধ্যে একটি ১৬ বৎসরের বালক কাউলে সাহেবের মোটর গাড়ীর উপর একটি বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু বোমাটির কোন কারণে বিস্ফোরণ ঘটে না। বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল মিঃ ডেনহাম, সি. আই. ডি. ডি. আই. জিকে হত্যা করা। কিন্তু ভ্রমক্রমে কাউলে সাহেবের উপর এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে বোমার আঘাতে পুলিশের গুপ্তচর আবদার রহমানকে হত্যার চেষ্টা হয় কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রহমান মেদিনীপুর বোমার মামলা সম্পর্কে গুপ্ত সংবাদ পুলিশকে জানায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বৎসরের সর্ব্বশেষ ঘটনা ঘটে দিল্লীর রাজপথে—প্রকাশ্য দিবালোকে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'দেওয়ানী আম্'এর দিকে যাইতেছিলেন। নূতন রাজধানী দিল্লীতে তিনি রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন। বিরাট শোভাযাত্রা ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় নদীয়া জেলার পোড়াগাছ নিবাসী মন্মথ বিশ্বাসের সহোদর বসন্ত বিশ্বাস স্ত্রীলোকের বেশে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংএর দ্বিতল হইতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। বড়লাট সামান্য আহত হন। অল্পের জন্য তিনি বাঁচিয়া যান। এই হত্যার ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন রাসবিহারী বসু। ঘটনার পরেই তিনি বসন্ত

বিশ্বাসকে লাহোরে পাঠাইয়া দেন এবং নিজে দেরাদুনে কর্ম্মস্থলে চলিয়া আসেন। এই ঘটনার নায়ককে পুলিশ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও ধরিতে পারে নাই। দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী দীননাথই সর্ব্বপ্রথম উত্তর ভারতের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে। রাজসাক্ষী সুলতান চাঁদও অনেক ঘটনা বলিয়া দেয়। উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবের অমর কাহিনী পরবর্ত্তী খণ্ডে আলোচিত হইবে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া দিয়া যান এবং দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের আদেশ দিয়া যান। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন ভারতে আসেন তখন বাংলার বৈপ্লবিক দল বহুভাগে বিভক্ত, জেলের বাহিরে যে সকল বিপ্লবীদলের নেতা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নেতৃত্বে আদর্শ ও কর্ম্ম পদ্ধতি লইয়া প্রবল মতবিভেদ দেখা যায়; প্রত্যেক জেলায় দুই, তিনটি দলের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ময়মনসিংহ, বগুড়া, চট্টগ্রাম দল পৃথক হইয়া যায়। সর্ব্ববাদী সম্মত কোন কর্ম্মপন্থা বলিয়া কিছুই নাই। সেই সময় অনুশীলন সমিতির কয়েকজন স্থির করেন যে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আগমন উপলক্ষে বড় রকমের কোন বিপ্লবাত্মক কার্য্য করিয়া সমস্ত দলগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হইবে। সেই সময় কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পরামর্শ দেন যে বাংলার বৈপ্লবিক দল সমূহ এত বিচ্ছিন্ন ও অসংহত যে কোন সমবেত প্রচেষ্টা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। যদি বিপ্লবীদলের ঐক্য না হয় তাহা হইলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু অনুশীলন দলের কয়েকজন নেতার মতে বড় রকমের কিছু করিতে পারিলেই আবার সকলের পক্ষে এক হইয়া কাজ করা সম্ভব হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপদেশ দেন যে দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত করিবার একমাত্র উপায় সাময়িক ভাবে উপদ্রবাত্মক কার্য্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়া জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ইঁহারা নানা সূত্রে পূর্ব্বেই সংবাদ পান যে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আসিয়া বঙ্গবিভাগ রদ করিবেন।

বঙ্গবিভাগ যদি রদ হয় তাহা হইলে বৈপ্লবিক শক্তির জয় সূচিত হইবে এবং সেই সুযোগ লইয়া বৈপ্লবিক আন্দোলন বন্ধ রাখা যাইবে। তৎপর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় আসার পূর্ব্বে কয়েকজনের চেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন জেলার দলের নেতাদের এক বৈঠক ৫৯নং পটুয়াটোলা ষ্ট্রীটে এক মেসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠক দুইদিন ধরিয়া চলে। এই সম্মেলনে বৈপ্লবিক উপদ্রবাত্মক কার্য্য সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইহার পর দামোদর বন্যা উপলক্ষে বাংলার সকল দলের বিপ্লবী নেতাগণ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সেবার মাধ্যমে তাঁহারা পুনরায় একত্রিত হন এবং বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলন নূতন পর্য্যায়ে দেখা দেয়। এই পর্য্যায়ের আন্দোলনের অমর কাহিনী যুগ যুগান্ত ধরিয়া পরাধীন দেশের বন্ধন মুক্তির আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করিবে।

আলিপুর বোমার মামলায় চন্দননগরের রাসবিহারী বসুর দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। রাসবিহারীকে পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রমথ মিত্রের বন্ধু তেঘরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা শশীভূষণ রায়চৌধুরী তাঁহাকে ডেরাডুনে সমর বিভাগে একটি চাকুরী যোগাড় করিয়া দেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় রাসবিহারী চন্দননগরে আসেন। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর পার্শ্বে রাসবিহারীর পিতা বাস করিতেন। দামোদর নদীর অপর তীরে সুবলদহ গ্রামে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও রাসবিহারীর আদি বাস। এই সময় রাসবিহারীর শ্রীশচন্দ্রের সহিত নিবিড় পরিচয় হয়। রাসবিহারী মতিলাল রায়ের নিকট শ্রীঅরবিন্দের যোগতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। আত্ম-সমর্পণ যোগ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল, এই সম্পর্কে মতিলাল রায় এক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : "সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের 'Yoga and its objects' এবং 'যৌগিক সাধন' এই দুইটি লেখা তখন আমি বিপ্লবীদের মধ্যে বিলি করিতাম। রাসবিহারী বসু এই সকল কথা শুনিল এবং আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল

রাসবিহারী বসু

কোন্ সময় আমি নিরিবিলি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব ? বোড়াই চণ্ডীতলার শ্মশান ঘাট আমার বাল্যের ও যৌবনের প্রিয় ভূমি। আমি তাহার সহিত এইখানে সাক্ষাতের আহ্বান দিলাম।

"তার পরদিন সন্ধ্যার পর জাহ্নবীতটে কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুদের লইয়া বিপ্লব সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছিল। দূরে রাসবিহারীকে আসিতে দেখিলাম। অন্যান্য তরুণদের সহিত কথা ছাড়িয়া আমি রাসবিহারী বসুর নিকট সমাগত হইলাম। শ্মশানঘাটে তখন একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। তাহার অসংখ্য ঝুরি নামিয়া স্থানটি দুর্গম করিয়া রাখিত। আমি বটবৃক্ষ তলে বসিলাম এবং রাস বিহারীকেও বসিতে বলিলাম। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা আরম্ভ করিলাম। আমি আত্মসমর্পণ যোগের কথা বলিলাম। কথাগুলি সে মন দিয়া শুনিল তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার এই আত্মসমর্পণ যোগের অর্থ অটোমেশন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যাহা কিছু হয়, তাহা ঈশ্বর করেন অর্থে অটোমেশন'। আমি বলিলাম হাঁ, ইহাই গীতার আত্মসমর্পণ যোগ। সর্ব্বপ্রথমে শরীর প্রাণ মন ইষ্টের চরণে উৎসর্গের পর আত্মসমর্পণ যোগের উৎস মুক্ত হয়। আত্মা তখনই মুক্তি পায়। ঈশ্বরের সহিত, বিজ্ঞান প্রকাশ হয় এই জীবনে। তারপর সঙ্ঘ সৃষ্টির কথা। এখন এই দেহ্ প্রাণ মনের উৎসর্গে আত্মসমর্পণের দীক্ষার কথাই বলিতেছি।

"সে সহসা আমার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল; আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। কতক্ষণে সে আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত হইলাম, তাহা জানি না। শ্রীশচন্দ্র আসিয়া আমাদের চমক ভাঙ্গাইয়া দিল, বাড়ী ফিরিলাম, সঙ্গে রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র। আত্মীয়তার গভীর অনুভূতি লাভ করিলাম। তিনজন একত্র বসিয়া ভোজন সমাপ্ত করিলাম। তারপর জ্যোৎস্না-বিধৌত প্রাঙ্গণ-বক্ষে দাঁড়াইয়া সে স্থির হইয়া বলিল, এই অটোমেশনের সাহায্যে বুঝিতেছি ভারতের বিপ্লব সাধন আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতাই ঈশ্বর আমার ভিতর দিয়া চাহিতেছেন। আজ হইতে আমি বিপ্লবী। বিপ্লবের কাজে আপনি আমায় পুরাপুরী পাইবেন।

"সেই জ্যোৎস্না রাত্রে সেই অপরিসর গৃহ প্রাঙ্গণে রাসবিহারী বসুর বিপ্লবের দীক্ষা এই ভাবেই সম্পন্ন হইল। রাসবিহারীর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—'ভারতের উত্তর প্রদেশে একদল বিপ্লবী আছে, তাহারা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ যাহার মূল, সেই তরুকে আশ্রয় করিয়া এই সকল বিপ্লবী নূতন প্রাণ পাইবে। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়ায় সে আমায় বলিয়া গেল—'আপনি দুইজন সাহসী তরুণ ঠিক রাখিবেন, উত্তর ভারতে বিপ্লব সংহতি ও বৃহত্তর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবে।' বাংলার এই দুইজন তরুণ তাহাদের অগ্রণী হইবেন।"

অনুশীলন সমিতির সভ্যগণও চন্দননগরে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ হয় অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী অমৃত হাজরার দৌত্যে। এই সময় রাসবিহারী মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে আসিতে লাগিলেন এবং অমৃতলাল হাজরার দল, শ্রীশ ঘোষের দল এবং কাশীর শচীন সান্যালের দল প্রভৃতির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতে একটি বিরাট দল গড়িয়া তুলিলেন।

এইস্থানে রাজাবাজার মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট মৌলভীবাজারের ঘটনার বিষয়ে বলা প্রয়োজন। স্বামী দয়ানন্দ নামক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত জগৎসী গ্রামে অরুণাচল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে কীর্ত্তন হইত এবং ইহার আকর্ষণে অনেকেই আসিয়া সমবেত হইতেন। শচীন্দ্র নামে একটি ১৬।১৭ বৎসরের যুবক আশ্রমে আসিয়া স্বেচ্ছায় বাস করে। তাহার পিতার অভিযোগ ক্রমে আশ্রমের বিরুদ্ধে পুলিশ একটি বালক হরণ মামলা আনয়ন করে। পুলিশের লোক খানাতল্লাস করিতে আসিলে আশ্রম-বাসিগণ তাহাতে বাধা দেন। সেই জন্য মৌলভীবাজার মহকুমার হাকিম কাপ্তেন গর্ডন বহু পুলিশ লইয়া আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হয়। উভয় দলে সংঘর্ষ হয়। ফলে আশ্রমের অনেক লোক আহত হয়, প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসীকে

অরুণাচল আশ্রম

গ্রেপ্তার করা হয় এবং আশ্রমের বিশিষ্ট সভ্য কাপ্তেন মহেন্দ্র দে আই. এম. এস গুলির আঘাতে নিহত হন। এই ঘটনা হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে।

এই গর্ডন সাহেবকেই মৌলভীবাজারে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। অনুশীলন সমিতির দলভুক্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই উদ্দেশ্যে একটি বোমা লইয়া গর্ডন সাহেবের বাগানে যাইবার সময়ে সহসা বোমাটি ফাটিয়া যাওয়াতে তাহার মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণের ফলে যোগেন্দ্রের মাথা ও দেহ টুকরা টুকরা হইয়া যায়। দুইটি গুলিভরা রিভলবার সহ তাহার খণ্ডিত দেহ বাগানে পড়িয়া থাকে। যোগেন্দ্রের সনাক্তকরণ হইতে সন্ধান পাইয়া, পুলিশ রাজাবাজারে ২৯৬।১ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ শশাঙ্কশেখর হাজরা ওরফে অমৃতলাল হাজরার নামে এক তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই তল্লাসী হয়। তল্লাসীর ফলে, পুলিশ সিগারেটের টিন ও অ্যাসিটীলিন-গ্যাস বাতির খোল প্রভৃতির মধ্যে বিস্ফোরক পূর্ণ করিয়া বোমা তৈয়ার করার কারখানা আবিষ্কার করে এবং ঐ বাড়ী হইতে অমৃতলাল ও তাহার সহচর দীনেশ সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে ও সারদা গুহকে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। পরে কালীপদ ঘোষ ওরফে খগেন্দ্র চৌধুরীকেও গ্রেপ্তার করিয়া রাজাবাজার বোমার মামলা দায়ের করা হয়। আলিপুর দায়রা বিচারে খগেন্দ্র ভিন্ন অপর সকল আসামীই দণ্ডিত হয়। বাংলা সরকার খগেন্দ্রের মুক্তির বিরুদ্ধে আপীল করে এবং অন্যান্য আসামীদের দণ্ড বৃদ্ধির জন্য রুল জারী করে।

আপিলের বিচারে দীনেশ, সারদা, চন্দ্রশেখর, কালীপদ ওরফে উপেন্দ্র মুক্তি লাভ করে। শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরার ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর বহাল থাকে। বরাহনগরে রিভলবার প্রাপ্তির এক মামলায় তাঁহার তিন বৎসর জেল হয়।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহাদের রায়ে একমত হইয়া বলেন—"শশাঙ্ক এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তি এবং যদিও ভারতবর্ষের বাহিরে তাহার নির্ম্মিত বোমা ব্যবহৃত হইতেছে কিনা প্রমাণ নাই কিন্তু ভারতের নানাস্থানে যে উহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা নিশ্চিত।"

এই মামলা চলার সময়ে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ টার্ণার বোমাগুলির নির্ম্মাণ কৌশলের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে,—ডালহৌসী স্কোয়ারে কাউলের প্রতি ব্যবহৃত বোমা, দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত বোমা, এবং মৌলভী-বাজার, ভদ্রেশ্বর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত সকল বোমার কৌশল একই প্রকার, এবং এই সকল বোমার নির্ম্মাণ ব্যবস্থা একই বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। খানাতল্লাসীর সময় রাজাবাজারে প্রাপ্ত "স্বাধীনতা পত্র" দিল্লীর "Liberty leaflet"এরই অনুরূপ। রাজাবাজারের বোমা যে শশাঙ্কের দ্বারাই নির্ম্মিত, তাহা শশাঙ্ক স্বীকার করেন। মিস্ত্রীর কাজে শশাঙ্ক বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

—সমাপ্ত—

## পরিশিষ্ট

যে সকল পুস্তক হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি :—


কারা কাহিনী—শ্রীঅরবিন্দ

জীবন স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মীর কাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

অগ্নিযুগ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আত্ম কাহিনী—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

জেলে ত্রিশ বছর—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো

শ্রীঅরবিন্দ— প্রমোদকুমার সেন

অরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ—শ্রীসুকুমার মিত্র

বাংলায় বিপ্লববাদ—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

ফাঁসীর সত্যেন—শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ

জাতীয় উচ্ছ্বাস—জলধর সেন

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

বিপ্লবী যুগের কথা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শহীদ যুগল—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

ভারতের বিপ্লব কাহিনী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—প্রবোধচন্দ্র সিংহ

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার রায়

আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু
গল্পভারতী—শারদীয়া সংখ্যা ( ১৩৬০ )
আনন্দবাজার পত্রিকা—কংগ্রেস সংখ্যা—১৩৪৪
বঙ্গবাসী—ভাদ্র ১৩৩০
স্বাধীনতা—শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৪

Seir Mutakherin Vol. II.
Broome's Rise and Progress of Bengal Army Vol. 1.
Firminger's Midnapore Record 1763-1764.
District Gazetteer. Midnapore.
Sannyasi and Fakir Rebellions in Bengal—J. N. Ghosh
District Gazetteer—Rangpore.
District Gazetteer—Dacca.
The Chuar Rebellion of 1799—T. C. Price
Indian Mussalmans—Hunter.
Rural History of Bengal—Hunter.
Sepoy War—Kaye.
Letters, Despatches and Other State Papers Preserved by the Military Department of the Government of India—Vol. 1.
Statistical Accounts of Bengal—Hunter.
Rise and Fulfilment of British Rule in India—Thompson and Garret.
History of Political Thought from Rammohan to Dayananda 1821-84—Dr Biman Behari Mazumdar.
A Nation in Making—Surendra Nath Banerjee.

Bengal Under Lieutenant Governors Vols. I & II—
C. E. Buckland.

History of British India—Roberts.

Brahma Samaj and the Battle of Swaraj in India—
Bepin Chandra Pal.

Calcutta Review—A Sketch of the Wahabis in India
1866

Sedition Committee's Report

India Under British Crown—B. D. Basu.

The Life of C. R. Das—Prithwis Chandra Ray.

New India—Henry Cotton.

The Nation—Netaji Number ( 1949 ).